ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

দাখিল সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ইন্দিরা গান্ধী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

জেনারেল স্যাম মানেকশ
ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান

এডওয়ার্ড কেনেডি
আমেরিকান সিনেটর

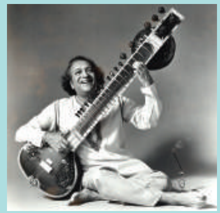

পন্ডিত রবিশঙ্কর
ভারতীয় সেতারবাদক ও সঙ্গীতশিল্পী

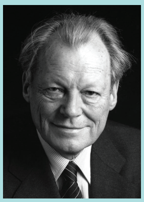

উইলি ব্রান্ট
চ্যান্সেলর
জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক

আলেক্স কোসিজিন
রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

মার্শাল টিটো
যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট

আঁন্দ্রে মালরোঁ
ফরাসি লেখক ও রাজনীতিবিদ

জে.এফ.আর. জ্যাকব
ভারতীয় সেনাবাহিনীর
লেফটেন্যান্ট জেনারেল

সিডনি শনবার্গ
আমেরিকান সাংবাদিক

এলেন গিন্সবার্গ
আমেরিকান কবি

সায়মন ড্রিং
ব্রিটিশ সাংবাদিক

উইলিয়াম এ এস অর্ডারল্যান্ড
অস্ট্রেলিয়ান, বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত
মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষক

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী কয়েকজন বিদেশি বন্ধু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

দাখিল

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম
প্রফেসর ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার
ড. দেবাশীষ কুমার কুন্ডু
ড. সুমেরা আহসান
মুহাম্মদ রকিবুল হাসান খান
জেরিন আক্তার
ড. মীর আবু সালেহ শামসুদ্দীন
মো. হাবিবুল্লাহ
সিদ্দিক বেলাল
উমা ভট্টাচার্য
মুহম্মদ নিজাম
বহ্নি বেপারি
সানজিদা আরা

সম্পাদনা

আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০২২

পুনর্মুদ্রণ: , ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ

প্রমথেশ দাস পুলক

তামান্না তাসনিম সুপ্তি

রেহনুমা প্রসূন

ইউসুফ আলী নোটন

প্রচ্ছদ

রাসেল রানা

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

কে. এম. ইউসুফ আলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন ট্রাই-আউটের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ করে লেখক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে যৌক্তিক মূল্যায়ন করে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জন করা হয়েছে । আশা করা যায় পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকটির মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

তোমাদের প্রত্যেকের রয়েছে এক একটা সতেজ মন আর একটা করে খুবই সক্রিয় মস্তিষ্ক। তোমাদের কল্পনা শক্তি যেমন আছে, তেমনি আছে বুদ্ধি, তা খাটিয়ে পেয়ে যাও ভাবনার নানা পথ। মন আর মস্তিষ্কের মতো আরও কয়েকটা যোগ্যতা নিয়েই জন্মেছ সবাই। এগুলোর কথা বিশেষভাবে বলতে চাই। বলছি মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তির কথা। তোমরা আগেই জেনেছ আমাদের সবার আছে পাঁচটি করে বিশেষ প্রত্যঙ্গ– চোখ, কান, নাক, জিহ্বা আর ত্বক। এগুলো ইন্দ্রিয়ের কাজ করে। চোখ দিয়ে আমরা দেখি, এ হলো দৃষ্টিশক্তি, আর এটিকে বলি দর্শনেন্দ্রিয়। তেমনি কানে শুনি, এটি শ্রবণেন্দ্রিয়, নাক দিয়ে শুঁকি বা ঘ্রাণ নেই, এটি ঘ্রাণেন্দ্রিয়। জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করি, এটি স্বাদেন্দ্রিয়; আর ত্বক দিয়ে স্পর্শ করি, এটি স্পর্শেন্দ্রিয়। কিছু চিনতে, বুঝতে, জানতে এগুলো আমাদের সহায়তা করে। তাই ইন্দ্রিয়গুলো এত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ।

এতসব সম্পদ মিলিয়ে তোমাদের প্রত্যেকের আছে–

অফুরন্ত প্রাণশক্তি

সীমাহীন কৌতূহল

আনন্দ পাওয়ার অসীম ক্ষমতা এবং

বিস্মিত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা।

আধুনিক শিক্ষা-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পরীক্ষা আর উত্তর মুখস্থ করার যে চাপ, তাতে তোমাদের এসব স্বাভাবিক ক্ষমতার বিকাশ ব্যাহত হয়। শিক্ষায় বরং শিক্ষার্থীদের এই ক্ষমতাগুলোকেই কাজে লাগানো দরকার, তাতেই ভালো ফল মিলবে।

এ থেকে তোমাদের নিজেদের কাজ সম্পর্কে একটু ধারণা নিশ্চয় পেয়ে যাচ্ছ। হ্যাঁ এই ব্যবস্থায় তোমরা বেশ স্বাধীনতা পাচ্ছ। তবে ভুলো না, স্বাধীনতা ভোগ করতে হলে দায়িত্বও নিতে হয়। আচ্ছা, পড়ালেখাটা তো তোমার নিজেরই কাজ, নিজের জন্যই। তো নিজের কাজ নিজে করবে, এতো খুব ভালো কথা।

তবে আসল কথা হলো, কোনো কাজে যখন নিজেই সফল হবে, তাতে আনন্দ যে কত বেশি তা নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারো। তাই নতুন পথে শিক্ষা হবে আনন্দময় যাত্রা, পথচলা। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে– যাত্রাপথের আনন্দগান। শিক্ষা হলো আনন্দগান সেই অভিযাত্রা– যেন গান করতে করতে পথ চলেছ।

তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে মাত্রই উঠেছ। অভিজ্ঞতার ঝুলিতে রয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ। নতুন শ্রেণির পাঠের অনেক কিছুই হবে নতুন, অনেকটা অজানা। তবে অজানা আর নতুন বলেই তো এ পথচলাটা হবে অভিযানের মতো। পথে যে চ্যালেঞ্জ থাকবে সেগুলো পেরোনোর অভিজ্ঞতা থেকে যেমন অনেক কিছু জানবে, শিখবে, করবে, তেমনি পাবে অফুরন্ত আনন্দ।

আর এই চ্যালেঞ্জ মোকবিলার জন্য তোমাদের ভাঁড়ারে আছে নিজস্ব শক্তিশালী হাতিয়ার- কৌতূহল, বিস্ময়বোধ, প্রাণশক্তি এবং আনন্দিত হওয়ার ক্ষমতা। ইন্দ্রিয়গুলো এতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। আর মজা হলো এগুলো টাকাপয়সার মতো নয়, ব্যবহারে খরচ না হয়ে বরং বাড়ে। কারণ এসবই তোমার মনের সম্পদ, তুমি যত চর্চা করবে, ততই এগুলো ঝকঝকে থাকবে, কাজে হবে দক্ষ। বরং এগুলোর প্রেরণায় তোমাদের নতুন নতুন ক্ষমতার প্রকাশ ঘটবে। প্রথম ডাক পড়বে বুদ্ধির। নিজেদের বুদ্ধি খাটাতে হবে, ভাবতে হবে, আবার ভাবতে গেলে যুক্তির প্রয়োজন। এ হলো চর্চার বিষয়-বুদ্ধি খাটালে তা আরও বাড়বে, দেখবে কোনো কোনো গাছের ডাল-পাতা ছেঁটে দিলে গাছটি বাড়ে ভালো, ফলও দেয় বেশি। তোমাদের চাই বুদ্ধিকে খাটানো, যুক্তিতে শান দেওয়া। আর ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রাখতে হবে, তাতে এগুলোয় দক্ষতাও বাড়তে পারবে।

এভাবে অজানাকে জয় করবে, অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে চলতে চলতে বিস্ময়ে-আনন্দে মজে কখন যে অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে টেরও পাবে না। তবে শুরু হোক এই জয়যাত্রা!

সূচিপত্র

যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায় কীভাবে?	১ - ১৯
অর্থনৈতিক ইতিহাস জানার উপায়	২০ - ৩১
মানুষে মানুষে সাদৃশ্য ও ভিন্নতা	৩২ - ৪৮
বাংলা অঞ্চল ও স্বাধীন বাংলাদেশ: অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে	৪৯ - ৬৪
হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	৬৫ - ৭৪
মুক্তিযুদ্ধের বিদেশি বন্ধুরা	৭৫ - ৯২
সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো ও রীতিনীতি	৯৩ - ১১৮
প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা	১১৯ - ১৩১
টেকসই উন্নয়ন ও আমাদের ভূমিকা	১৩২ - ১৫৮
সম্পদের কথা	১৫৯ - ১৭৫

যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায় কীভাবে

প্রথম পড়া দাঁতটি আমরা কী করেছি?

রুপা আজ ক্লাসে এসেছে কাগজে মোড়ানো একদম ছোট্ট একটা কিছু নিয়ে। সবাই বলল, "কী এর ভেতরে? খুলে দেখাও।" রুপা মোড়ানো কাগজ খুলতেই বেরিয়ে এলো সাদা ছোট্ট একটি দাঁত। রুপা বলল, "আমার ছোট বোনের দাঁত পড়েছে। এটি সে ঘুমানোর সময় তার বালিশের নিচে রেখেছে। সে ভাবছে কোনো পরি এসে তার দাঁত নিয়ে যাবে আর তাকে একটি উপহার দিয়ে যাবে। এটি সে বিদেশি কার্টুনে দেখেছে"। আনুচিং বলল, "আসলেই কি পরি আসবে?" রুপা বলল, "আরে না, আমার মা-ই উপহার কিনে বালিশের নিচে রেখে দিয়েছে"। সবাই হেসে উঠল।

এবারে ক্লাসের সবাই তাদের প্রথম পড়া দাঁতটি কী করেছিল তা বন্ধুদের বলল। তুমি তোমার প্রথম পড়া দাঁতটি কী করেছিলে? ছবি এঁকে তোমার বন্ধুদের সেই গল্পটি বলতে পারো।

আমার প্রথম পড়া দাঁতটির গল্প

ছবিসহ আমার প্রথম পড়া দাঁতটির গল্প লিখি	
আমার প্রথম পড়া দাঁতটি আমি ...	ছবি আঁকি ...

খুশি আপা ক্লাসে ঢুকতেই সবার প্রশ্ন- "আপা, সত্যিই কি দাঁত নেওয়ার জন্য পরি আসে? আপা, ইঁদুর এসে কি সত্যিই আমাদের দাঁত নিতে পারে?"

খুশি আপা বললেন, "তোমাদের কী মনে হয়? এ নিয়ে সবার মনে নানা প্রশ্ন থাকতে পারে। চলো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজি। সাথে এই দাঁত পড়া নিয়ে বাড়িতে, এলাকায়, বন্ধু, প্রতিবেশী, আর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কী কী গল্প, কথা, প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে তাও জানার চেষ্টা করি।

আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে জেনেছি তথ্য সংগ্রহের সময় তথ্যদাতা/উত্তরদাতার কাছ থেকে আমাদের অনুমতি নিতে হবে। আমরা নিচের নিয়মগুলো পড়ে ফেলি।

উত্তরদাতার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া
১. কতক্ষণ সময় লাগতে পারে তা উত্তরদাতাকে জানাতে হবে।
২. কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে তা জানাতে হবে।
৩.উত্তরদাতাকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কোনো রকম চাপ দেওয়া হবে না তা জানাতে হবে।
৪. যেকোনো প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার জন্য তিনি স্বাধীন সেটা জানাতে হবে।
৫. উত্তরদাতার যেকোনো ব্যক্তিগত তথ্য (নাম, বয়স ইত্যাদি) গোপন থাকবে তা জানাতে হবে।
৬.প্রাপ্ত তথ্য শুধুমাত্র এই কাজেই ব্যবহৃত হবে তা জানাতে হবে।

চলো নিচের সারণি থেকে একনজরে অনুসন্ধানের ধাপগুলো দেখে নিই। এ পর্যায়ে আমরা নিজ এলাকার পরিবর্তনের ধারাগুলো ভালোভাবে বুঝে নেব। তারপরে খুঁজব দাঁত পড়ার রীতিনীতি।

একনজরে অনুসন্ধানের ধাপ

ধাপ	ধাপটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	উদাহরণ
অনুসন্ধানের জন্য বিষয়বস্তু (topic) নির্ধারণ করা	যে বিষয়ে অনুসন্ধান করা হবে	যেমন- “আমাদের এলাকায় পরিবর্তন” 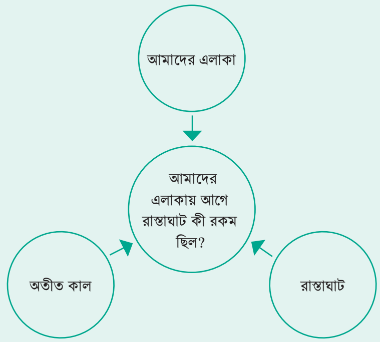
অনুসন্ধানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন (inquiry question)লেখা বা তৈরি করা	আগের ধাপে নির্ধারিত বিষয়বস্তু সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন আমরা চিন্তা করে লিখব বা তৈরি করব। এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই আমরা অনুসন্ধানী ধাপগুলোর মাধ্যমে খুঁজে বের করব।	যেমন- “আমাদের এলাকায় পরিবর্তন” বিষয়ের জন্য অনুসন্ধানী প্রশ্ন হতে পারে: প্রশ্ন-১. আমাদের এলাকায় আগে রাস্তাঘাট কী রকম ছিল? প্রশ্ন-২ আগে আমাদের এলাকার মানুষের কী কী পেশা ছিল? প্রশ্ন-৩ আগে এলাকায় কী কী উৎসব পালন হতো?
প্রশ্ন থেকে মূল ধারণা (key concept) খুঁজে বের করা	প্রতিটি অনুসন্ধানমূলক প্রশ্নের মধ্যে এক বা একাধিক মূল ধারণা রয়েছে। সেগুলো চিহ্নিত করতে পারলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে কোথা থেকে আর কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা দরকার।	যেমন- প্রশ্ন-১. আমাদের এলাকায় আগে রাস্তাঘাট কী রকম ছিল? এই প্রশ্নে তিনটি মূল ধারণা রয়েছে:
তথ্যের উৎস (data source) নির্বাচন করা	যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি সেটি জানার জন্য কার কাছে বা কোথায় যেতে হবে? যেমন- হতে পারে কোনো জাদুঘর বা সংগ্রহশালা, কোনো বই বা ম্যাগাজিন, কোনো মানুষ যে এই বিষয়টি সম্পর্কে জানেন, কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, ইন্টারনেট, ভিডিও ইত্যাদি।	যেমন- প্রশ্ন-১. আমাদের এলাকায় আগে রাস্তাঘাট কী রকম ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমরা এলাকার বয়োজেষ্ঠ্য মানুষের কাছে যেতে পারি, আগের কোনো মানচিত্র দেখতে পারি, বা এ বিষয়ে কোনো লেখা পড়তে পারি। এগুলো আমাদের তথ্য উৎস।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (data collection method) নির্ধারণ	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হলো যে উপায়ে আমরা তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করব- যেমন- প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, দলীয় আলোচনা ইত্যাদি।	প্রশ্ন-১. আমাদের এলাকায় আগে রাস্তাঘাট কী রকম ছিল? এর জন্য আমরা এলাকার বয়োজেষ্ঠ্য মানুষদের একসাথে করে দলীয় আলোচনা করতে পারি। তাদের আলোচনা থেকে আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে পারি। অথবা প্রত্যেকের সাক্ষাৎকার নিতে পারি।
তথ্য সংগ্রহ করা (data collection)	এই ধাপে নির্বাচিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত মানুষের কাছ থেকে বা স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।	যেমন- প্রশ্ন-১. আমাদের এলাকায় আগে রাস্তাঘাট কী রকম ছিল? এটি জানার জন্য আমরা ৪/৫ জন বয়সে বড় এমন মানুষ, অর্থাৎ বয়োজেষ্ঠ্য মানুষ নির্বাচন করে তাদের কাছে গিয়ে তাদের অনুমতি নিয়ে তাদের সাথে দলীয় আলোচনা করতে পারি। তাদের দেওয়া উত্তরগুলো লিখে রাখব অথবা রেকর্ডও করতে পারি।

তথ্য বিশ্লেষণ করা (data analysis)	আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করি সেগুলো থেকে সরাসরি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। সেগুলো পড়তে হয়, সাজাতে হয়, অথবা কিছু হিসাব নিকাশ করতে হয়। এর ফলে তথ্য হয়ে ওঠে অর্থপূর্ণ। এই প্রক্রিয়াকে বলে তথ্য বিশ্লেষণ।	সংগ্রহ করা তথ্য ব্যবহার করে আমরা আগের সময়ের রাস্তাঘাট চিহ্নিত করে একটি মানচিত্র তৈরি করতে পারি। আবার ৩ জনের তথ্যকে একত্রিত করে এলাকার প্রধান প্রধান সড়কপথগুলো সম্পর্কে বর্ণনা লিখতে পারি।
ফলাফল বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ (results/ findings)	তথ্য বিশ্লেষণের পর আমরা আমাদের অনুসন্ধানী প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই। এটিই আমাদের ফলাফল। অর্থাৎ আমরা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম।	যেমন- ওপরের উদাহরণের ক্ষেত্রে আমাদের ফলাফল হতে পারে: আগে আমাদের এলাকায় উত্তর পশ্চিম পাশে কোনো সড়ক ছিল না। এখন সেখানে অনেক বড় একটা সড়ক তৈরি হয়েছে। এর ফলে এখন উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে যাতায়াত সহজ হয়েছে। তবে আগে অনেক ছোট ছোট মেঠোপথ ছিল। এখন সেগুলো নেই। মানুষ এখন পায়ে হেঁটে চলাচল কম করে।
ফলাফলটি অন্যদের কাছে উপস্থাপন বা শেয়ার করা (communicating the result)	নানা উপায়ে আমরা আমদের অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ায় পাওয়া ফলাফল অন্যদের সামনে তুলে ধরতে পারি। যেমন- গ্রাফ, সারণি, ছবি, ভিডিও, লিখিত প্রতিবেদন, নাটক ইত্যাদি।	যেমন উপরে উদাহরণের ক্ষেত্রে: দুটি একই এলাকার ম্যাপ এর ছবি থাকবে পাশাপাশি। যেখানে আগের ও পরের সড়কগুলো দেখানো থাকবে। আগে উত্তর পশ্চিমে কোন বড় সড়ক ছিলনা, এখন আছে আগে অনেক মেঠো পথ ছিল, এখন নেই ইত্যাদি।

নিচে অনুসন্ধানের একটি রূপরেখা দেওয়া হলো। এভাবেই ধাপে ধাপে এগোতে হবে।

দাঁত পড়া নিয়ে মজার মজার রীতিনীতি অনুসন্ধান

আজ সবাই দলে ভাগ হয়ে দাঁত পড়া নিয়ে মজার মজার রীতিনীতি অনুসন্ধান করবে। রূপা বলল, "সব পরিবারেই একই রীতিনীতি। দাঁত বালিশের নিচে রেখে পরির জন্য অপেক্ষা করা"। সাব্বির বলল, "আহা রূপা, অনুসন্ধানের ফলাফল আগেই কি অনুমান করা যায়?" রূপা বলল, "কিন্তু আমার মাথায় এই চিন্তাটি এলো, তাই বললাম"। আনুচিং বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, থামো। আমরা বরং অনুসন্ধানে নেমে পড়ি। অনুসন্ধান শেষেই বোঝা যাবে রূপার অনুমান সঠিক ছিল কি না"।

অনুসন্ধানী কাজ-১

বিষয়বস্তু: দাঁত পড়া নিয়ে রীতিনীতি

অনুসন্ধানের প্রশ্ন:- দাঁত পড়া নিয়ে আমাদের পরিবার বা এলাকা বা সমাজে কী ধরনের রীতিনীতি আর গল্প প্রচলিত আছে?

প্রশ্নে যে মূল বিষয়বস্তুগুলো রয়েছে:-

- আমাদের পরিবার, এলাকা ও সমাজ
- প্রথম দাঁত পড়লে রীতিনীতি বা নিয়ম-কানুন
- দাঁত নিয়ে প্রচলিত বিভিন্ন গল্প বা চিন্তাভাবনা

কার কাছে বা কোথায় গেলে জানতে পারব? (তথ্যের উৎস):

কী উপায়ে জানব ও তথ্য সংগ্রহ করব? (তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি):

তথ্য সংগ্রহ: এ জন্য আমরা নিচে দেওয়া ছকটি ব্যবহার করতে পারি। দলের সবাই মিলে বিভিন্ন এলাকার ও বিভিন্ন সময়ের মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করল।

তথ্য বিশ্লেষণ: একই রকম তথ্যগুলোকে একসাথে করল, যেমন- এলাকাভিত্তিক তথ্য, বিভিন্ন সময়ের তথ্য (বিভিন্ন বয়সী মানুষের কাছ থেকে নেওয়া)।

ফলাফল বা সিদ্ধান্ত:

উপস্থাপন: রবিন আর তার দল তাদের অনুসন্ধানী কাজ ও তার ফলাফল ছবি এঁকে উপস্থাপন করল- কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন এলাকার মানুষ প্রথম দাঁত পড়লে কী কী করে। অন্যরাও নানা উপায়ে উপস্থাপন করল তাদের অনুসন্ধানী কাজ।

তথ্য সংগ্রহের ছক

কার কাছ থেকে তথ্য নিলাম?	প্রথম দাঁত পড়লে কী করে?	দাঁত নিয়ে মজার কোনো চিন্তা/প্রচলিত গল্প
সাবিহা খাতুন (ফাতেমার দাদি), রাজশাহী		

সবার উপস্থাপনা শেষে রূপা বলল, “নাহ, যা ভেবেছিলাম তা ঠিক না। আমার অনুমানটি সঠিক নয়। দাঁত পড়ার রীতিনীতি সব এলাকা বা সমাজে একই নয়, ভিন্ন ভিন্ন”। সাব্বির বলল, “অনেক বিষয়েই আমাদের এ রকম কিছু অনুমান থাকে, এগুলো আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা বা চিন্তা। অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে আমরা সেটি যাচাই করতে পারি, আমাদের ধারণাও তাতে পাল্টাতে পারে”।

বন্ধুদের দলের কাজের মূল্যায়ন করি

বন্ধুদের উপস্থাপনা মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। নিচের ছকে অনুসন্ধানের প্রতি ধাপে অনুসন্ধানকারীর কাছ থেকে যে প্রত্যাশা বা আদর্শ কাজ তা দেওয়া আছে। সেগুলো বিবেচনা করে প্রতি দলের অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, কী করলে আরও ভালো হতো এবং কেন হতো, এগুলো বুঝিয়ে বলি, আর খুব সংক্ষেপ করে পরের পৃষ্ঠায় চার্টে লিখি। বন্ধুদের ভালো কাজের প্রশংসা করতেও ভুলবনা আমরা। একে বলে ফিডব্যাক (feedback) দেওয়া। প্রতি ধাপে তাদের কাজ সঠিকভাবে করতে পেরেছে/আংশিক পেরেছে/আরও অনেক সাহায্যের দরকার। এই ৩টি মতামতের মধ্য থেকে কোনো একটি লিখব তাদের কাজকে আদর্শ কাজের সাথে তুলনা করে।

আদর্শ/ প্রত্যাশা	অনুসন্ধানের প্রশ্ন (প্রশ্নটি বা প্রশ্নগুলো সুনির্দিষ্ট, আকর্ষণীয় ও অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে সমাধান যোগ্য)	প্রশ্নের মূল বিষয়বস্তু (প্রশ্নে যে মূল বিষয় আছে সেগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছে)	তথ্য উৎস (প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার জন্য এক বা একাধিক উপযুক্ত তথ্য উৎস উল্লেখ করতে পেরেছে)	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করতে পেরেছে)	তথ্য সংগ্রহ (পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও রেকর্ড করতে পেরেছে)	তথ্য বিশ্লেষণ (সঠিক উপায়ে তথ্য সাজিয়ে/ হিসাব নিকাশ করে অনুসন্ধানী প্রশ্নের উত্তর/ সমাধানে পৌঁছতে পেরেছে)	ফলাফল উপস্থাপন (স্পষ্টভাবে ও আকর্ষণীয় উপায়ে অনুসন্ধানী প্রক্রিয়া আর ফলাফল উপস্থাপন করেছে)	মন্তব্য/ ফিডব্যাক
দল-১								
দল-২								
দল-৩								
দল-৪								
দল-৫								

নিজ দলের সদস্যদের মূল্যায়ন

পুরোপুরি করেছে, কিছুটা করেছে, আরও অনেক উন্নতি করতে হবে। এই কথাগুলো ব্যবহার করে ফিডব্যাক দিতে পারি আমরা আমাদের নিজ দলের বন্ধুদের।

দলের সদস্যদের নাম	অংশগ্রহণ (পুরো অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে)	অন্য সদস্যদের সাহায্য করা (যখন যে সদস্যের সাহায্য প্রয়োজন, নিজেই আগ্রহ নিয়ে সাহায্য করেছে)	অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা (নিজের মতের সাথে না মিললেও সব সময় বন্ধুদের মতামতকে শ্রদ্ধা করেছে)	মতামত বা ফিডব্যাক
আনাই				
সুমন				
রূপা				
ফাতেমা				

ব্যক্তিগত ধারণা ও তার যাচাই: যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো

আনুচিং আজ ক্লাসে এসে বলল, "খুশি আপা, কাল রূপা যা অনুমান করেছিল তাকে বলে হাইপোথিসিস বা পূর্বের অনুমান, আমি বইয়ে পড়েছি"। রূপা বলল, "কী? হিপোপটেমাস না কি বললে এটা তুমি?" সবাই হেসে উঠল। খুশি আপা বললেন, "তাহলে আজ আনুচিং এ বিষয়ে একটা ছোট্ট ক্লাস পরিচালনা করুক"। আনুচিং যা বলল, তার সারমর্ম এ রকম:

পূর্বানুমান বা অনুমিত সিদ্ধান্ত (hypothesis):

অনেক সময় আমরা আমাদের অনুসন্ধানী কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহের আগেই আমাদের এই অনুসন্ধানের ফলাফল সম্পর্কে একটা অনুমান করি। একে বলে পূর্বানুমান বা অনুমিত সিদ্ধান্ত (hypothesis)। সাধারণত কিছু পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের এই পূর্বানুমান তৈরি হয়। আমাদের এই অনুমান ভুল বা সঠিক হতে পারে। আমরা অনুসন্ধানের জন্য যে তথ্য সংগ্রহ করি তার বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারি আমাদের এই পূর্বানুমান সঠিক নাকি ভুল ছিল। তখন আমরা প্রয়োজনে ধারণাটি শুধরে নিই। এভাবেই আমরা যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। তাহলে কেউ আমার ধারণা নিয়ে প্রশ্ন তুললে সেটি যে নিছক ব্যক্তিগত ধারণা নয় বরং বৈজ্ঞানিক ধাপ অনুসরণ করে গ্রহণ করা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত তা আমরা বুঝিয়ে বলতে পারব।

এসো আমরা আনুচিং এর কথা থেকে ব্যক্তিগত ধারণা আর যৌক্তিক সিদ্ধান্তের মধ্যে তুলনা করার চেষ্টা করি:

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ব্যক্তিগত ধারণা বা অনুমান	যৌক্তিক সিদ্ধান্ত

এখন খুশি আপার ক্লাসের শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন অনুমান বা ব্যক্তিগত ধারণাকে যখনই সম্ভব অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে যাচাই করে নেয়। তোমরাও তা করতে পার। চলো একটি পূর্বানুমান যাচাই করার কাজ করে নিই। এই জন্য আমরা একটি পূর্বানুমান ঠিক করি। যেমন: আমাদের সমাজের বেশিরভাগ মানুষ একক পরিবারে বাস করছে। আমরা সবাই মিলে এই অনুসন্ধানের কাজটি করব। আমরা প্রত্যেকে নিজ পরিবার এবং আমাদের আশেপাশের ৪-৫টি পরিবারের মধ্যে একক পরিবার ও যৌথ পরিবার কয়টি তার সংখ্যা জানব। খেয়াল রাখব যেনো আমার ও আমার সহপাঠীদের পরিবার গণণায় একই পরিবার একাধিকবার না আসে । এরপর সবাই মিলে যে সংখ্যা পাব সেটিকে বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিব। আমাদের প্রাপ্ত যৌক্তিক সিদ্ধান্তকে নিচের ছকে লিখব।

বিষয়বস্তু	আগের ধারণা বা অনুমান	অনুসন্ধানী কাজের বর্ণনা	পরের ধারণা বা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত
আমাদের সমাজে পরিবারের ধরন।	আমাদের সমাজে বেশির ভাগ মানুষ একক পরিবারে বাস করছে।		

অনুসন্ধানী ধাপগুলোর বিশ্লেষণ বা প্রতিফলন:

নীলা আর গণেশ ক্লাসে নিজেদের তৈরি প্রতিফলন ডায়েরি নিয়ে এসেছে। প্রতিফলন মানে নিজের কাজ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, ভালোভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা। তারা দেখাল কী কী লিখেছে সেই ডায়েরিতে। চাইলে তোমরাও এ রকম বানাতে পার। তাদের ডায়েরির একটি অংশ দেখো। এভাবে তারা প্রতি ধাপ নিয়েই লিখেছে...

নীলার ডায়েরির দুটি পাতা

তথ্যের উৎস নির্বাচন

আমার অনুসন্ধানের প্রশ্ন ছিল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় দাঁত পড়া নিয়ে কী কী রীতি প্রচলিত রয়েছে।

আমি ৫ জন মানুষ নির্বাচন করেছিলাম। আমার নিজের দাদাভাই, আদনানের দাদা, শিহানের দাদি, সুমনের দাদি, ফাতেমার দাদা। পরে মনে হলো এরা সবাই উত্তরবঙ্গ মানে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম ভাগের মানুষ। রাজশাহী পাবনা নাটোর এসব এলাকার মানুষ তারা। কিন্তু আনুচিং এর দাদা-দাদির বাড়ি বান্দরবান, আবার নাহিদের দাদা দাদির বাড়ি সুনামগঞ্জের হাওর এলাকায়। নাজিফার দাদা দাদির বাড়ি যশোর। এদের কাছ থেকে তথ্য নিলে বৈচিত্র্য বাড়ত, এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন এলাকা থেকে তথ্য নেওয়া হতো। আরেকটা ব্যাপার মনে হলো, শুধু যারা বয়সে অনেক বড় বা বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের কাছ থেকেই তথ্য নিয়েছি। যদি বাবা-মা, চাচা-চাচির কাছ থেকে এবং আমাদের বন্ধু বা তাদের ছোট ভাই বোনদের কাছে থেকে তথ্য নিতাম তাহলে বিভিন্ন সময়কার রীতিনীতি ভালভাবে উঠে আসতো আমার তথ্যে। কারণ রীতি নীতি হয়তবা একেক সময় একেক রকম ছিল। ফলে বুঝলাম এরপর মানুষ বা তথ্য উৎস নির্বাচনে আরও চিন্তা করতে হবে আমাকে।

গণেশের প্রতিফলনের ডায়েরির দুই পাতা

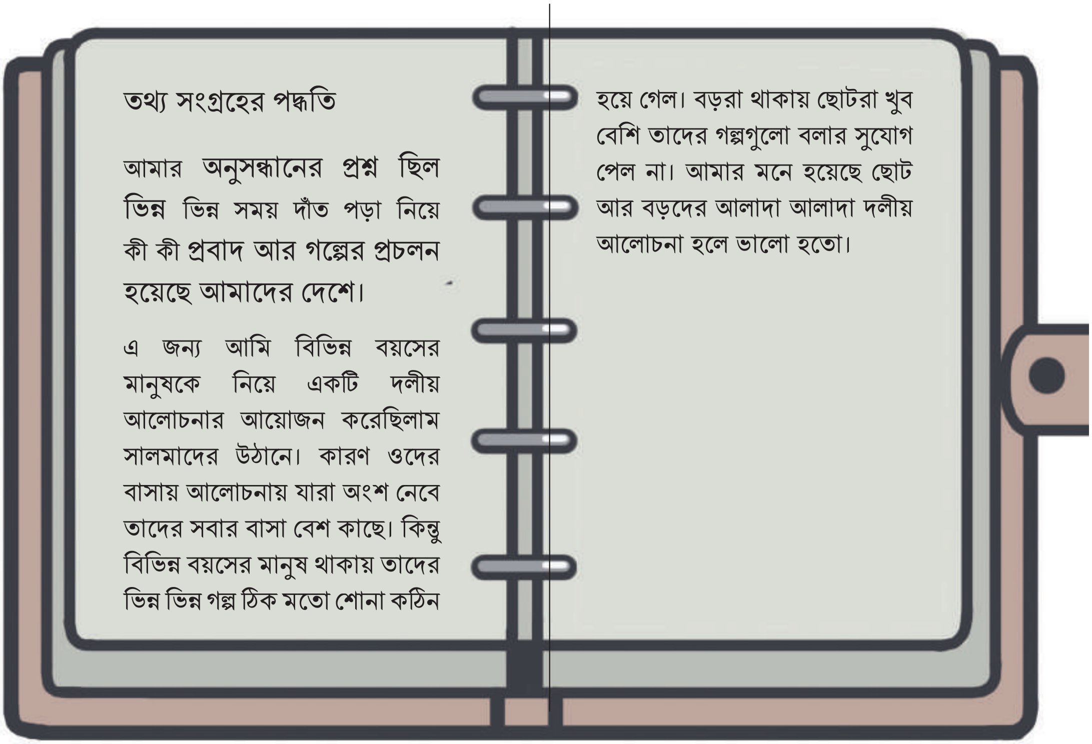

তোমাদের প্রতিটি অনুসন্ধানী কাজের সময় ধাপগুলোতে যা প্রতিফলন করে তা লিখবে। বছর শেষে একটি অনুষ্ঠানে তোমরা অনুসন্ধানী ধাপগুলো নিয়ে আলোচনা করবে।

আনাই জিজ্ঞেস করল, " আমাদের দেশ ছাড়া আর কোন কোন দেশের শিশুরা কী কী করে দাঁত নিয়ে?" খুশি আপা বললেন, "তোমরাই খুঁজে বের করো না, বিদেশে থাকা আত্মীয়, বন্ধু কিংবা ইন্টারনেট, বই, পত্রিকা খুঁজে দেখ!"

অনুসন্ধানী কাজ-২

বিষয়বস্তু: বিভিন্ন দেশের দাঁত পড়া নিয়ে প্রচলিত রীতিনীতি ও গল্প

অনুসন্ধানের প্রশ্ন: বিভিন্ন দেশে শিশুদের প্রথম দাঁত পড়লে তারা কী করে?

বিভিন্ন দেশে দাঁত পড়া নিয়ে কী কী গল্প প্রচলিত আছে?

প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অর্থাৎ অনুসন্ধান করতে যে ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:

- তথ্য উৎস
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি
- তথ্য সংগ্রহ: এ জন্য আমরা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া ছকটি ব্যবহার করতে পারি
- তথ্য বিশ্লেষণ
- ফলাফল বা সিদ্ধান্ত
- উপস্থাপন

সবাই অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে প্রশ্নের উত্তর খুঁজল। এবার তারা নানা উপায়ে তাদের এই তথ্য উপস্থাপন করল।

সমাজে প্রচলিত নিয়ম-কানুন আসলে কী?

চিন্তা করি বন্ধুর সাথে দল গঠন করি, ভাবনার আদান-প্রদান করি

খুশি আপা বললেন, “এই যে নিজ দেশ ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন দাঁত পড়ার রীতিনীতি নিয়ে অনুসন্ধান করলে, এ কাজ থেকে তোমাদের মনে আর কোনো প্রশ্ন জেগেছে?” ওমা শোন! সবার কত কত প্রশ্ন:

- বিভিন্ন এলাকায় দাঁত পড়ার পর যে কাজগুলো প্রচলিত, সেগুলোকে কী বলে? এগুলোর কি কোনো নাম আছে?
- দাঁত পড়া ছাড়া অন্য বিষয়ে কি এ রকম প্রচলিত নিয়ম-কানুন আছে? থাকলে কী কী বিষয়ে আছে?
- কেন ও কীভাবে একটি এলাকায় এসব নিয়ম-কানুন তৈরি হয়?
- এসব নিয়ম-কানুন কি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়?

তোমরাও চিন্তা করে দেখো তোমাদের আরও কোনো প্রশ্ন আছে কি না এই সংক্রান্ত।

দীর্ঘদিন ধরে কোনো এলাকার বা কোনো সমাজের মানুষ যে সব নিয়ম-কানুন, আচার-আচরণ মেনে চলে তাকে আমরা বলি প্রচলিত রীতিনীতি। এগুলোর পিছনে সাধারনত সেই এলাকা ও সেই সময়ের মানুষের বিভিন্ন বিশ্বাস জড়িত থাকে।

বিভিন্ন প্রচলিত রীতিনীতি অনুসন্ধান

দাঁত পড়া নিয়ে আমরা বিভিন্ন এলাকার প্রচলিত বিভিন্ন রীতিনীতি অনুসন্ধান করেছি। এছাড়া অন্যান্য বিষয়েও সমাজে নানা ধরনের রীতিনীতি প্রচলিত আছে। আমরা সেগুলোও অনুসন্ধান করতে পারি। দেখতে পারি কোনো একটি সময়কালে, নির্দিষ্ট সমাজে এগুলো কেন তৈরি হয়েছে? অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে আমরা প্রশ্ন তৈরি করি ও উত্তর খুঁজি। বয়সে যারা বড় তারা হয়তো এগুলো অনুসন্ধানে তথ্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অনুসন্ধানী কাজ-৩

বিষয়বস্তু: বাংলাদেশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত রীতিনীতি:

অনুসন্ধানের প্রশ্ন (উদাহরণ):

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক প্রবেশ করলে আমরা কেন দাঁড়াই?
- কবে থেকে এই প্রচলন এসেছে?
- কেন এই রীতির প্রচলন হলো?
- আর কোন কোন দেশে এ ধরনের রীতি প্রচলিত আছে? কোন কোন দেশে নেই?

প্রশ্নের বিষয় ও অনুসন্ধানের ধারা:

- তথ্য উৎস
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি
- তথ্য সংগ্রহ
- তথ্য বিশ্লেষণ
- ফলাফল বা সিদ্ধান্ত
- উপস্থাপন

সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি ও সামাজিক কাঠামো কি সময়ের সাথে সাথে বদলায়?

চীন দেশের প্রাচীনকালের প্রচলিত গল্প থেকে জানা যায় যে সেদেশের কোনো একটি এলাকায় একসময় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের দিকে পিছন ফিরে বসে ক্লাস করত। এখন অবশ্য তা করে না। আগের রীতিনীতি পরিবর্তিত হয়েছে। কারণ, আগে তারা বিশ্বাস করত শিক্ষকের মুখোমুখি হয়ে বসা বেয়াদবি। এখন সময়ের সাথে সাথে তাদের এ বিশ্বাসে পরিবর্তন হয়েছে, রীতিনীতিতেও পরিবর্তন এসেছে।

এসো খুশি আপার শিক্ষার্থীদের মতো আমরাও দলে ভাগ হয়ে নিজ বা অন্য সমাজের কোনো নির্দিষ্ট রীতিনীতির বা অন্য কোনো সামাজিক কাঠামো যেমন- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আইন, পরিবার ইত্যাদির পরিবর্তন অনুসন্ধান করি। আগের মতোই ধাপে ধাপে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আগাও।

অনুসন্ধানী কাজ-৪

একটি প্রশ্ন নিয়ে অনুসন্ধান কাজ শুরু করি। এটি হতে পারে আমার নিজের সমাজের অনুসন্ধান অথবা অন্য কোনো সমাজের রীতিনীতির পরিবর্তন।

বিষয়বস্তু: আমাদের রীতিনীতির পরিবর্তন

অনুসন্ধানের কিছু প্রশ্ন (উদাহরণ):

- আমার নিজ সমাজের ________________ রীতিনীতি কীভাবে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে?
- ________________ সমাজের ________________ রীতিনীতি সময়ের সাথে সাথে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে?
- আমাদের এলাকায় পেশার পরিবর্তন হয়েছে কীভাবে?
- বিভিন্ন সময় আমাদের রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয়েছে কীভাবে?
- বিভিন্ন সময় আমাদের সমাজে পরিবারের কাঠামোতে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে?

অনুসন্ধানের ধাপগুলো আরেকবার মনে কর:

১) তথ্য উৎস ২) তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ৩) তথ্য সংগ্রহ ৪) তথ্য বিশ্লেষণ ৫)ফলাফল/সিদ্ধান্ত: ৬)উপস্থাপন:

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

মিলির স্বপ্ন

কয়েক দিন ধরেই ক্লাসে খুব গন্ডগোল বেঁধে গেছে। ক্লাসের মধ্যে চলছে গুনগুন ফিসফিস। সবাইকে বেশ বিরক্ত মনে হয়। খুশি আপা আজ ক্লাসে ঢুকে বললেন, "কি হয়েছে তোমাদের, বলো তো?, সারাদিন তোমরা এত ঝগড়াঝাঁটি করছ, ক্লাসের সবাই মনে হচ্ছে এ ওর উপর রেগে আছ। তোমরা তো এ রকম করো না, মিলে মিশেই থাকো। কী হলো তোমাদের?" সবাই একসাথে হইচই করে উঠল।

আনাই বলল, "আপা, রূপা প্রতিদিন কারো না কারো জিনিস না বলে নিয়ে যাচ্ছে। আজও আমার টিফিন খেয়ে ফেলেছে"। গণেশ বলল, "আমার স্কেল না বলে নিয়ে গেছে..."। আদনান বলল,, "আমার কলম নিয়ে গেছে"...... রূপা কিছুই না বলে চুপ করে থাকে।

নাজিফা বলল, "খুশি আপা, আপনি ক্লাসে ঢুকেছেন সেটা দেখেও শিহান আজ উঠে দাঁড়ায়নি"। নন্দিনী উত্তেজিত হয়ে বলল, "কোনো শিক্ষক এলে শিহান উঠে দাঁড়াচ্ছে না"। শিহান ফিক ফিক করে হাসে। সবাই খুবি রেগে যায় তার ওপর।

এবার গণেশ বলল, "আপা রনি একটু আগে ক্লাসে ঘোষণা দিল যে আপনি নাকি আজ ক্লাস নেবেন না"। শিহান বলল, "আরে, রনি তো প্রতিদিনই সবাইকে নানা মিথ্যা কথা বলছে। রনি তার ঝাঁকড়া চুল চুলকায় এমনভাবে যেন সে কিছুই করেনি।

এ রকম অভিযোগ নানাজনের বিরুদ্ধে চলতেই থাকে। খুশি আপা বললেন, "আচ্ছা চলো এক এক জন করে সবার ঘটনাগুলো শুনি। আপা জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলো তো রনি কী করেছে? সবাই হই হই করে বলে উঠল, ও সারাদিন মিথ্যে কথা বলছে। আপা জিজ্ঞাসা করলেন, "তাতে কী হয়েছে?" সবাই তো খুশি আপার প্রশ্ন শুনে অবাক। সবাই বলল, আপা মিথ্যা বলা খুবই খারাপ। আপা জিজ্ঞাসা করলেন, "কে বলেছে, কবে বলেছে মিথ্যা বলা খুব খারাপ?" সবাই তো এবার ভাবলো খুশি আপা মনে হয় পাগল হয়ে গেছেন। এগুলো কি প্রশ্ন! কিন্তু সবাই চিন্তায় পড়ল, আসলেই তো আমরা মিথ্যা কথা কেন পছন্দ করি না? মিথ্যা বলাকে কেন আমরা খারাপ মনে করি? -------------------ধড় ফড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠল মিলি। সে বলল, "উফ কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম!"

পরদিন মিলি ক্লাসে তার মজার স্বপ্নটির কথা খুশি আপা আর তার বন্ধুদের বলল। খুশি আপা বললেন, মিলির স্বপ্নের মত উল্টাপাল্টা কান্ড থেকে অনেক সময় গুরূত্বপুর্ণ প্রশ্নও মনে জাগে। তোমরা এ থেকে অনুসন্ধানের আরও বিষয় পেতে পার।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

মুক্ত আলোচনা

কেন আমরা মিথ্যা বলাকে খারাপ মনে করি?
মিথ্যা বলা খারাপ এটা আমরা কীভাবে, কার কাছ থেকে, কবে জানলাম?
এ রকম আর কী কী বিষয় আছে যেগুলো সাধারণত আমরা সবাই পছন্দ বা অপছন্দ করি?
এগুলোকে আমরা কী বলতে পারি?

যেসব বৈশিষ্ট্য আমরা সাধারণত পছন্দ করি	যেসব বৈশিষ্ট্য আমরা সাধারণত অপছন্দ করি
১। সত্য কথা বলা	১। বড়দের সম্মান না করা
২। সময়ানুবর্তিতা	

নন্দিনী বলল, মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্যকে আমরা ভালো বলে জানি। আবার মানুষের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলো থাকলে খারাপ বলি। এগুলো হলো আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু মূল্যবোধ বা ভেলুজ (values)। সমাজে যেমন রয়েছে রীতিনীতি, তেমনি রয়েছে মূল্যবোধ।

আনাই জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, সামাজিক রীতিনীতির মতো সামাজিক মূল্যবোধ বা ভেলুজ (values)গুলোও কি পরিবর্তিত হয়?

সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনশীলতা অনুসন্ধান

এবারে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে শিক্ষার্থীরা সময়ের সাথে সাথে এবং স্থানভেদে মূল্যবোধের পরিবর্তন অনুসন্ধান করব।

অনুসন্ধানী কাজ-৫

বিষয়বস্তু

কিছু অনুসন্ধানের প্রশ্ন (উদাহরণ)

- বর্তমানকালে বাংলাদেশের মানুষ বড়দেরকে সম্মান করা নিয়ে কী ধরনের মূল্যবোধ ধারণ করে আর আগে বাংলাদেশের মানুষ বড়দেরকে সম্মান করা নিয়ে কী ধরনের মূল্যবোধ ধারণ করত?
- বাংলাদেশের মানুষ বড়দেরকে সম্মান করা নিয়ে যে মূল্যবোধ ধারণ করে অন্য দেশের মানুষও কি একই রকম মূল্যবোধ ধারণ করে, নাকি ভিন্ন রকম?

বন্ধুর দলের কাজের মূল্যায়ন করি

আদর্শ/ প্রত্যাশা →	অনুসন্ধানের প্রশ্ন (প্রশ্নটি বা প্রশ্নগুলো সুনির্দিষ্ট, আকর্ষণীয় ও অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে সমাধান যোগ্য)	প্রশ্নের মূল বিষয়বস্তু (প্রশ্নে যে মূল বিষয় আছে সেগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছে)	তথ্য উৎস (প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার জন্য এক বা একাধিক উপযুক্ত তথ্য উৎস উল্লেখ করতে পেরেছে)	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করতে পেরেছে)	তথ্য সংগ্রহ (পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও রেকর্ড করতে পেরেছে)	তথ্য বিশ্লেষণ (সঠিক উপায়ে তথ্য সাজিয়ে/ হিসাব-নিকাশ করে অনুসন্ধানী প্রশ্নের উত্তর পেয়েছে/ সমাধানে পৌঁছতে পেরেছে)	ফলাফল উপস্থাপন (স্পষ্টভাবে ও আকর্ষণীয় উপায়ে অনুসন্ধানী প্রক্রিয়া আর ফলাফল উপস্থাপন করেছে)	মন্তব্য/ ফিডব্যাক
দল-১								
দল-২								
দল-৩								
দল-৪								
দল-৫								

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

নিজ দলের সদস্যদের মূল্যায়ন

পুরোপুরি করেছে, কিছুটা করেছে, আরও অনেক উন্নতি করতে হবে এই কথাগুলো ব্যবহার করে ফিডব্যাক দিতে পারব আমরা।

দলের সদস্যদের নাম	অংশগ্রহণ (পুরো অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে)	অন্য সদস্যদের সাহায্য করা (যখন যে সদস্যের সাহায্য প্রয়োজন, নিজেই আগ্রহ নিয়ে সাহায্য করেছে)	অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা (সব সময় নিজের মতের সাথে না মিললেও বন্ধুদের মতামতকে শ্রদ্ধা করেছে)	মতামত বা ফিডব্যাক
আনাই				
কাঁকন				
নাহিদ				
গণেশ				

সব দল নানা উপায়ে তাদের সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনশীলতার অনুসন্ধান উপস্থাপন করল। তারা সবাই একমত হলো যে:

কিছু কিছু সামাজিক মূল্যবোধ আছে যেগুলো সাধারণত পৃথিবীর সব দেশেই একই রকম যেমন মিথ্যা বলা বা চুরি করাকে খারাপ মনে করা আর সবার সাথে মিলে মিশে থাকাকে ভালো মনে করা হয়। আবার কিছু কিছু মূল্যবোধ আছে যেগুলো সমাজ বা দেশ ভেদে ভিন্ন হতে পারে। সময়ের সাথে সাথেও আমাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়। এগুলো কোনোটাই অপরিবর্তনীয় বা ধ্রুব নয়।

আমাদের জীবনে সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের চর্চা

এবারে বন্ধুরা দলে বসে কিছু সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের তালিকা তৈরি করল, সেখান থেকে বাছাই করে তারা ১০টি সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধ নির্ধারণ করল, যা তারা দৈনন্দিন জীবনে চর্চা করতে চায়। এ জন্য তারা কাগজের গাছ বানাল- রঙিন কাগজে গাছ এঁকে তা কাটল। এবার তা লাগাল ক্লাসের দেয়ালে। গাছগুলোর শাখা-প্রশাখা আছে কিন্তু কোনো পাতা নেই। যখন তারা কেউ নির্দিষ্ট কোনো সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত কাজ করে তখনই সেটি একটি রঙিন কাগজের পাতায় লিখে নির্দিষ্ট গাছে তাদের নামসহ জুড়ে দেয় বছর শেষে গাছটি পাতায় পাতায় ভরে ওঠে। সে রকম একটি গাছের ছবি নিচে দেখানো হলো।

বছর শেষে আমরা গাছগুলো ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করি। নিচের বাক্সে তোমাদের এই গাছ নিয়ে চিন্তার জন্য কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে। বছর শেষে প্রশ্নগুলো অনুসারে গাছগুলো নিয়ে আমরা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করব।

চিন্তা করি

- কোন গাছে বেশি পাতা হলো?
- আমি কোন গাছে বেশি পাতা যোগ করেছি?
- কোন গাছে সবচেয়ে কম পাতা যোগ করেছি?
- কোন ধরনের চর্চা আমি বেশি করছি? কোনগুলোতে আমার আরও চর্চার প্রয়োজন? কিভাবে তা করতে পারি?

অর্থনৈতিক ইতিহাস জানার উপায়

শহরের একটি স্কুলের তিনজন শিক্ষার্থী- আবিদ, ইলিন, রেনু। ক্লাসের ফাঁকের আলাপচারিতায় ইলিন তার বাবার সংগ্রহে থাকা কয়েকটা পুরাতন মুদ্রা বন্ধুদেরকে দেখালো। সকলের চোখে-মুখে বিস্ময়। এমন মুদ্রা আগে কখনো তারা দেখেনি। এতো কম মূল্যমানের মুদ্রা কি হতে পারে? এক আনা, এক পয়সা, পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, পঞ্চাশ পয়সা ইত্যাদি। প্রতিটি মুদ্রায় একটি করে সাল লেখা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানী মনে কৌতূহল বেড়েই চলেছে। নানান প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

মুদ্রাগুলো কোন ধাতু দিয়ে তৈরি? মুদ্রার মান কম-বেশি হয় কেনো? মুদ্রায় অঙ্কিত চিহ্ন আর ছবিগুলোর কি কোনো ইতিহাস আছে? বাংলা অঞ্চলের মানুষ কবে থেকে মুদ্রা ব্যবহার করতে শিখেছে?

১৮৫৬

১৯১০

১৯৭৩

১৯৭৪

১৯৭৫

২০১২

ব্রিটিশ বাংলা প্রদেশ এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের মুদ্রা চালু ছিল।
উপরে তোমরা তেমনি কিছু মুদ্রার ছবি দেখতে পাচ্ছো।

শিক্ষার্থীরা এরকম নানান প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। ক্লাসে প্রবেশ করলেন খুশি আপা। মুদ্রাগুলো দেখে তিনি জানালেন, সেগুলো ব্রিটিশ বাংলা প্রদেশ এবং স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশিত কয়েকটি ধাতব মুদ্রা। ৪ জানুয়ারি ১৯৭৩ সাল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে ধাতব মুদ্রা চালু হয়েছে। তারও আগে যখন ব্রিটিশ বাংলা প্রদেশ গড়ে তোলা হয়েছিল তখনকার সময়েরও কয়েকটা মুদ্রা আপা চিহ্নিত করলেন।

ইতিহাসবিদ বি এন মুখার্জী মুদ্রা নিয়ে অনেকগুলো বই রচনা করেছেন। সেই বই থেকে সংগৃহীত কিছু চিত্র দেখিয়ে খুশি আপা বললেন, এগুলো বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রা। এগুলো নানান

ধাতু দিয়ে তৈরি – তামা, রুপা, স্বর্ণ ইত্যাদি। এগুলোর রয়েছে নানান নাম – ছাঁচে ঢালা তাম্রমুদ্রা, ছাপাংকিত রৌপ্যমুদ্রা, শশাঙ্কের স্বর্ণমুদ্রা, গুপ্ত অনুকরণ মুদ্রা, হরিকেল মুদ্রা ইত্যাদি। এগুলোর ধারাবাহিকতায় রাজা-বাদশাগণ মুদ্রা প্রকাশ করেছেন নিয়মিতভাবে। প্রথমদিককার মুদ্রায় কোনো অক্ষর বা লেখা থাকতো না। থাকতো কিছু চিহ্ন। মুদ্রাগুলোও ছিল এবড়ো-থেবড়ো। ধীরে ধীরে মুদ্রার আকার, আকৃতি, প্রকৃতি, ওজন ইত্যাদি নির্ধারিত হয়েছে। মুদ্রার মূল্যমান বেড়েছে। মুদ্রা জারি করে রাজা-বাদশাগণ নিজেদের ক্ষমতা এবং সার্বভৌমত্ব প্রকাশ ও প্রচার করেছেন। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় মুদ্রা এক অপরিহার্য উপাদান।

আদিকালে মানুষ বিনিময় প্রথার মাধ্যমে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজগুলো সারতেন। পারস্পরিক আদান-প্রদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি পণ্যের বিনিময়ে অন্য একটি পণ্য গ্রহণ করতেন। কিন্তু মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম যতো বেড়েছে, ততোই কমেছে পণ্য বা যেকোনো সামগ্রী বিনিময়ের প্রথা। প্রয়োজন হয়েছে সহজে বহনযোগ্য ও বিনিময়যোগ্য কোন মাধ্যম। মুদ্রার উদ্ভব মূলত এভাবেই।

প্রথমদিকে মুদ্রা হিসেবে পাথর, কড়ি এবং গুটির ব্যবহার শুরু হয়। তারপরে আসে বিভিন্ন ধরণের ধাতু দিয়ে তৈরী মুদ্রা যেমন তামা, রূপা ও সোনা। সাধারণ পূর্বাব্দ ৬ শতকে গ্রীসে প্রথম ধাতব মুদ্রা ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়। চীনে সাধারণ অব্দ ৭ শতকে প্রথমবারের মতন কাগজের মুদ্রার প্রচলন ঘটেছিল। তারপরে ব্যাপকভাবে অর্থনীতির কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় এই কাগুজে মুদ্রার ধরণ ও প্রকারে নানারকম তারতম্য হয়েছে।

খুশী আপার কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনছিলো আবিদ, ইলিন আর চিত্রালী চাকমা সহ অনেকে। ওদের কল্পনায় এখন ইতিহাসের জগৎ আরো বিশাল। পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী চিত্রালী প্রায়শই বড় বড় পাহাড় আর পাহাড়ের প্রতিকূল পরিবেশে মানুষের টিকে থাকার নানান গল্প বলে। বলে তাদের এলাকার বিখ্যাত জুম চাষের কথা। আবার সিলেটের আবিদ ওদেরকে ছোট ছোট টিলার মধ্য দিয়ে বয়ে চলা সবুজে ঘেরা চা বাগানের গল্প বলে। দূর দিগন্ত জুড়ে দাড়িয়ে থাকা বড় বড় পাহাড়, পাহাড় বেয়ে নেমে আসা ঝর্ণা, বর্ষাকালের ঢল কত গল্পই না করে চিত্রালী চাকমা আর আবিদ। এই ঢল থেকে হয় বন্যা। বন্যায় ভেসে যাওয়া জনপদ আর বিপর্যস্ত মানুষের কথা তারা অনেকবার শুনেছে।

বাবার সাথে ইলিন ঘুরেছে বাঙলার দক্ষিণাংশের অনেক স্থানে। সে দেখেছে কীভাবে সমভূমির মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে অসংখ্য নদ-নদী। ছোট ছোট নৌকা করে জেলেদের মাছ ধরতে দেখেছে, নদীর পানির সেচে ফসল হতে দেখেছে। এরকম নানাবিধ অর্থনেতিক কাজকর্মের কথা শিক্ষার্থীরা ভাবতে থাকে। ইতিহাসে এমন অর্থনেতিক কাজকর্মের ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে থাকে আঞ্চলিক ভিন্নতা, বৈচিত্র্য আর ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি ও রাজনীতির পার্থক্য।

বাংলা অঞ্চলে ভূ-প্রকৃতির নানান বৈচিত্র্য যেভাবে অর্থনৈতিক কাজকর্মের ধরণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে, অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা জানতে শিক্ষার্থীরা এখন উদগ্রীব। মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের আকার বৃদ্ধি এবং

সেই কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রকৃতির ব্যবহার সম্পর্কে জানতেও তারা আগ্রহী। খুশি আপা সবাইকে অনুপ্রাণিত করলেন। তিনি বললেন, ইতিহাসের পরিসর অনেক বড়। তবে মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া সকল অতীত ঘটনা একসূত্রে গাঁথা থাকলেও এটিকে দেখার ও বুঝার দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা আছে। যেমন মানুষের ইতিহাসের প্রায় সকল ঘটনার সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উপাদানের উপস্থিতি থাকে। ইতিহাসে সবচাইতে বেশি প্রভাব রাখে ভূ-প্রাকৃতিক স্থান আর অর্থনৈতিক উপাদান। এই দুটি উপাদানের ভিত্তিতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উপাদানের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়।

৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ইতিহাসে ভূগোলের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা জেনেছি। এবার জানবো, অর্থনৈতিক কাজকর্মের কারণেই ইতিহাসের পথ ধরে মানুষ পৃথিবীব্যাপী ছুটে বেড়িয়েছে। যাযাবর জীবন অতিবাহিত করেছে। নতুন নতুন ভূ-খন্ডে বসতি গড়ে তুলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মতো ভারতবর্ষ এবং বাংলা অঞ্চলেও শাসক শ্রেণি বড় বড় রাজ্য গড়ে তুলেছে। সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। বহিরাগত শক্তি উপনিবেশ গড়ে তুলেছে, সম্পদ দখল করেছে, সম্পদের অসম বন্টন করেছে। সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রেও নানাভাবে ভূমিকা রেখেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য আর সম্পদ ভোগ দখলের একপর্যায়ে রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূচনাতেও রয়েছে তাদের ভূমিকা।

সহজ পাঠ: অর্থনৈতিক ইতিহাস কাকে বলে?

প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই মানব বসতি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট স্থানের ভূমির বৈশিষ্ট্য, মাটির উর্বরতা, জলবায়ু, পানির প্রচুরতা এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদের প্রাচুর্য ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। আদিকাল থেকেই মানুষ বেঁচে থাকার জন্য বসবাসের সর্বাপেক্ষা উপযোগী অঞ্চলগুলো খুঁজে বের করতে চেয়েছে। এই ভূমিকে ব্যবহার করে মানুষ তাদের বসতি, কৃষি এবং শিল্প গড়ে তুলেছে।

ভৌগোলিক পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার অনুকূল সুযোগের ফলেই মানব বসতি গড়ে উঠেছিলো। মানব ইতিহাসের আদিপর্বে সকল ঘটনার সাথে অর্থনীতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত। অর্থনৈতিক ইতিহাস মূলত ইতিহাসের এমন একটি শাখা যেখানে অতীতের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনর্গঠনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসকে দেখা হয়। অর্থনৈতিক ইতিহাস মানুষের অতীতকালের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যেমন কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের নানান দিক, পরিবর্তন আর রূপান্তরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে অর্থনীতি কীভাবে মূখ্য ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ক আলোচনাও অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

অনুশীলনী

এসো নিজে করি

প্রতিদিন চারপাশে আমরা নানান রকমের উপাদান যেমন ঘরবাড়ি, নদীনালা, জলাভূমি, শস্যক্ষেত্র, খামার, কলকারখানা, হাট-বাজার দেখি। এগুলোর সঙ্গে রয়েছে মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের গভীর যোগসূত্র। চলো, এইসব উপাদান অর্থনীতির সঙ্গে কীভাবে যুক্ত তা নির্ণয় করে নিচের ছকটি পূরণ করি-

উপাদান	অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যেভাবে যুক্ত
নদী	নদীতে মাছ পাওয়া যায়। বাজারে মাছ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা যায়।
খামার	
বাজার	
শস্যক্ষেত্র	
রাস্তা	
কারখানা	
পাহাড়	
অরণ্য/ জঙ্গল	

মানুষের ইতিহাসে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ও ধারাবাহিক রূপান্তর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তা নিয়ে আবিদ, ইলিন আর চিত্রালি চাকমার মাথায় ঘুরছে অনেক জিজ্ঞাসা। খুশী আপা জানালেন যে, পরের ক্লাসে শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধান করবে অর্থনৈতিক ইতিহাস কী, এই ইতিহাসের উৎসগুলো কেমন, উৎসের বৈশিষ্ট্য, ভিন্নতা এবং উৎস থেকে কীভাবে ইতিহাস জানা যায় সেই প্রসঙ্গে। অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে যুগ বিভাজনের সমস্যা নিয়েও শিক্ষার্থীরা শিখবে।

অর্থনৈতিক ইতিহাসে যুগ বিভাজন কেমন হবে?

আদিম মানুষেরা গুহায় বসবাস করতো, তাদের অর্থনীতি ছিলো শিকার বা সংগ্রহভিত্তিক। এরপর এসেছে প্রত্ন-প্রস্তর বা পুরোনো পাথরের যুগ, মধ্য পাথরের যুগ আর সব শেষে নব্য-প্রস্তর বা নতুন পাথরের যুগ। মানুষ পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের বাস্তবতায় ভিন্ন ভিন্নভাবে টিকে থাকার কলা-কৌশল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। ক্রমেই স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছে।

গোত্রভিত্তিক অর্থনীতির যুগ পেরিয়ে পেশাভিত্তিক কাজের বিকাশ ঘটেছে। খাদ্য সংগ্রহমূলক অর্থনীতি রূপান্তরিত হয়েছে উৎপাদনের অর্থনীতিতে। মানুষ ঘটিয়েছে কৃষি বিপ্লব। চাকা আবিষ্কার করেছে। নগর বিপ্লব ঘটিয়েছে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের কারণে। এরপর খাদ্য উৎপাদন, শিল্প উৎপাদন, বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়েছে। খাদ্য ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণে নেয়ার প্রতিযোগিতাও শুরু করেছে কিছু মানুষ নিজেদের ক্ষমতা আর যোগ্যতার দোহাই দিয়ে। এভাবেই মানুষের অর্থনৈতিক জীবন এগিয়ে গেছে, পরিবর্তন ঘটেছে, পরিবেশ আর সময়ের ভিন্নতায় বহুবিচিত্র রূপে বদলে গেছে।

দলবদ্ধভাবে শিকার ও খাদ্য সংগ্রহমূলক অর্থনীতির যুগ। প্রত্ন-প্রস্তর বা পুরোনো পাথরের যুগে মানুষের জীবন-যাপনের খন্ড চিত্র। কৃষির আবিষ্কার তখনও ঘটেনি। কৃষির আবিষ্কারের আগের যুগকে তাই অর্থনীতির ভাষায় শিকার ও সংগ্রহের যুগ বলা হয়।

পুরোনো, মধ্য এবং নতুন পাথরের যুগের হাতিয়ার ও জীবন-যাপনের নানান নমুনা উপরের কয়েকটা চিত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছো। এসকল যুগের সময়কাল কতোটুকু তা পরের পৃষ্ঠায় যুগ বিভাজন রেখা অংকন করে দেখানো হয়েছে। পুরনো পাথরের যুগে মানুষ সবচেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করেছে। নতুন পাথরের যুগে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ফলে নতুন নতুন শ্রেণির উত্থান ঘটতে শুরু করে। যেমন বণিক শ্রেণি, কারিগর শ্রেণি, ব্যবসায়ী শ্রেণি ইত্যাদি।

এরা সকলে অর্থনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। এরপর তামা, লৌহ ও ব্রোঞ্জ যুগে মানুষ প্রবেশ করে। আনুমানিক ৪০০০ প্রাক-সাধারণ অব্দ থেকে এইসব যুগের শুরু। মিশর ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে এই যুগগুলোতে বিকশিত অর্থনৈতিক সভ্যতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। সুমেরীয় সভ্যতায় মুদ্রাভিত্তিক বাণিজ্য ও বাজার অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল।

ঐতিহাসিককালের প্রথম দিকে অর্থনীতি ছিলো মোটাদাগে বিশ্বজনীন। আলেকজান্ডার ও জুলিয়াস সিজারের মতো নাম করা যোদ্ধা ও শাসকদের একের পর এক যুদ্ধাভিযান পরিচালনার ফলে বহুজাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনা ঘটে। ইউরোপের সাথে এশিয়ার দেশগুলোর বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক উৎসগুলোতে এই সময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা চালুর প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থনীতি চিন্তার সূত্রপাত এসময়ে ঘটেছে। হিসিয়েদ, কৌটিল্য, এরিস্টটল, জেনোফোন, এরিস্টোফেন প্রমুখ অর্থনীতি সংক্রান্ত নানান আলোচনা তাদের গ্রন্থাদিতে যুক্ত করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশ, বাংলা অঞ্চল ও বাংলাদেশের প্রাগিতিহাস এবং ইতিহাসের কালবিভাজন

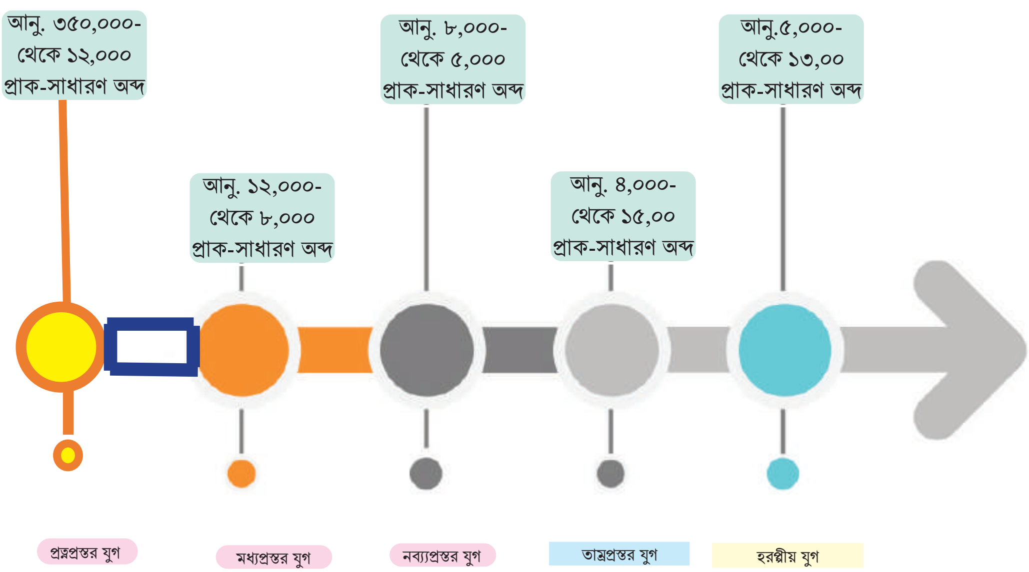

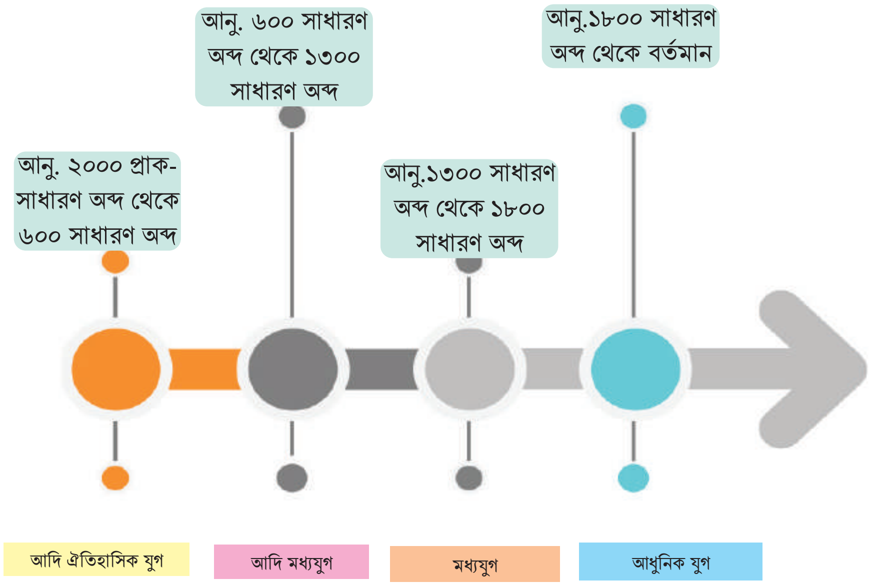

একটা মজার বিষয় খেয়াল করলে দেখবে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূ-খণ্ডে অর্থনৈতিক ইতিহাস ছিল বহুমুখী। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই চলেছে অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে। প্রাচীনকালে ভারত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেন ও যোগাযোগ বিস্তার করেছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশমালা ও দ্বীপপুঞ্জের উপর। ইউরোপ, চীন এবং আরব ভূ-খণ্ডের সঙ্গে ভারতের নিয়মিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। মুদ্রা অর্থনীতি ভারতে বহু পূর্বেই চালু হয়েছিল

বাংলা অঞ্চলের অর্থনীতি: এক নজরে

ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বাঙলা অঞ্চলে ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময় পরিবেশের কারণে জলনির্ভর অর্থনৈতিক জীবন ও ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে সংযোগ প্রাকৃতিক সীমানা বিধৃত এই ভূ-খন্ডকেই পরবর্তীকালে ভূগোলবিদগণ 'বাংলা অঞ্চল' নামে অভিহিত করেন। এই বাংলা অঞ্চলের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব ধারায় পরিচালিত হয়েছে, এখনও হয়ে থাকে। নদী, জঙ্গল আর পাহাড়ের কারণে বাংলার আঞ্চলিক এই ভূ-খণ্ড ইতিহাসের দীর্ঘ সময় জুড়ে বিচ্ছিন্নভাবে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। এই ভূ-খণ্ডের অর্থনীতি তাই সম্পূর্ণ নিজের নিয়মে গড়ে উঠেছে এবং ধীরে ধীরে বিশ্ব বাজার অর্থনীতিতে সংযুক্ত হয়েছে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এবার চলো অর্থনৈতিক ইতিহাস জানার উপায় সম্পর্কে জানি

তোমরা এখন সবাই জানো যে, উৎস ছাড়া ইতিহাস জানার কোনো উপায় নেই। তোমাদেরকে যদি বলা হয় যে, অতীতে মানুষ কেমন জীবন-যাপন করতো? কেমন ছিলো তাদের পোশাক, খাবার, প্রযুক্তি, জীবন-জীবিকা? বর্তমানের অভিজ্ঞতায় তুমি হয়তো কল্পনা করে কিছু একটা ধারণা দিতে পারবে। তোমার কল্পনায় অতীতকালের মানবীয় কাজকর্মের চিত্রায়ন হয়তো কিছুটা ফুটে উঠবে কিন্তু সেটাকে ইতিহাস বলা যাবে না।

ইতিহাস হতে হলে সেখানে উৎস থাকতে হবে। আবার কেবল উৎস থাকলেই হবে না। সেই উৎসকে প্রশ্ন করতে হবে, যাঁচাই-বাছাই করতে হবে, সমালোচনামূলক পদ্ধতিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। বিভিন্ন সময়ে লেখা বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে এবং নানান মানুষের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে কোনো একটি স্থান বা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক ইতিহাস অনেকসময় মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত অনেক মিথ বা কল্প-কাহিনী থাকে। এইসব কল্প-কাহিনী অনুযায়ী কিছুতেই ধরে নেওয়া যাবে না যে কোনো একটি অঞ্চলে বা দেশে অতীতে ‘স্বর্ণযুগ’ ছিল কিংবা জিনিসপত্রের দাম ছিল খুবই সস্তা। এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে নানান প্রকার উৎস পর্যালোচনা করে দেখা দরকার যে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা প্রকৃতপক্ষে কেমন ছিল? মূল উৎসের বাইরে আরো নানান সহায়ক উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে বিজ্ঞানসম্মত এবং নৈর্ব্যক্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস জানা ও বুঝার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি এবং কলা-কৌশল অবলম্বন করা ইতিহাসবিদের জন্য প্রধান কর্তব্য।

ইতিহাসের নানান উৎস বা উপাদান-বৈশিষ্ট্য আর বৈচিত্র্য

ইতিহাস নানান ধরনের হয়ে থাকে। যেমন পরিবেশের ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি। অর্থনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে একজন ইতিহাসবিদকে কেবল অর্থনীতি সম্পর্কিত উৎসের উপর নির্ভর করতে হবে বিষয়টা কিন্তু এমন নয়। অন্যান্য ইতিহাসের বিষয়বস্তুর সাথেও অর্থনৈতিক ইতিহাসের রয়েছে সরাসরি যোগসূত্র।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস জানার প্রাসঙ্গিক লিখিত উৎসের অভাবের কারণে আমাদের নির্ভর করতে হয় মূলত পাথুরে হাতিয়ার এবং কোনো একটি প্রত্নস্থল খনন করে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর উপর - যেমন সমাধি, বাসস্থান, হাড়, মৃৎপাত্র, পাথরের হাতিয়ার ও অন্যান্য ধাতু যেমন তামা, লোহার সরঞ্জামাদি ও হাতিয়ার।

সুমেরীয় সভ্যতার কিউনিফর্ম ও মিশরীয় সভ্যতার হায়রোগ্লিফিক লিখনপদ্ধতি আবিস্কারের সময়কাল থেকে আমরা ইতিহাসে লিখিত উৎসের অস্তিত্ব পাই। মেসোপটেমীয় সভ্যতায় এমন একটা আইন গ্রন্থ পাওয়া গেছে যা ঐযুগের ইতিহাসের অনেক তথ্যকে সামনে নিয়ে এসেছে। মেসোপটেমিয়ার সকল সভ্যতার অর্থনৈতিক জীবনের কিছু ধারণাও এই উৎসগুলোতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে মানুষের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, মুদ্রা, নানান ধরণের সাহিত্যিক উপকরণ, সম্রাট বা রাজা কর্তৃক জারিকৃত ভূমি লেনদেন বা ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল (শিলালিপি, তাম্রশাসন ইত্যাদি), রাজা বা তৎকালীন সমাজের কোনো অভিজাতের গুণকীর্তনে রচিত গ্রন্থ, ভ্রমণ-বৃত্তান্তসমূহে প্রতিফলিত তথ্যাবলী ইত্যাদি উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রাচীন ভারতের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অর্থনীতিবিদ কৌটিল্য 'অর্থশাস্ত্র' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন যেটি আজো জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুনিয়ায় ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস থেকে একটা উদাহরণ দেয়া যাক। ১২০০ সাধারণ অব্দের আশে-পাশে সময়ে বাংলা-বিহারের ভৌগোলিক এলাকায় 'কৃষি পরাসর' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল। গ্রন্থটিতে ভারতের পূর্বাংশের কৃষিকাজ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া গেছে। কখন, কীভাবে ফসল বুনতে হবে, সেচ দিতে হবে এবং ফসল কাটার পর উৎসব নিয়েও বর্ণনা পাওয়া যায় গ্রন্থটিতে। জমিতে সারের ব্যবহার, একফসলি, দুই ফসলি জমির বর্ণনাও রয়েছে এই গ্রন্থে।

গ্রন্থটি নিয়ে কাজ করেছেন বাঙলা অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস বিশেষজ্ঞ জাপানি ইতিহাসবিদ ড. রিয়াসুকে ফুরুই। তিনি যাচাই-বাছাই করে এই গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গ্রন্থটির নানান সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও তিনি অনেক তথ্য দিয়েছেন। এই হলো ইতিহাস লেখার আসল কথা। যেকোনো ধরণের পুরনো উৎস বা গ্রন্থ পেলেই তা থেকে হুবহু ইতিহাস গ্রহণ করা যায় না। বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়। ঐ উৎসের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয়। উৎসটি কে বা কারা কবে কখন এবং কেনো রচনা করেছিলেন তা গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হয়। তবেই কেবল যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

ইতিহাসের উৎস: তালপাতায় লেখা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের লিপি

ইতিহাসের উৎস:
তামার পাতে খোদাই করা তাম্রলিপি

ইতিহাসের উৎস:
পুরানো বাংলা হরফে লেখা পুঁথি

ইতিহাসের উৎস:
প্যাপিরাসে লেখা হায়ারোগ্লিফিক লিপি

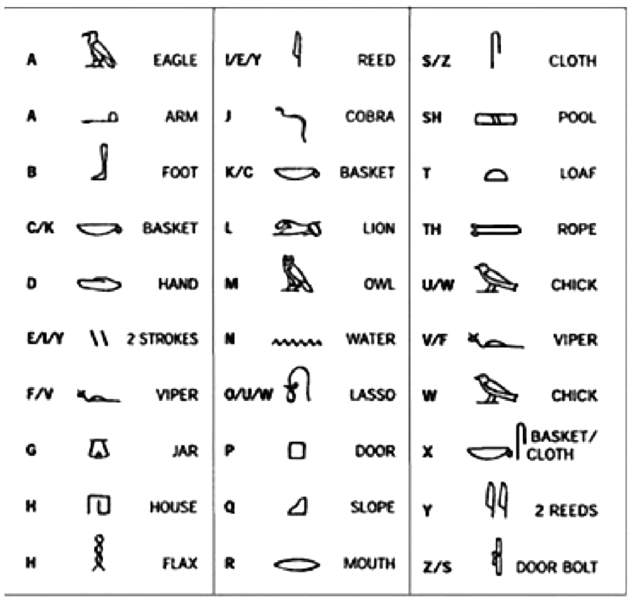

ইতিহাসের উৎস:
কয়েকটি হায়ারোগ্লিফিক লিপির অর্থ দেওয়া হল ইংরেজিতে

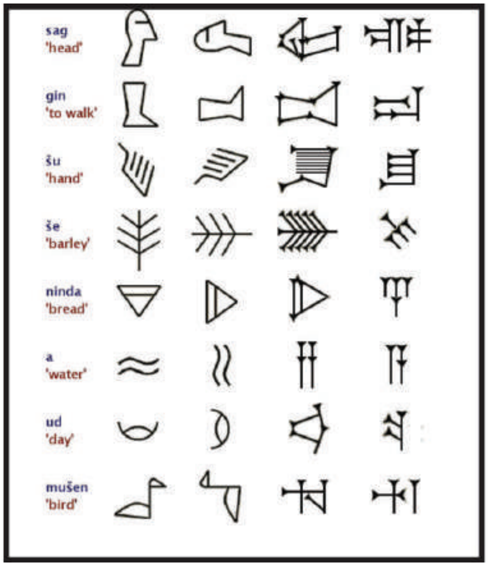

ইতিহাসের উৎস:
পূর্ণ বিকশিত কিউনিফর্ম লিপি

ইতিহাসের উৎস:
পাহাড়ের গুহার দেয়ালে খোদাই করা লিপি

বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন প্রত্নস্থানে খনন কাজ চালিয়ে নানান ধরনের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। ছবিতে কিছু ছাপাংকিত রূপা ও তামার মুদ্রা দেখতে পাচ্ছো। রূপা-তামা ছাড়াও নানান ধরণের মূল্যবান এবং স্বল্পমূল্যের ধাতু দিয়ে প্রাচীনকালে মুদ্রা তৈরি করা হতো। এই মুদ্রাগুলোতে পাখি, নৌকা/ জাহাজ, মাছ, সূর্য ইত্যাদি নানান প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহৃত হতো। অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন পাঠে এগুলোর বিনিময় মাধ্যম সম্পর্কেও আমরা জ্ঞান লাভ করবো। এগুলো অর্থনৈতিক ইতিহাস জানার উৎস হিসেবে খুবই গুরুত্ব পূর্ণ।

১৮০০ সাল বা সাধারণ অব্দের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে উৎসের পরিমাণ বেড়েছে। বিশেষ করে সরকারি দলিল-পত্র, সংবাদ ও সাময়িকপত্র সংরক্ষণ করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। একইসঙ্গে জাদুঘরসমূহে প্রাচীনকালে মানুষের ব্যবহৃত অনেক সামগ্রী সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এসকল উৎসের যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে ইতিহাস রচনা করা প্রয়োজন।

ইতিহাস ও অর্থনৈতিক ইতিহাস কেন জানবো?

ইতিহাস এমন একটি বিষয় যা অতীতের আলোকে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। একজন মানুষ যদি তার বর্তমানকে বুঝতে চান, তাহলে নিজের অতীত ভালোমতো অনুধাবন করতে হবে। আর এই কাজে সমালোচনামূলক অনুসন্ধানী ইতিহাস পাঠ গভীরভাবে সাহায্য করতে পারে।

ধরা যাক, একদল মানুষ পৃথিবীর কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে মিলেমিশে প্রাকৃতিক নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে টিকে আছে। কখনো তারা বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে, কখনো নতুন কোনো প্রযুক্তিগত বা অন্যান্য আবিষ্কার করে বেঁচে থাকার বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে অর্জিত এইসকল অভিজ্ঞতা মানুষের পৃথক পৃথক বর্তমান তৈরি করেছে। মানুষের অতীত কাজকর্মের যোগ্যতা ও দক্ষতা যদি স্মৃতিতে না থাকে, তাহলে সেই মানুষের কোনো বর্তমান থাকে না, স্বপ্ন দেখার মতো ভবিষ্যৎও থাকে না। সেই মানুষের বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে যায়।

ইতিহাসের মতোই অর্থনৈতিক ইতিহাস জানা ও বুঝার প্রয়োজন একই। অর্থনৈতিক ইতিহাস হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে বসবাসকারী সকল মানুষের অতীতে একসঙ্গে মিলে-মিশে অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনার বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা। মনে রাখবে, ইতিহাস আমাদের সকলের সমষ্টিগত স্মৃতিকে খুঁজে বের করে। অভিজ্ঞতাকে সামনে নিয়ে আসে। এই অভিজ্ঞতাই পারে একদিকে মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং প্রাণ-প্রকৃতিকে রক্ষা করতে। পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মানুষ যদি অতীতে প্রকৃতিকে কেনো ও কীভাবে হুমকীর মুখে ফেলেছে তা যদি ইতিহাসের পাঠ থেকে জানতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে মানুষ সেই কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে।

মানুষে মানুষে সাদৃশ্য ও ভিন্নতা

বেদে-কন্যা

সামনে স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া উৎসব। তাই নিয়ে ক্লাসের সবার অনেক জল্পনা-কল্পনা। "আমি তিনশত মিটার দৌড়ে অংশ নেবো! আমি খেলব মোরগ লড়াই! হাঁড়ি ভাঙার খেলায় সবচেয়ে বেশি মজা হয়!"— টিফিনের সময় তুমুল আলোচনা চলছিল।

সালমা: আমি 'যেমন খুশি তেমন সাজো'তে বেগম রোকেয়া সাজব।

শিহান: আমি সাজব 'বঙ্গবন্ধু'। আমার দাদুর মোটা কালো ফ্রেমের চশমাটা পরব। ডান হাতের তর্জনি তুলে সাতই মার্চের ভাষণ দেবো। ভাষণটা আমি একটুখানি পারি, আরও ভালো করে শিখে নেবো।

মামুন: আমি সাজব রাখাল ছেলে। মাথায় গামছা বেঁধে বাঁশি বাজাব। আমি বাঁশের বাঁশি বাজাতে পারি।

মিলি: আমি বেদে-কন্যা সাজব। আমাদের স্কুলের অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে সানজিদা আপুকে তো চেন, ওদের বেদে পরিবার। আপু আমাকে সাজিয়ে দেবে বলেছে।

আদনান: সানজিদা আপুকে বললে আমাকে সাপুড়ে সাজিয়ে দেবে?

মিলি: আমি বলে দেখব। নিশ্চয়ই দেবে।

আদনান: আমি তাহলে 'বাবুরাম সাপুড়ে' সাজব। আমার কাছে একটা খেলনা বীণ বাঁশিও আছে।

সবাই তখন যেমন খুশি তেমন সাজোতে কে কী সাজবে, কেমন করে সাজবে— তাই নিয়ে দারুণ দারুণ সব পরিকল্পনা করতে লাগল। কেউ সাজবে চাকমা মেয়ে, কেউ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেউ আইনস্টাইন, কেউ প্রীতিলতা, কেউ মুক্তিযোদ্ধা। ওরা এই গল্পে এমন মজা পেল যে কখন ক্লাস শুরুর ঘণ্টা পড়ল আর কখন খুশি আপা এসে ক্লাসে ঢুকলেন, ওরা খেয়ালই করল না।

খুশি আপা: কী এত মজার কথা হচ্ছে?

হানসা: আমরা খেলার উৎসব নিয়ে কথা বলছিলাম। যেমন খুশি তেমন সাজোতে কে কী সাজবে সেই কথা নিয়ে মজার আলাপ হচ্ছিল।

খুশি আপা: তাই নাকি! বাহ্, দারুণ মজার তো!

এরপর খুশি আপার কাছে ওরা কে কী সাজবে, কীভাবে সাজবে বিস্তারিত বলতে লাগল। খুশি আপা বললেন, তোমরা তো অসাধারণ সব পরিকল্পনা করেছ! তিনি যখন জানলেন, মিলি বেদে-কন্যা সাজতে চায়, তখন বললেন, আমাদের এলাকায় কয়েক দিন হলো একটা বেদের বহর এসেছে। আনাই বলল, বেদের বহর মানে কী? খুশি আপা বললেন, আমাদের এলাকার বেদেরা যেমন ঘরবাড়ি বানিয়ে থাকে, সব বেদে তেমনভাবে থাকে না। অনেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে নৌকায় চড়ে দেশের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। ওরা সবাই খুশি আপাকে ধরল, "আমরা বেদের বহর দেখতে যেতে চাই"।

এক সকালে ওরা খুশি আপার সঙ্গে বেদের বহর দেখতে গেল।

দেখে আসি বেদে বহর

খুশি আপার সঙ্গে সবাই নদীর দিকে গেল। নদীর তীর ঘেঁষে সারি সারি নৌকার যেন মেলা বসেছে। নৌকায় আর তীরে নানান বয়সি অনেক মানুষ। ওরা হেঁটে হেঁটে দেখতে লাগল।

একটি মেয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এলো। খুশি আপার কাছে জানতে চাইল, কাউকে খুঁজছেন?

খুশি আপা: আমরা তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছি। তোমাদের সর্দারের সঙ্গে গতকাল আলাপ করে গিয়েছিলাম।

মেয়ে: আসুন, আপনাদের সর্দারের কাছে নিয়ে যাই।

মেয়েটির সাথে সবাই বেদে সর্দারের কাছে গেল। খুশি আপা সর্দারের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

গণেশ: আগে কখনো আপনাদের দেখিনি। আপনাদের বাড়ি কি অনেক দূরে?

সর্দার: এই নৌকাই আমাদের ঘর। এখানে যে পঁচিশ পরিবারের মানুষ, তাদের নিয়ে আমাদের বাড়ি। আমরা নিজেদের ঘরবাড়ি নিয়ে সারা বছর নদীতে ঘুরে বেড়াই। কিছুদিন এক জায়গায় থাকি তারপর আবার নতুন জায়গায় চলে যাই।

আয়েশা: দারুণ মজার তো! কত দিন ধরে আপনারা নৌকায় থাকছেন?

সর্দার: কত শত বছর ধরে যে আমরা নৌকায় থাকি, কেউ সেটা ঠিক করে বলতে পারে না। আমার জন্ম এই নৌকায়, আমার বাপ-মায়েরও জন্ম নৌকায়, তাঁদের বাবা-মাও নৌকায়ই জন্মেছিলেন। কেউ বলে যাযাবর জীবনের আগে আমরা মিয়ানমারে থাকতাম, কেউ বলে ভারতে। কেউ আবার বলে, এদেশের সাঁওতালরা আমাদের পূর্বপুরুষ।

ফ্রান্সিস: ঝড়-বৃষ্টি হলে আপনাদের নিশ্চয়ই খুব অসুবিধা হয়! আবার যখন বৃষ্টি হয় না, নদীতে পানি কম থাকে, তখনও অসুবিধা হয়। তবু এ রকম নৌকায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোর জীবন অন্য রকম আনন্দের।

সর্দার: কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। নৌকার জীবনে আনন্দও আছে, কষ্টও আছে। কিন্তু শত শত বছর ধরে আমরা নৌকায় থাকছি, আর এদিকে ডাঙার পৃথিবী কত বদলে গিয়েছে! আমাদের অনেকেই এখন বেদে জীবন ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে, অনেকে আবার নৌকা ছেড়ে ডাঙায় থাকতে শুরু করেছে।

মামুন: এদেশে কি আপনাদের মতো আরও বেদে আছে?

সর্দার: নিশ্চয়ই। কতজন আছে সেই হিসাব অবশ্য আমি জানি না। তবে কয়েক লাখ তো হবেই।

খুশি আপা: খবরের কাগজে পড়েছিলাম, বাংলাদেশে প্রায় আট লক্ষ বেদে আছে। তবে তাদের সবার জীবন এক রকম না।

সর্দার: আপনি ঠিকই বলেছেন, আপা। বেদেরা সবাই নৌকায় থাকে না। সবার কাজও এক রকম না। আমরা সাপ ধরি, সাপের খেলা দেখাই, নানা রকম ওষুধ, তাবিজ বিক্রি করি।

আমাদের বলে 'সাপুড়ে'। 'গাইন' বেদেরা সুগন্ধি মসলা বিক্রি করে। আবার 'শানদার' বেদেরা আছে যারা মেয়েদের চুড়ি, ফিতা, সাজগোজের জিনিস বিক্রি করে। 'বাজিকর' বেদেরা জাদু দেখায়, সার্কাস দেখায়। অন্য বেদেদের কেউ পুকুরে হারানো জিনিস খুঁজে দেয়, কেউবা বানরের খেলা দেখায়, টিয়াপাখি দিয়ে মানুষের ভাগ্য গণনা করে।

মিলি: আমি আপনাদের বহরের মেয়েদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

সর্দার: এতক্ষণে তো বেশির ভাগ মেয়েই বেরিয়ে পড়েছে। আমাদের সমাজের রীতি অনুযায়ী মেয়েদের আয়-রোজগারের কাজে যেতে হয়। বেলা হয়েছে, অনেকেই বেরিয়ে পড়েছে। তবে সবাই এখনও যায়নি। যারা আছে, চাইলে তাদের যে কারোর সঙ্গে তুমি কথা বলতে পারো।

রনি: মেয়েরাই কি কেবল রোজগার করে, ছেলেরা করে না?

সর্দার: আমাদের সমাজের পুরানো রীতি অনুযায়ী, মেয়েরা বিয়ের সময় বরের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয়। তাই মেয়েরা রোজগার করবে আর ছেলেরা বাচ্চা সামলানো, রান্না-বান্না আর ঘরের কাজের দায়িত্ব নেবে— এটাই নিয়ম। তবে ছেলেরা মাছ ধরে, জঙ্গল থেকে সাপ ধরে আনে, মাঝে মাঝে সাপের খেলাও দেখায়। এখন অনেকেই আয় রোজগারও করে।

ফাতেমা: আপনাদের বিয়ের রীতিনীতি সম্পর্কে আরও কিছু জানতে ইচ্ছে করছে।

সর্দারের সঙ্গে ওরা যখন গল্প করছিল তখন বেদে দলের অনেকেই আশেপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্য থেকে একটা ছেলে বলল, বেদেরা নিজেদের সমাজের মধ্যেই বিয়ে করে। এদেশের বেশির ভাগ বেদে মুসলমান, আমরাও। তাই আমাদের বিয়ে মুসলমান রীতিতে হয়। তবে বিয়েতে কোনো নিমন্ত্রণ, খাওয়া-দাওয়া, উপহার দেওয়া-নেওয়া হয় না। বিয়ের সময় আমরা সবাই মিলে নাচগান করি। খুব মজা হয়।

এর মধ্যে একটা ছোট ছেলে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। তার গলায় একটা সাপ পেঁচানো। আয়েশা আর সুমন হঠাৎ সাপ দেখে খুব চমকে উঠল। তখন একজন লোক ছেলেটাকে বকতে লাগল, ছেলেটাও কী যেন বলল। কিন্তু এই দুজনের কথাবার্তা ওরা কিছুই বুঝতে পারল না।

রবিন: ওরা কী বলছে?

সর্দার: ছেলেটার গলায় সাপ দেখে তোমরা ভয় পেয়েছ বলে, ওর বাবা ওকে বলেছে এভাবে মানুষকে ভয়

দেখালে মা মনসা রাগ করবেন।

রবিন: কিন্তু আমি তো ওদের একটা কথাও বুঝলাম না!

সর্দার: আমাদের নিজেদের ভাষা হলো 'ঠার' ভাষা। ওরা ওই ভাষায় কথা বলেছে বলে তোমরা কিছু বুঝতে পারোনি।

ওরা আরও কিছুক্ষণ গল্প করল। মিলি ওখানে দাঁড়ানো বেদে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলল।

এ সময় আচমকা বয়স্ক এক নারী মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন। কয়েকজন তাকে ধরে ফেলল। বেদে দলের সবার মধ্যেই একটা ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। চার-পাঁচজন মিলে তাকে কোলে তুলে শুইয়ে দিল। কেউ পানি আনছে, কেউ বাতাস করছে। একজন নারী বলছেন, তুমি কদিন ধরে এত অসুস্থ! তোমাকে বললাম, নৌকায় শুয়ে থাকতে, আমি একটুখানি দেখেই ফিরে আসছি। তাও কথা শুনলে না! এখন তোমার ছেলেমেয়েরা কাজ থেকে ফিরে আমাকে কী বলবে বলো তো! সর্দার ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলেন। সবাইকে শান্ত হয়ে সরে দাঁড়াতে বললেন। ওরা সবাই সর্দারের কথামতো একটু সরে দাঁড়াল, কিন্তু কেউ চলে গেল না। সবার চোখমুখে উৎকণ্ঠা। সর্দার বললেন, "চৌরানি বেগমকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে"। দুজনকে পাঠালেন ভ্যান ডেকে আনতে। আরও দুজনকে বললেন, চৌরানি বেগমের দু'একটা কাপড়, পানি আর শুকনা খাবার নিয়ে আসতে। সবাই ধরাধরি করে ভদ্রমহিলাকে ভ্যানে তুলল। তার সঙ্গে দুজন ভ্যানে চড়ে বসল। আরও দুই-তিনজন ভ্যানটাকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল। আরও বেশ কিছু মানুষ ভ্যানের পেছন পেছন হেঁটে যেতে লাগল।

শিহান বলল, তাঁর ছেলেমেয়েকে খবর দিতে হবে না!

বেদের দলের ওদেরই বয়সি একটা মেয়ে অবাক হয়ে বলল, আমরা এতজন আছি, সর্দার আছেন, ছেলে-মেয়েকে আলাদা করে জানাতে হবে কেন!

বয়সে বড় আর একটি ছেলে বুঝিয়ে বলল, আসলে আমাদের এখানে সবার সুখ-দুঃখই সবাই ভাগ করে নিই। একজনের বিপদে সবাই এগিয়ে আসে। আমাদের সর্দার সবার অভিভাবক। তিনি আমাদের পরামর্শ, নির্দেশ দেন, আমরা সেগুলো মেনে চলি। নিজেদের মধ্যে কোনো বিরোধ হলে সর্দারই সালিশ করে মীমাংসা করে দেন।

ওরা আরও কিছুক্ষণ সেখানে থাকল। ঘুরে ঘুরে নৌকাগুলোর ভেতরেও দেখল। এতটুকু নৌকায় ওদের সংসারের সমস্ত জিনিসপত্র কী সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছে!

বেড়ানো শেষে খুশি আপা ওদের নিয়ে ক্লাসে চলে এলেন।

বেদে দলের বৈশিষ্ট্য

ক্লাসে ফিরে খুশি আপা জানতে চাইলেন, আমরা যে বেদের বহর দেখে এলাম তোমাদের কেমন লাগল?

ওরা জানাল যে, ওদের সবারই খুব ভালো লেগেছে।

খুশি আপা: কেন ভালো লাগল বলো তো?

সাবা: বেদে জীবন আমার কাছে দারুণ রোমাঞ্চকর মনে হয়েছে! কেমন ঘরবাড়ি সঙ্গে নিয়ে নদীতে নদীতে সারা জীবন ঘুরে বেড়ায়!

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বুশরা: আমরা বছরে দু'একবার বেড়াতে যাই, অথচ ওরা সারা বছর বেড়ায়!

গৌতম: ওরা যে একজনের বিপদে সবাই ছুটে আসে, যেন এতগুলো মানুষের একটাই পরিবার; এই বিষয়টা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে।

রূপা: ওদের কী আশ্চর্য সাহস! সাপ ধরে, সাপের খেলা দেখায়! এমনকি ওদের বাচ্চাগুলো পর্যন্ত সাপ নিয়ে খেলছে!

খুশি আপা: তোমরা তো অনেক কিছু লক্ষ করেছ! তাহলে চলো এবার আমরা বেদের বহরে কী কী উল্লেখযোগ্য বিষয় দেখেছি তার একটা তালিকা তৈরি করি। কাজটি আমরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে করব।

ওরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কাজটি করল। কাজ শেষে প্রতিটি দল নিজেদের তালিকা পড়ে শোনাল। একই বিষয় যেখানে একাধিক দলের তালিকায় এসেছে সেগুলোকে আলাদা করে চিহ্নিত করা হলো। একটি দলের তালিকায় সবটা সাজিয়ে পুনরাবৃত্তি বাদ দেওয়া হলো।

এরপর খুশি আপা বললেন, এবার আমরা প্রত্যেকটা বিষয় আলাদা আলাদা কাগজে সংক্ষেপে বড় বড় করে লিখব। খুশি আপা প্রতিটি দলকে টুকরো টুকরো রঙিন কাগজ দিলেন। ক্লাসরুমে একটি বড় পোস্টার পেপার টাঙিয়ে দেওয়া হলো। সবার লেখা শেষে সবগুলো দলের লেখা কাগজ পোস্টার পেপারে ওপর থেকে নিচে ধারাবাহিকভাবে সাঁটানো হলো।

খুশি আপা বললেন, তালিকায় আমরা যে বিষয়গুলো রেখেছি সেগুলো থেকে বেদে দলের কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কি খুঁজে পাচ্ছি? ওরা বলল, প্রতিটি বিষয় থেকেই বেদে দলের কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। আলোচনার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলোর নাম ঠিক করে প্রতিটি দল তাদের দেখা বিষয়বস্তুর পাশে বৈশিষ্ট্যের নাম লিখে দিয়ে গেল। এভাবে সবগুলো দলের তালিকা একত্র করে একটা নতুন তালিকা তৈরি হলো।

তালিকাটি দেখতে অনেকটা এ রকম হলো।

যা দেখেছি	বৈশিষ্ট্য
পঁচিশটি পরিবারের একটি দল	একদল মানুষ
ওরা নিজেদের 'বেদে' হিসেবে পরিচয় দেয়	স্বকীয়তার বোধ
একের সমস্যাকে সবার সমস্যা হিসেবে দেখে, একসঙ্গে সমাধান করে	একাত্মতার বোধ
নিজেদের মধ্যে আলাদা ভাষায় কথা বলে। সবাই বাংলা ভাষাও বলতে পারে	

মানুষের এই বৈচিত্র্য তোমরা নিশ্চয় আরও দেখতে পাও। বেদেরা তো আমাদের মতো বাঙালি, কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করেন, অনেক নৃগোষ্ঠীর মানুষ। তাদের ভাষা, খাদ্য, পোষাক, ধর্ম বিশ্বাস ও প্রথায় রয়েছে অনেক পার্থক্য। তা সত্তেও ওরা আমাদের মতো এই দেশের নাগরিক এবং আমাদের মতো দেশকে সমানভাবে ভালোবাসে। ওদের সাথেও আমাদের অনেক মিল ও অমিল রয়েছে।

অনুশীলনী

শিক্ষার্থীরা কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিজেরা আলোচনা করল। খুশি আপাও তাদের কিছু তথ্য দিলেন। এবার এগুলোর ভিত্তিতে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে তারা যে কোনো পাঁচটি নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য লিখবে ও এ নিয়ে নিজ নিজ মতামত সচিত্র উপস্থাপন করবে।

সম্প্রদায়

তালিকা তৈরি শেষ করে খুশি আপা বোর্ডে ‘সম্প্রদায়’ কথাটা লিখলেন। তারপর বললেন, আমরা এতক্ষণ বেদে দলের কতগুলো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেলাম, মানুষের কোনো দলের মধ্যে যদি এ ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাহলে আমরা সেই দলটাকে একটা ‘সম্প্রদায়’ বলি।

মাহবুব: তাহলে আমরা তো বেদেদের একটা ‘সম্প্রদায়’ বলতে পারি।

খুশি আপা: অবশ্যই পারি। বেদেদের মতো আমরাও প্রত্যেকে কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের সদস্য। একজন মানুষ অনেকগুলো সম্প্রদায়ের সদস্য হতে পারে। তবে জেনে রেখো:

বেদে সম্প্রদায়ের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখেছি, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তার সবগুলো নাও থাকতে পারে অথবা আলাদা রকমের কোনো বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। সম্প্রদায়ের আবার নানান ধরন হয়। তবে সম্প্রদায় হতে গেলে একটি দলের সদস্যদের মধ্যে স্বকীয় পরিচয়ের বোধ, একাত্মতার বোধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা থাকা খুব জরুরি।

আয়েশা বলল, সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আমাদের ক্লাসেরও অনেক মিল আছে। তাহলে তো আমাদের ক্লাসটাও একটা সম্প্রদায়! শফিক বলল, প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলে আমার যে সমাজ সেখানেও সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি। আনাই বলল, আমাদের বাড়ি খাগড়াছড়িতে। সেখানে আশপাশের সবার সঙ্গে আমার অনেক বেশি মিল— ভাষা, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, ধর্ম....। কিন্তু আমরা এখানে থাকি। এখানকার মানুষের সঙ্গেও অনেক বিষয়ে মিল খুঁজে পাই। তাহলে তো আমার দুটো প্রতিবেশী সম্প্রদায়। সুমন, জামাল, আয়েশা, গণেশ আরও কিছু কথা বলল। তাতে দেখা গেল ওরা নিজেদের একই সাথে নানা রকমের সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে।

আমার সম্প্রদায়

খুশি আপা বললেন, আমরা একটা মজার খেলা খেলি চলো!

তালিকা থেকে পাওয়া সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো আলাদা আলাদা কাগজে লিখে শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন জায়গায় সাঁটিয়ে দেওয়া হলো।

এবারে খুশি আপা প্রতিবেশীদের নিয়ে শিক্ষার্থীদের যে সম্প্রদায়, সেটির যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে স্পষ্ট করে বোঝা যায়, প্রত্যেককে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন।

সবাই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর খুশি আপা হাততালি দিয়ে বললেন, বাহ! আমরা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো চমৎকারভাবে বুঝতে পেরেছি! নিজের সম্প্রদায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকেও চিহ্নিত করতে পেরেছি।

নতুন পরিচয়

পরের ক্লাসে খুশি আপা একজন অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। তিনি বললেন, ইনি ছোটবেলায় তোমাদের স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। আজ এসেছেন, নিজের স্কুলটা দেখতে। সুমন জানতে চাইল, আপনার নাম কী? তিনি বললেন, আমার নাম শরীফা আকতার।

শরীফা

শরীফা বললেন, যখন আমি তোমাদের স্কুলে পড়তাম তখন আমার নাম ছিল শরীফ আহমেদ। আনুচিং অবাক হয়ে বলল, আপনি ছেলে থেকে মেয়ে হলেন কী করে? শরীফা বললেন, আমি তখনও যা ছিলাম এখনও তাই আছি। নামটা কেবল বদলেছি। ওরা শরীফার কথা যেন ঠিকঠাক বুঝতে পারল না।

আনাই তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার বাড়ি কোথায়? শরীফা বললেন, আমার বাড়ি বেশ কাছে। কিন্তু আমি এখন দূরে থাকি। আনাই মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি, আমার পরিবার যেমন অন্য জায়গা থেকে এখানে এসেছে, আপনার পরিবারও তেমনি এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। শরীফা বললেন, তা নয়। আমার পরিবার এখানেই আছে। আমি তাদের ছেড়ে দূরে গিয়ে অচেনা মানুষদের সঙ্গে থাকতে শুরু করেছি। এখন সেটাই আমার পরিবার। তাদের অবাক হতে দেখে শরীফা এবার নিজের জীবনের কথা বলতে শুরু করলেন।

শরীফার গল্প

ছোটবেলায় সবাই আমাকে ছেলে বলত। কিন্তু আমি নিজে একসময়ে বুঝলাম, আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে। আমি মেয়েদের মতো পোশাক পরতে ভালোবাসতাম। কিন্তু বাড়ির কেউ আমাকে পছন্দের পোশাক কিনে দিতে রাজি হতো না। বোনদের সাজবার জিনিস দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সাজতাম। ধরা পড়লে বকাঝকা, এমনকি মারও জুটত কপালে। মেয়েদের সঙ্গে খেলতেই আমার বেশি ইচ্ছে করত। কিন্তু মেয়েরা আমাকে খেলায় নিতে চাইত না। ছেলেদের সঙ্গে খেলতে গেলেও তারা আমার কথাবার্তা, চালচলন নিয়ে হাসাহাসি করত। স্কুলের সবাই, পাড়া-পড়শি এমনকি বাড়ির লোকজনও আমাকে ভীষণ অবহেলা করত। আমি কেন এ রকম একথা ভেবে আমার নিজেরও খুব কষ্ট হতো, নিজেকে ভীষণ একা লাগত।

একদিন এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো যাকে সমাজের সবাই মেয়ে বলে কিন্তু সে নিজেকে ছেলে বলেই মনে করে। আমার মনে হলো, এই মানুষটাও আমার মতন। সে আমাকে বলল, আমরা নারী বা পুরুষ নই, আমরা হলাম তৃতীয় লিঙ্গ (থার্ড জেন্ডার)। সেই মানুষটা আমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল, যেখানে নারী-পুরুষের বাইরে আরও নানা রকমের মানুষ আছেন। তাদের বলা হয় 'হিজড়া' জনগোষ্ঠী। তাদের সবাইকে দেখেশুনে রাখেন তাদের 'গুরু মা'। আমার সেখানে গিয়ে নিজেকে আর একলা লাগল না, মনে হলো না যে আমি সবার চেয়ে আলাদা। সেই মানুষগুলোর কাছেই থেকে গেলাম। এখানকার নিয়ম-কানুন, ভাষা, রীতিনীতি আমাদের বাড়ির চেয়ে অনেক আলাদা। আমরা সবার সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিয়ে একটা পরিবারের মতনই থাকি। বাড়ির লোকজনের জন্যও খুব মন খারাপ হয়। তাই মাঝে মাঝে বাড়িতেও যাই।

আজ থেকে বিশ বছর আগে বাড়ি ছেড়েছি। সেই থেকে আমি আমার নতুন বাড়ির লোকদের সঙ্গে শহরের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে, নতুন শিশু আর নতুন বর-বউকে দোয়া-আশীর্বাদ করে পয়সা রোজগার করি। কখনো কখনো লোকের কাছে চেয়ে টাকা সংগ্রহ করি। আমাদেরও ইচ্ছে করে সমাজের আর দশটা স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবন কাটাতে, পড়াশোনা, চাকরি-ব্যবসা করতে। এখনও বেশির ভাগ মানুষ আমাদের সঙ্গে মিশতে চায় না, যোগ্যতা থাকলেও কাজ দিতে চায় না। তবে আজকাল অনেক মানুষ আমাদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। ইদানীং আমাদের মতো অনেক মানুষ নিজ বাড়িতে থেকে লেখা পড়া করছে।
আমাদের মতো মানুষ পৃথিবীর সব দেশেই আছে। অনেক দেশেই তারা সমাজের বাকি মানুষের মতনই জীবন কাটায়। তবে আমাদের দেশের অবস্থারও বদল হচ্ছে। ২০১৩ সালে সরকার আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আমাদের জন্য কাজ করছে। শিক্ষার ব্যবস্থা করছে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর প্রচেষ্টা নিচ্ছে। নজরুল ইসলাম ঋতু, শাম্মী রানী চৌধুরী, বিপুল বর্মণের মতো বাংলাদেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীর অনেক মানুষ সমাজজীবনে এবং পেশাগত জীবনে সাফল্য পেয়েছেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

জনাব নজরুল ইসলাম ঋতু হিজড়া সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান

জনাব শাম্মী রানী চৌধুরী, উন্নয়ন কর্মী, বেসরকারি সংস্থার এবং জাতীয় পর্যায়ের নৃত্যশিল্পী

জনাব লিনিয়া শাম্মী
বিউটিশিয়ান এবং উন্নয়ন কর্মী

জনাব বিপুল বর্মণ
ঢাকার একটি বায়িং হাউসে কর্মরত।

নতুন প্রশ্ন

ওরা এতদিন জানত, মানুষ ছেলে হয় অথবা মেয়ে হয়। এখানেও যে বৈচিত্র্য থাকতে পারে, সে কথা ওরা কখনো শোনেনি, ভাবেওনি। কিন্তু শরীফা আলাদা রকম বলে সবাই তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, এমনকি তার পরিবারের লোকেরাও! শরীফার জীবন-কাহিনি শুনে সবার মন এমন বিষাদে ডুবে গেল যে তাকে আর বেশি প্রশ্ন করতেও ইচ্ছে করল না।

গণেশ, রনি, আয়েশা, ওমেরা আর নীলা সেদিন বাড়ি ফেরার পথে গল্প করছিল:

গণেশ: তাহলে ছেলে এবং মেয়ে ছাড়াও ভিন্ন রকমের মানুষ হয়।

রনি: আমার মা বলেন, ছোটদের কোনো ছেলেমেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে।

আয়েশা: আমার জানতে ইচ্ছে করছে, আমাদের সময় ছেলে বা মেয়েদের পোশাক, আচরণ, কাজকর্ম যেমন দেখি, প্রাচীন মানুষেরও কি তেমন ছিল? সামনের সময়েও কি এমনটা থাকবে?

রফিক: পৃথিবীর সব দেশে, সকল সম্প্রদায়ে কি ছেলেমেয়ের ধারণা, তাদের চেহারা, আচরণ, সাজপোশাক একই রকম?

নীলা: আমার মা আমাকে বেগম রোকেয়ার লেখা একটা গল্প পড়ে শুনিয়েছিলেন। গল্পটার নাম ‘সুলতানার স্বপ্ন’। সেখানে এমন একটা জায়গা কল্পনা করা হয়েছে যেখানে ছেলে আর মেয়েদের প্রচলিত ভূমিকা উল্টে গিয়েছে।

চলো, আমরাও নারী-পুরুষের ধারণা, সমাজে তাদের ভূমিকা আর নিজেদের ভাবনা সম্পর্কে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করি।

ছেলেদের জিনিস-মেয়েদের জিনিস

খুশি আপা এবার বললেন, আজকে আমরা আমাদের ১০টি পছন্দের খেলনার তালিকা করব। সেটি হতে পারে আমাদের ছোটবেলা এবং এখনকার সময়ের পছন্দের খেলনা।

খুশি আপা আরো বললেন, সেই সাথে ছেলে শিক্ষার্থীরা নিজ বোন/আত্মীয় সম্পর্কের বোন/মেয়ে সহপাঠীর ১০টি পছন্দের খেলনার তালিকা করবে। ঠিক একইভাবে মেয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ ভাই/আত্মীয় সম্পর্কের ভাই/ছেলে সহপাঠীর ১০টি পছন্দের খেলনার তালিকা করবে।

সবাই মিলে ভীষণ আগ্রহ নিয়ে তালিকা করল। তালিকা করা শেষ হলে খুশি আপা জিজ্ঞেস করলেন, খেলনাগুলোতে কোনো মিল বা অমিল খুঁজে পাচ্ছ?

রাজু বলল, জ্বী আপা আমি আর আমার বোন দুজনই লুডু খেলতে পছন্দ করি।

সানজিদা বলল, আপা আমার ভাইয়ের খেলনার সাথে আমার খেলনার বেশ কিছু অমিল আছে। আমার ভাইয়ের বয়স চার বছর। সে গাড়ি দিয়ে খেলে। মা বলেছেন আমি ওর মতো বয়সে পুতুল খেলতাম।

খুশি আপা বললেন, আচ্ছা কখনো কি ভেবে দেখেছ তোমরা যখন ছোট ছিলে তখনতো তোমাদের একই ধরণের খেলনা দিয়ে খেলার কথা ছিল। তোমাদের খেলনা পছন্দের পার্থক্য হলো কি করে?

রাতুল বললো, ঠিক আপা ঐ সময়েতো আমি বুঝতামই না কোন খেলনা দিয়ে খেলব। আমি দেখেছি আমার পরিবার ছোট ভাইকে বল কিনে দিয়েছে আর আমার ছোট বোনকে হাঁড়ি পাতিল কিনে দিয়েছে। তাইতো তারা সেটিকে নিজেদের খেলনা ভেবে খেলেছে।

খুশি আপা বললেন, ছেলে ও মেয়ের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। এই ভিন্নতা হচ্ছে তার লিঙ্গ পরিচয়। আর চারপাশের মানুষ যখন লিঙ্গ পরিচয়ের জন্য ছেলে ও মেয়ের কাজ, দায়িত্ব ও ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য করে দেয় তখন সেটি হচ্ছে তার জেন্ডার বৈশিষ্ট্য।

খুশি আপা তখন বললেন, কয়েকটা প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা চিন্তার খোরাক পেতে পারি। ওরা সবাই মিলে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করলো।

- আমরা নিজেদের ছেলে এবং মেয়ে বলে আলাদা করে চিনি কীভাবে?
- ছেলে বা মেয়ে হিসেবে আমরা আমাদের পছন্দের পোশাক, রং, খেলনা, কাজগুলো কী নিজেরাই পছন্দ করি?
- ছেলেদের খেলনা-মেয়েদের খেলনা, ছেলেদের কাজ-মেয়েদের কাজ কিসের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করি?
- একজন মানুষকে বাইরে থেকে দেখেই কি সব সময় সে ছেলে না মেয়ে তা বোঝা যায়?
- অন্যরা আমাদের সম্পর্কে কী ভাবছে তা আমাদের লিঙ্গগত পরিচয়কে কীভাবে প্রভাবিত করে?
- এমনটা কি হতে পারে যে, কাউকে আমরা তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য দেখে, গলার স্বর শুনে ছেলে বা মেয়ে বলে ভাবছি কিন্তু সে নিজেকে ভিন্ন কিছু ভাবছে?

লিঙ্গ বৈচিত্র্য ও জেন্ডারের ধারণা

আলোচনা করতে করতে একসময়ে হাস্না বলল, আমার মনে হচ্ছে, আমরা যে মানুষের শারীরিক গঠন দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়। মামুন বলল, তাই তো! আমরা

শরীফার জীবনের গল্প শুনলাম, যিনি দেখতে ছেলেদের মতন, কিন্তু মনে মনে তিনি একজন মেয়ে। তার কাছে এমন একজনের কথা জানলাম, যিনি দেখতে মেয়েদের মতো কিন্তু মনে মনে তিনি ছেলে।

খুশি আপা: আমরা চারপাশে দেখে এবং অন্যদের কাছে শুনে জেনেছি যে, শারীরিক গঠন একটা নির্দিষ্ট ধরনের হলে সে ছেলে হয়, অন্য আরেকটা ধরনের হলে সে মানুষটা মেয়ে হয়। ছেলেদের গলার স্বর মোটা, মেয়েদের চিকন। মেয়েরা সাজগোজ করে, তাদের লজ্জা বেশি, তাদের মন নরম হয়। সাধারণত ছেলেরা সাজগোজ করে না, লজ্জা কম পায়, তারা বাইরে যেতে পছন্দ করে। আমরা এগুলোকেই স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিচ্ছি।

ফাতেমা: কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, ছেলেমেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাজ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই।

খুশি আপা: ঠিক বলেছ!

সুমন: আমার মনে হচ্ছে, আমরা যেমন করে ভাবছি, অনেকেই তার চেয়ে ভিন্ন রকম করে ভাবে।

সাবা: কিন্তু সবার তো নিজের মত, নিজের অনুভূতি, নিজের পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশের স্বাধীনতা আছে!

খুশি আপা: যতক্ষণ না তাতে অন্যের কোনো ক্ষতি হচ্ছে, ততক্ষণ নিশ্চয়ই আছে।

শিহান: তাহলে শরীফা আপারা কার কী ক্ষতি করেছেন?

পেশাজীবী সম্প্রদায়

রূপা বলল, একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছ? রনি বলল, স্কুলের পেছন দিক থেকে গন্ধটা আসছে। ফ্রান্সিস জানাল, বাজারের পাশেই একটা বড় ডাস্টবিন আছে। ওই পথে ওকে স্কুলে আসতে হয়। আজ আসার সময় দুর্গন্ধে ওর প্রায় বমি চলে এসেছিল। লোকজনকে বলাবলি করতে শুনেছে, দুদিন ধরে পরিচ্ছন্নতাকর্মী আসেনি। আরও দুদিন যদি তারা না আসে তাহলে বাজারে আর কেউ ঢুকতেই পারবে না।

নীলা বলল, আমার চাচা একবার খুব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তখন দেখেছি, পরিচ্ছন্নতাকর্মীর আসতে দেরি হয়েছে বলে অপারেশন করতেও অনেক দেরি হয়েছিল। মামুন বলল, পরিচ্ছন্নতাকর্মী কি অপারেশন করে নাকি? নীলা বলল, তা কেন! কিন্তু অপারেশন করার আগে অপারেশন থিয়েটার, সেখানে যাতায়াতের পথ বা অপারেশন পরবর্তী রোগী রাখার ওয়ার্ড, এসবও পরিষ্কার করতে হয়। মামুন বলল, তাই তো! হাসপাতাল শুনলেই মনে হয় সেখানে ডাক্তার আর নার্স খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

তারা না এলে মানুষ চিকিৎসা সেবা পাবে না। কিন্তু হাসপাতালে রোগীর সেবায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীও তো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন! আদনান বলল, যদি পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা কাজ করা বন্ধ করে দেয় তাহলে তো পৃথিবীর সব নগরে, সব জায়গাতেই ময়লা-আর্বজনায় ভরে যাবে। গ্রামগঞ্জে মানুষ নিজনিজ বাসস্থান ও কর্মস্থল পরিষ্কার করে রাখে।

তবে ধীরে ধীরে সেখানেও পরিচ্ছন্নতা কর্মীর প্রয়োজন হবে।

খুশি আপা শ্রেণিকক্ষে আসার পর সবাই তাঁকে জানাল যে, পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা যে কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, তা আজকের এই দুর্গন্ধের কারণে ওরা বুঝতে পেরেছে। খুশি আপা ওদের কথা শুনে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

আনাই জানতে চাইল আপা, পরিচ্ছন্নতাকর্মীদেরও কি আমরা একটা সম্প্রদায় বলতে পারি? খুশি আপা বললেন, হ্যাঁ পারি।

চলো আমরা প্রত্যেকে টুল ব্যবহার করে আমাদের আশপাশের পেশাজীবী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করি। কাজটি আমরা অনুসন্ধানী কাজের ধাপ অনুসরণ করে করব। এরপর ওরা তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন তৈরি করল, তারপর তথ্য সংগ্রহ করে, বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ফলাফল উপস্থাপন করলো।

আমরাও ওদের মতো করে টুল ব্যবহার করে, অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে আমাদের আশপাশের পেশাজীবী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

পারস্পরিক সহযোগিতা

খুশি আপা শিহানকে বললেন, তুমি কি আমাকে ওই কলমটা একটু দেবে? শিহান খুশি আপাকে কলমটা দেওয়ার পর খুশি আপা তাকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর সবাইকে বললেন, শিহান আমাকে সাহায্য করেছে বলে আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। অর্থাৎ কেউ আমাদের সাহায্য করলে বিনিময়ে আমরাও কিছু করি। এরপর তিনি জানতে চাইলেন, আমরা তো পেশাজীবী সম্প্রদায়কে নিয়ে অনেক কাজ করলাম, আমাদের চারপাশে যেসব পেশাজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন, যারা নানাভাবে সমাজের সেবা করেন, আমাদের প্রয়োজনে কাজ করেন, তাদের অবদান আমরা কি বুঝতে পারি? আয়েশা বলল, পারি। খুশি আপা বললেন, চমৎকার! তাহলে চলো, এই ছকটা ব্যবহার করে ছোট্ট একটা পরীক্ষা করি। আমরা প্রত্যেকে এই ছকটা পূরণ করবো।

আমার আশপাশের পেশাজীবী	আমি তার কাছে যে সাহায্য পাই	আমি তাকে যেভাবে সাহায্য করি
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

আমরাও ছক পূরণের কাজটি করি।

ছক পূরণ করতে গিয়ে কেউ কেউ জানতে চাইল, ‘আমি তাকে যেভাবে সাহায্য করি’ এই ঘরটায় কী লিখব? সালমা বলল, আজ সকালে আমি রিকশায় চড়ে স্কুলে এসেছি। রিকশাওয়ালা আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন, বিনিময়ে আমি তাকে টাকা দিয়েছি। আমি কি সেটাই লিখব? তখন ক্লাসের অন্যরাও বলল, তারাও বিভিন্ন সেবার বিনিময়ে পেশাজীবীদের টাকা দেয়।

খুশি আপা: সেবার মূল্য কি কেবল টাকা দিয়ে পরিশোধ করা যায়? ধরো, আজ সকালে সালমা যদি একটাও রিকশা না পেত, তাহলে ও কী করত? অথবা যদি সেই রিকশাওয়ালা ওকে পৌঁছে দিতে রাজি না হতো, তাহলে টাকা ওর কী কাজে লাগতো?

রনি: আমরা তাহলে সেবার বিনিময়ে টাকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধন্যবাদও জানাতে পারি।

খুশি আপা: নিশ্চয়ই পারি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

নীলা: আমাদের বাড়িতে যিনি কাজে সাহায্য করেন, তার মেয়েকে আমি আমার একটা জামা দিয়েছিলাম।

রূপা: বাড়ির অদরকারি জিনিসপত্র আমরা যাদের দরকার তাদের দিই।

মাহবুব: আমার বাবা-মা অনেককে সাহায্য করেন।

বুশরা: যখন কেউ আমাকে সাহায্য করছেন, তার জন্যও আমার কিছু করার আছে, এভাবে কখনো ভেবে দেখিনি। অথচ বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সাহায্য ছাড়া আমরা চলতে পারি না!

খুশি আপা: জীবন যাপনের জন্য দরকারি সব কাজ একা কেউ করতে পারে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতায় সমাজ টিকে থাকে।

আমরা যাদের কাছ থেকে সাহায্য নিচ্ছি, তাদের জন্য আমদের কী করণীয়, চলো ভেবে বের করি এবং তালিকা তৈরি করি। কাজটি আমরা সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে বছরব্যাপী করব এবং নিজেদের আচরণেও প্রয়োগ করব। তালিকা থেকে দলে করানোর জন্য আমরা কিছু কাজ বেছে নেবো, আর কিছু কাজ এককভাবে করবো। ওরা দলে আলোচনা করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্যদের সহযোগিতা করার জন্য সম্ভাব্য কাজের একটি তালিকা তৈরি করলো:

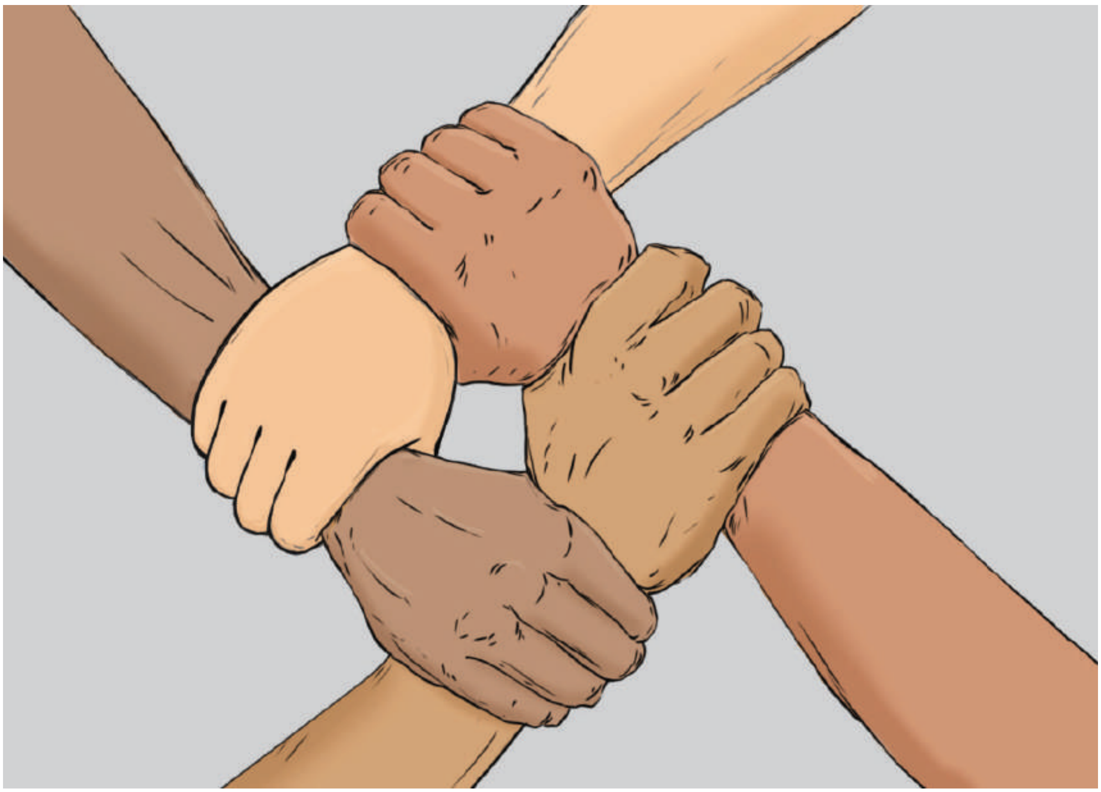

- পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সপ্তাহে এক দিন বিশ্রাম করতে দিয়ে বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন করা
- কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, জৈব সার, প্রাকৃতিক কীটনাশক সম্পর্কে জানানো
- দরিদ্র শিশুদের লেখাপড়ায় সাহায্য করা, নতুন বা পুরোনো বই, শিক্ষা উপকরণ, খেলনা ইত্যাদি দেওয়া
- আশেপাশের সম্প্রদায়ের বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে গল্প করা, তাদের বই, পত্রিকা পড়ে শোনানো
- ব্যাংকে জমানো টাকা দিয়ে শীতবস্ত্র দেওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পরিবারগুলোকে সহায়তা দেওয়া

ওরা তালিকা অনুযায়ী বছরব্যাপী আশপাশের পেশাজীবী সম্প্রদায়ের মানুষদের সহযোগিতা করার এবং তা ছকে লিখে রাখল। বছর শেষে ওদের কাজগুলোর মূল্যায়ন হলো।

চলো, আমরাও দলে আলোচনা করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্যদের সহযোগিতা করার জন্য সম্ভাব্য কাজের একটি তালিকা তৈরি করি। দলীয় এবং একক কাজের হিসাব রাখার জন্য একটা ছক তৈরি করে তাতে আমাদের কাজগুলোর কথা লিখে রাখি।

বাংলা অঞ্চল ও স্বাধীন বাংলাদেশ: অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে

পৃথিবীতে মানুষের টিকে থাকার ইতিহাস কতো পুরোনো তা সঠিক করে জানা যায় না। বাংলা অঞ্চলও কিন্তু তার ব্যতিক্রম নয়। তবে আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে যে বাংলা অঞ্চলে মানুষ ছিল, সেই প্রমাণ আমরা পেয়েছি। পাথরের যুগে ব্যবহৃত হাতিয়ারের কথা নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে? আজকের অধ্যায়ে আমরা বাংলা অঞ্চল এবং বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানবো। একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মানুষের ইতিহাস জানতে হলে সেই মানুষের সকল রকমের কাজকর্ম সম্পর্কেই জ্ঞান থাকা জরুরি। একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবে, আমাদের আশেপাশে যতো মানুষ আছে, তারা প্রায় সকলেই কোন-না-কোনভাবে অর্থনৈতিক কাজের সাথে যুক্ত। মানুষের অধিকাংশ কাজের উপরেই অর্থনীতির রয়েছে গভীর সংযোগ আর প্রভাব।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ইরফান হাবীব সহ আরও অনেকের গবেষণার সূত্র ধরে বলা যায়, কোন একটি পণ্যের উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ করার যে রীতি-নীতি তা নিয়ে আলোচনার নামই অর্থনীতি। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য মূলত এই তিনের সমন্বয়েই গড়ে উঠে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন। কোনো একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে একদল মানুষ হাজার বছরের ধারাবাহিকতায় অর্থনৈতিক জীবন গঠন ও রূপান্তরের যে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তার কালানুক্রমিক বিবরণ পাওয়া যায় অর্থনৈতিক ইতিহাসের আলোচনায়।

অনুশীলনী

চারপাশে কত মানুষ আমাদের! কত বিচিত্র তাদের পেশা! কেউ চাষাবাদ করেন, কেউ চাকরি করেন, কেউ রিকশা চালান, কেউ জামা তৈরি করেন, কেউ খাবার তৈরি করেন, কেউ দোকানে বসে মনোহরি পণ্য বিক্রি করেন। এই সবই হচ্ছে মানুষের অর্থনৈতিক কাজ। চলো আমরা আমাদের পরিচিত এইরকম আরও কিছু পেশার নাম লিখি এবং তারা কী ধরনের কাজ করেন তা বর্ণনা করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

পেশা	কাজের বর্ণনা

আমরা সকলেই জানি যে, আজ থেকে হাজার বছর আগে মানুষ চাষাবাদ জানতো না। জানতো না মুদ্রা বা টাকার ব্যবহার। ঘরবাড়ি নির্মাণ করতেও জানতো না। আজকের মতো বড় বড় হাঁট-বাজার ছিল না। মানুষ তখন ছোট ছোট দল বা গোত্র গঠন করে একসাথে বসবাস করতো। নদী থেকে মাছ, বন-জঙ্গল থেকে বিভিন্ন পশুপাখি শিকার এবং ফলমূল সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করতো। এই শিকার এবং সংগ্রহও কিন্তু মানুষের

মানচিত্র: বাংলা অঞ্চল ও বাংলাদেশ (১৩০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত)

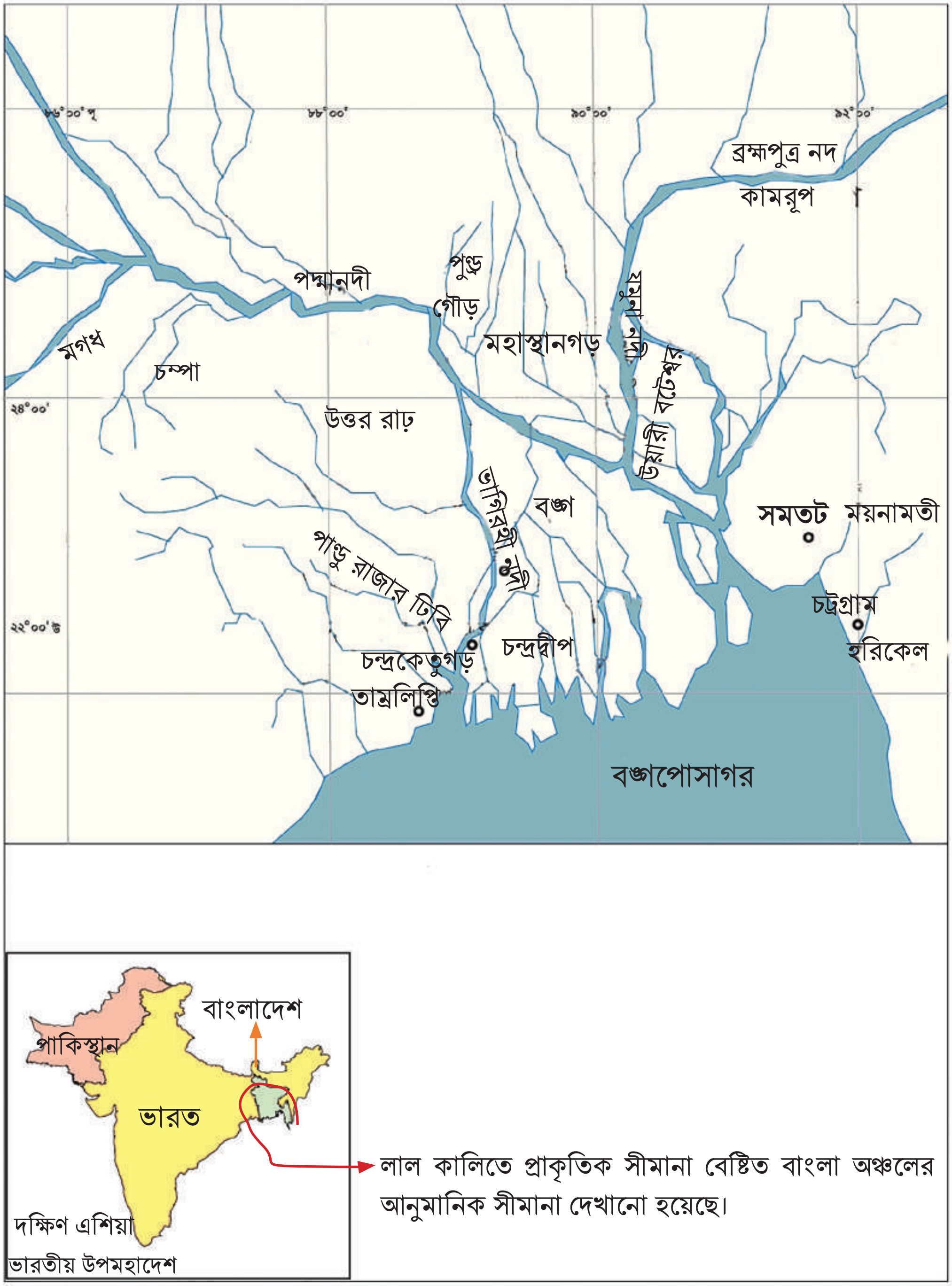

বাংলা অঞ্চল ও বাংলাদেশ (প্রাচীন যুগ)। ১৩০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত বাংলা অঞ্চলের প্রধান প্রধান জনবসতি, বন্দর ও নগরকেন্দ্রগুলির অবস্থান মানচিত্রে দেখে নেয়া যাক। ১৯৭১ সালে এই বাংলা অঞ্চলেরই পূর্ব পাশে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

অর্থনৈতিক কাজের মধ্যে পড়ে। সুতরাং আমরা বলেই পারি, মানুষের ইতিহাস যতোখানি প্রাচীন, মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ইতিহাস ততোখানিই প্রাচীন। আর এই অর্থনৈতিক ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষে টিকে থাকার লড়াই, ধীরে ধীরে যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী বসতি স্থাপন, সভ্যতা নির্মাণ সহ সকল কিছুই বর্ণনা করা সম্ভব!

আজকের অধ্যায়ে আমরা জানব, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চলে মানুষ কীভাবে শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক অর্থনীতি থেকে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটিয়েছে। প্রাকৃতিক এবং মানুষের সৃষ্ট নানান প্রতিকূলতা, বাঁধা-বিপত্তির পথ পেরিয়ে ধীরে ধীরে একটি ভারসাম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়েছে।

১৯৭১ সালে বাংলা অঞ্চলের পূর্বভাগে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই সারা বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

অর্থনৈতিক ইতিহাসে ভূপ্রকৃতির প্রভাব!

বাংলা অঞ্চল এবং বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক জীবন গঠন ও রূপান্তরের এই আলোচনায় আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে -

- বাংলা ছিল জল-জঙ্গালে বেষ্টিত ভূ-খণ্ড। সুপ্রাচীন কাল থেকেই এখানে নানান ধারার মানুষ এসে বসতি স্থাপন করেছে। ঝড়, তুফান, বন্যা প্রভৃতি নানান রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই মানুষ কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থনৈতিক জীবন গঠনের চেষ্টা করেছে।
- বাংলার ভূমি ছিল খুবই উর্বর। অসংখ্য নদ-নদী ছড়িয়েছিল এর সমস্ত ভূ-ভাগ জুড়ে। জলের এই অবাধ প্রবাহ চাষের জমিতে সেচের কাজে সহায়ক ছিল। এখানে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হয়। নদী ও সমুদ্রের সুবিধার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে এখানে বাণিজ্য করতে আসার সুযোগ পায়। কৃষি ও বাণিজ্যের বিকাশের সাথে সাথে শিল্পের বিকাশ ঘটে।

কৃষি অর্থনীতি

বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে ভূ-প্রকৃতির প্রভাবের কথা আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠ করেছি। সেখানে পাণ্ডু রাজার ঢিবির কথা জেনেছি আমরা। মনে আছে নিশ্চয়ই তোমাদের? প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে যেসব নিদর্শন পাওয়া যায়, তা থেকে নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, আজ থেকে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার বছর পূর্বে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে একটি কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। এই ঢিবির নিকটেই মহিষদল নামে অন্য একটি প্রত্নক্ষেত্রে পাওয়া গিয়েছে একটি শস্যাগারের ধ্বংসাবশেষ। শস্যাগারে প্রাপ্ত ধানের কিছু দানা নিয়ে কার্বন-১৪ নামে একটি পরীক্ষা চালানো হয়। পরীক্ষা থেকে জানা যায়, শস্যাগারে পাওয়া ধানের এই দানাগুলির বয়স সাড়ে তিন হাজার বছর।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এইসব নির্দশন থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, সাড়ে তিন বা চার হাজার বছর আগেই বাংলার মানুষ ধান জাতীয় শস্যের উৎপাদন প্রক্রিয়া জানতো এবং তা সংরক্ষণের জন্য তারা শস্যাগারও ব্যবহার করতো। এইরকম আরও একটি শস্যাগারের উল্লেখ আমরা পেয়েছি মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপিতেও। ঠিকই ধরেছো, প্রাক-সাধারণ অব্দ ৩য় শতকের মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপির কথাই আমরা বলছি। বাংলা অঞ্চলে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন এই লিপি থেকে আরও জানা যায়, বাংলা অঞ্চলে সেই সময় ধান, তিল, সরিষার মতো খাদ্যশস্য উৎপন্ন হতো।

চৈনিক পর্যটক সুয়ান জাং (হিউয়েন সাং)-এর বিবরণী এবং একাদশ শতকে লেখা 'রামচরিতম' কাব্য থেকে জানা যায়, বাংলা অঞ্চলের উত্তর-পূর্ব দিকে সেই সময়ে প্রচুর পরিমাণে কাঁঠাল এবং আখ উৎপাদন হতো। প্রাচীনকালের বাংলা অঞ্চলের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্য ছিল এগুলো।

প্রাচীনকালের বাংলা অঞ্চলের কৃষির কথা জানা যায় এমন অনেক উৎস এখন ইতিহাসবিদদের হাতে রয়েছে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে, তাম্রশাসন। বাংলা অঞ্চলের রাজা বা শাসকগণ যখন কাউকে কোনো জমি দান করতেন, সেই দানের দলিল হিসেবে একটি তাম্রশাসন জারি করতেন। জমি ক্রয়-বিক্রয়ের সময়েও এই দলিল জারি করা হতো।

ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায়, শাহানারা হোসেন, রিয়াসুকে ফুরুই বাংলা অঞ্চলের প্রাচীনকালের অনেকগুলো তাম্রশাসন নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাম্রশাসনগুলো বিশ্লেষণ করে সেই সময়ের কৃষি সম্পর্কিত নানান ধরনের তথ্য তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। এছাড়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ রণবীর চক্রবর্তী বাঙলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে বিস্তর গবেষণা করেছেন নতুন নতুন অনেক তথ্য বাঙলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে যুক্ত করেছেন।

সপ্তম থেকে একাদশ শতকের তাম্রশাসনগুলোতে যেসব কৃষিপণ্যের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে- আম, মহুয়া, পান, সুপারি, নারকেল, কলা, ডালিম, খেজুর, তুলা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তুলা ছিল বাংলার একটি অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। তুলা থেকে প্রধানত সুতা উৎপাদন করে বস্ত্র বুনন করা হতো।

শুধু কৃষিপণ্যের নাম নয়, কৃষি জমির ধরণ, পরিমাপ পদ্ধতি ও মূল্য সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় তাম্রশাসনগুলোতে। বন বা জঙ্গল কেটে নতুন গ্রাম প্রতিষ্ঠা এবং চাষের জন্য জমি পুনরুদ্ধারের খবর জানা যায়। তাছাড়া ভূমিদানে এই দলিলগুলো থেকে চার ধরণের রাজস্বের কথাও জানা যায়। এগুলো হচ্ছে-

- ভাগ
- ভোগ
- কর এবং
- হিরণ্য।

তেরো থেকে সতের-আঠারো শতকের বাংলা অঞ্চলের কৃষি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় বিদেশী পর্যটক এবং বণিকদের বিভিন্ন লেখা থেকেও। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইবনে বতুতা নামক একজন পরিব্রাজক বাংলায় এসেছিলেন। ইবনের বতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বাংলা অঞ্চলের ধান-চালের প্রাচুর্যের কথা বলা আছে। অন্যান্য স্থানের তুলনায় এগুলো দামেও খুব সস্তা ছিল বলে ইবনে বতুতা লিখেছেন। কিন্তু এই সস্তা দাম সত্ত্বেও বাঙলা

অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ছিল কিনা তা অবশ্য তিনি বলেন নি। ধান-চালের বাইরে আরও যেসব পণ্যের নাম ইবনে বতুতার লেখা থেকে জানা যায় তা হচ্ছে, মুরগি, পায়রা, ভেড়া, গরু, মহিষ, ঘি, চিনি, তিল, তেল, কার্পাস বস্ত্র ইত্যাদি।

বাংলা অঞ্চলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ উৎপাদনকারী কৃষিপণ্য ছিল পাট। বাংলায় পাটের উৎপাদন এবং পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কথা জানা যায় চতুর্দশ শতকে রচিত বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম থেকে। বিশ শতকের মধ্যভাগ অবধি বাংলায় প্রচুর পরিমাণে পাটের চাষ হতো। নদীমাতৃক বাংলায় জলের প্রাচুর্য এবং আদ্র জলবায়ু পাটের এই ব্যাপক উৎপাদনে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে। এই পাটকে এক সময় বলা হতো সোনালী আঁশ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের সঙ্গেও এই সোনালী আঁশ নানাকারণে নানাভাবে জড়িত হয়ে আছে যা পরবর্তী শ্রেণিতে তোমরা বিস্তারিত পরিসরে জানতে পারবে।

প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি এবং পশুপালন একে অন্যের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। কৃষিকাজে গরু, মহিষের ব্যবহার সুপ্রাচীন কাল থেকেই হয়ে আসছে। কৃষির আরেকটি লাভজনক প্রাচীন পেশা হচ্ছে মাছ শিকার। অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, জলাধারে পূর্ণ বাংলা অঞ্চলের মানুষের কাছে মাছ বরাবরই একটি প্রিয় খাবার। 'মাছে-ভাতে বাঙালি' বলে একটি প্রবাদ এখনও বাংলার মানুষের মুখে মুখে ঘুরে-ফিরে বেড়ায়।

শিল্প অর্থনীতি

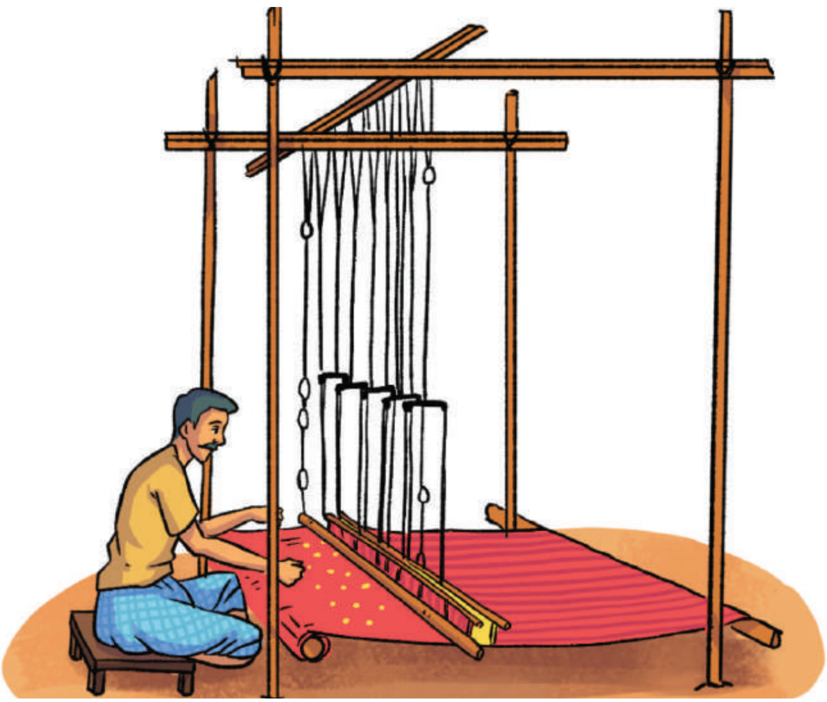

তাঁত বস্ত্র তৈরিতে নিয়োজিত কারিগর। ৩০০ পূর্বাব্দ থেকে শুরু করে ইতিহাসের প্রতিটি কালপর্বে ইউরোপ, চীন, আরব লেখক, পরিব্রাজক এবং বণিকদের বর্ণনায় বাংলার উৎকৃষ্ট বস্ত্রশিল্প এবং বয়নশিল্পীদের দক্ষতার প্রশংসা করা হয়েছে। প্রাচীনকালের ধারা অনুসরণ করে এখনও পাশ্চাত্য দেশগুলোর বাজারে বাংলা অঞ্চল এবং বিশেষ করে স্বাধীন বাংলাদেশে তৈরি রেডিমেড গার্মেন্টস বিশেষ জায়গা অধিকার করে আছে।

সভ্যতার বিকাশে কৃষির পরেই আসে শিল্পের কথা। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কোন একটি বিশেষ পণ্য উৎপাদন এবং বাজারে বিপনন করা হলে আমরা তাকে শিল্প পণ্য বলি। আমরা জেনে অবাক হই যে, আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগেই বাংলা অঞ্চলে এমন কয়েকটি শিল্পপণ্যের বিকাশ ঘটেছিল যার খ্যাতি পূর্ব দিকে চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে শুরু করে পশ্চিমে আরব, ইউরোপের ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল!

বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন ও বিখ্যাত শিল্পপণ্যের নাম হচ্ছে বস্ত্রশিল্প। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে লেখা 'অর্থশাস্ত্র' নামক একটি গ্রন্থে বঙ্গ এবং পুণ্ড্র জনপদে তৈরি সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্রের প্রশংসা করা হয়েছে। বঙ্গে ও পুণ্ড্রে সেই সময় অনেক প্রকারের বস্ত্র তৈরি হতো। সাধারণ অব্দ প্রথম শতকে লেখা একজন গ্রিক নাবিকের 'পেরিপ্লাস' নামক গ্রন্থে বাংলার উন্নতমানের মসলিন কাপড়ের কথা বলা হয়েছে। রেশম সুতোয় বোনা অত্যন্ত মিহি আর উন্নতমানের রেশমি বস্ত্রের খ্যাতি চীন, আরব এবং ইউরোপের ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সেইসব দেশের বাজারে বাংলার বস্ত্রের বিরাট চাহিদাও তৈরি হয়েছিল।

নবম শতকের আরব বণিক সোলায়মান তাঁর একটি গ্রন্থে লিখেছেন, বাংলায় বিশেষ এক ধরনের বস্ত্র পাওয়া যায় যা গোটা দুনিয়ায় বিরল। এই বস্ত্র এতোই সূক্ষ্ম এবং মসৃণ ছিল যে একটি আংটির ভেতর দিয়ে আস্ত একটি পোশাক চালান করে দেওয়া যেতো। চৌদ্দ-পনেরো শতকে বাংলায় আগত চীনা রাজদূতদের লেখা থেকেও বেশ কয়েক ধরণের উন্নতমানের বস্ত্রের নাম পাওয়া যায়। ইউরোপীয় বণিক এবং লেখকদের লেখা থেকে জানা যায়, সতের শতকেও সেখানকার মানুষের মধ্যে বাংলা অঞ্চলে তৈরি বস্ত্রের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছিল।

চলো এইবার একটি ভিন্ন রকমের শিল্পের কথা জানি। এই শিল্পটির বিকাশে বাংলার ভূ-প্রকৃতির রয়েছে বিরাট প্রভাব। অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল এবং জলাভূমিতে পরিপূর্ণ বাংলার মানুষের পক্ষে স্থলপথে যাতায়াতের সুবিধা ছিল খুবই কম। প্রাচীনকাল থেকেই তাই বাংলা অঞ্চলের মানুষের চলাচল এবং পণ্য পরিবহণের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠে বিভিন্ন রকমের নৌকা।

প্রয়োজনের তাগিদেই নৌ-শিল্পের উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটেছিল। দেশের অভ্যন্তরে এবং সমুদ্রে চলাচলের উপযোগী নানান আকৃতির নৌযান তৈরিতে দক্ষ ছিল বাংলার নৌ-শিল্প কারিগরেরা। নৌকার গলুইকে সিংহ, হংস প্রভৃতি পশু-পাখি বা মাছের মতো করে আকৃতি দান করা হতো। আকৃতি এবং কাজের ধরণ অনুযায়ী এদের সুন্দর সুন্দর নামও দেওয়া হতো। কোষা, ডিঙ্গি, ছিপ, বজরা, ময়ূরপঙ্খী, পানসি, পাতাম, সাম্পান, সওদাগরী, ইলশা- এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন রকমের নৌযানের নাম।

বাংলার পশ্চিমাংশে অবস্থিত চন্দ্রকেতুগড় প্রত্নস্থল থেকে জাহাজ ও ঘোড়ার ছবি যুক্ত সীলমোহর পাওয়া গেছে। দুই হাজার বছর আগে বাংলা অঞ্চলের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের সমুদ্র বাণিজ্যের প্রমাণ রয়েছে এই সীলমোহরগুলিতে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্নলেখা থেকে জানা যায়, নৌকাগুলো যুদ্ধের কাজেও ব্যবহৃত হতো। একেকটা নৌকা তিনশো গজ লম্বা এবং দুইশো গজ চওড়া হতো। দুই পাশে শতাধিক দাঁড় ও বৈঠা ফেলে সেইসব নৌকা চালানোর ব্যবস্থা ছিল।

অসংখ্য খাল-বিল, নদী-নালা ও জলাভূমিতে পূর্ণ বাংলা অঞ্চলে মানুষ সুপ্রাচীনকাল থেকেই চলাচল এবং মালামাল পরিবহনে নৌকার ব্যবহার করে আসছে। নৌ-শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। তৈরি হয়েছে নানান আকৃতি-প্রকৃতির নৌযান।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে মাটি, কাঁচ ও পাথর দিয়ে বিচিত্র রকম পুঁতি তৈরি করা হতো এমন একটি প্রত্নস্থল পাওয়া যাবে বর্তমান বাংলাদেশের নরসিংদী জেলার উয়ারি-বটেশ্বর নামক দুটি গ্রামে। প্রাচীন এই শিল্প এলাকাটির সঙ্গে ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্য যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। উয়ারি-বটেশ্বরে প্রত্নক্ষেত্রে প্রাপ্ত পুঁতি বা গুটিকা বাংলা অঞ্চলের শিল্প অর্থনীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

উয়ারী-বটেশ্বরে আবিষ্কৃত বিভিন্ন রকমের পুঁতি/গুটিকা। ওয়ারী-বটেশ্বর ছিল মূলত একটি শিল্প এলাকা। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে মাটি, কাঁচ ও পাথর দিয়ে এখানে বিচিত্র রকম পুঁতি তৈরি করা হতো। এগুলো এখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানি করা হতো।

-ইতিহাসবিদ ড.এনামুল হক (বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র)

হাজার বছর ধরে বাংলার দক্ষ কারিগরেরা বিভিন্ন রকমের শিল্প পণ্য নির্মাণ করে দেশে-বিদেশে সুখ্যাতি ছড়িয়েছেন। লোহা, তামা, রূপা এবং স্বর্ণনির্মিত বিভিন্ন সময়ের নানান রকমের প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গেছে বাংলার বিভিন্ন স্থানে। শিল্প অর্থনীতির ইতিহাসের ধারাবাহিক অগ্রগতি অনুধাবনে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শঙ্খ, কাঁসা এবং দারুশিল্প বাংলা অঞ্চলের শিল্প-অর্থনীতির ইতিহাসের আরও কিছু উজ্জ্বল দিক। শঙ্খ এবং কাসা দিয়ে তৈরি হতো দৈনন্দিন ব্যবহার্য নানা শৌখিন পণ্য। কাঠ কেটে যারা সুন্দর শিল্প নির্মাণ করতেন তাদের বলা হয় দারুশিল্পী। কাঠের পালঙ্ক, পিঁড়ি, বাটি, খুঁটি, বাতা, দরজা সহ নানান জিনিস তৈরি করা হতো অপূর্ব সুন্দর নকশা আর গড়নের ধারা অনুসরণ করে। এগুলোর বেশকিছু নিদর্শন আমরা দেখতে পাবো বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে এবং জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন জাদুঘরে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্যের সহজ একটি মানে হচ্ছে, কোন একটি পণ্য কাউকে দান করে সমান মূল্যের অন্য একটি পণ্য গ্রহণ করা। আরও সহজ করে এই প্রথাটিকে বলা হয় বিনিময় প্রথা। ইতিহাসের আদিতে মানুষ যখন মুদ্রা বা টাকার আবিষ্কার করেনি, তখনও কিন্তু বিনিময় প্রথা ছিল। সেই সময়ে মানুষ নিজের উৎপাদিত একটি পণ্যের বিনিময়ে অন্য কারও কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আরেকটি পণ্য নিতেন। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষ এক সময় এই বিনিময় ব্যবস্থাকে সহজ করার জন্যে মুদ্রা বা টাকার আবিষ্কার করে। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ আরও বেশি সুগম হয়ে উঠেছে।

মুদ্রা ও টাকার ইতিহাস

গৌড়ের শাসক শশাঙ্কের মুদ্রা

বাংলা অঞ্চলে প্রথম মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায় মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপিতে। প্রাক-সাধারণ অব্দ তৃতীয় শতকের এই লিপিতে 'গণ্ডক' ও 'কাকিনী' নামের দুই ধরনের মুদ্রার উল্লেখ রয়েছে। ধারণা করা হয়, গণ্ডক ও কাকিনী সেই সময় বাংলার উত্তর-পশ্চিম অংশে চালু ছিল। অনেকেই মত দিয়ে থাকেন, গণ্ডক শব্দটি এসেছে কড়ির হিসেব থেকে। এক গণ্ডক মানে এক গণ্ডা বা চারটি কড়িকে বোঝানো হয়েছে।

উত্তর ভারতকেন্দ্রিক গুপ্ত শাসকেরা ৩য় বা ৪র্থ শতকে বাংলা অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন। গুপ্ত শাসকদের জারি করা প্রচুর স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকে বাঙলা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ শাসনকারী কয়েকজন স্বাধীন শাসক নিজ নিজ এলাকা থেকে মুদ্রা জারি করেছিলেন। এঁদের মধ্যে শশাঙ্ক-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

পাল এবং সেন শাসকদের সময়ে মুদ্রা হিসেবে কড়ির প্রচলন ছিল বেশি। এছাড়াও এই সময় বিনিময় মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের চূর্ণীর (গুঁড়া করা সোনা ও রূপার) ব্যবহার ছিল বলে জানা যায়।

বাঙলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে হরিকেল মুদ্রা নামে বিপুল সংখ্যক মুদ্রা পাওয়া গেছে। ১৩০০ সালের পর থেকে বাঙলা অঞ্চলে নিয়মিত মুদ্রা প্রকাশিত হচ্ছে। উত্তর ভারত থেকে প্রকাশিত মুদ্রাও এখানে চলতো। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ব্রিটিশ শাসকেরা মুদ্রা জারি করেছেন।

মুদ্রা যেখান থেকে জারি বা ছাপা হতো সেটিকে টাকশাল বলা হতো। শাসকগণ নিজেদের দখলকৃত এলাকায় টাকশাল স্থাপন করে এইসব মুদ্রা জারি করতেন। বাংলায় প্রথম বিনিময় মাধ্যম হিসেবে কাগজের নোট ছাপা হয় ১৮৬১ সালে। বর্তমানে বাংলাদেশের মুদ্রার নাম টাকা।

নদীমাতৃক বাংলা অঞ্চলের উর্বর পলিমাটিতে সবসময়ই উৎপাদিত হতো প্রচুর খাদ্যশস্য। এখানকার বনাঞ্চলে পাওয়া যেতো প্রচুর পশুপাখি, ঔষধি বৃক্ষ, সুগন্ধি কাঠ এবং মশলা। সম্পদের এই প্রাচুর্য ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। একদিকে ছিল সম্পদের প্রাচুর্য। অন্যদিকে বাংলার অসংখ্য নদীনালা আর সমুদ্র পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে দান করেছে অবাধ সুবিধা। দক্ষিণের উন্মুক্ত সমুদ্র বাংলাকে যুক্ত করেছে ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চল, আরব, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্র বাণিজ্যের জলপথগুলোর সাথে।

বাংলার প্রাচীনতম প্রত্নস্থল পাণ্ডুরাজার ঢিবি। এখানে স্টিটাইট পাথরের গোলাকার সিল পাওয়া গিয়েছে। সিলে রয়েছে খোদাই করা কতগুলো চিহ্ন। চিহ্নগুলোকে অনেকেই চিত্রাক্ষর বলে মনে করেন। এই চিত্রাক্ষরের সঙ্গে আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ভূ-মধ্যসাগরীয় এলাকায় অবস্থিত ক্রীট দ্বীপের চিত্রাক্ষরের মিল রয়েছে। এগুলো এখন পর্যন্ত পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে এই চিত্রাক্ষর প্রমাণ করে বাংলা অঞ্চলের সঙ্গে ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বণিকদের নিশ্চয়ই বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

ভূ-মধ্যসাগরীয় এলাকার সঙ্গে আজ থেকে দুই হাজার বছর আগে যে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রিক এবং ল্যাটিন লেখক, বণিক এবং নাবিকদের লেখাতেও। প্রথম শতকে, অর্থাৎ আজ থেকে দুই হাজার বছর আগে একজন গ্রিক নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে বাংলা অঞ্চল থেকে রপ্তানি করা হতো এইরূপ কিছু বাণিজ্যপণ্যের নাম উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে, তেজপাতা, সুগন্ধি তেল এবং সুক্ষ্ম সুতিবস্ত্র।

বাংলা অঞ্চলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য বন্দর

প্রাচীনকালে বাংলা অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারে কয়েকটি নৌ বন্দর এবং সমুদ্র বন্দরের ভূমিকা ছিল ব্যাপক। এর মধ্যে চন্দ্রকেতুগড়, তাম্রলিপ্তি এবং সমন্দরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাম্রলিপ্তির সঙ্গে প্রায় গোটা পৃথিবীর সামুদ্রিক যোগাযোগ ছিল বলে প্রাচীন ইতিহাসের দিকপাল ড. এনামুল হক তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন।

তাম্রলিপ্তির ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে পাওয়া যাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের তমলুক জেলায়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, সিংহলী গ্রন্থ এবং গ্রিক ও চৈনিকদের লেখায় তাম্রলিপ্তি বন্দরের উল্লেখ রয়েছে। রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত এই বন্দরটি প্রাক-সাধারণ অব্দ তৃতীয় শতক থেকে সাধারণ অব্দ অষ্টম শতক পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। এটি ছিল বাংলার সবচাইতে পুরাতন গুরুত্বপূর্ণ বন্দর এবং নগরকেন্দ্র। ইতিহাসবিদ ড. এনামুল হক-এর গবেষণা থেকে জানা যায়, নদীতে অত্যধিক পলি জমার কারনে অষ্টম শতক থেকে বন্দরটি ক্রমেই তার গুরুত্ব হারায়।

আঞ্চলিক বাংলা ও বাংলাদেশ (১৩০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত)

তাম্রলিপ্তি, চন্দ্রকেতুগড় এবং সমন্দর বন্দরের অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

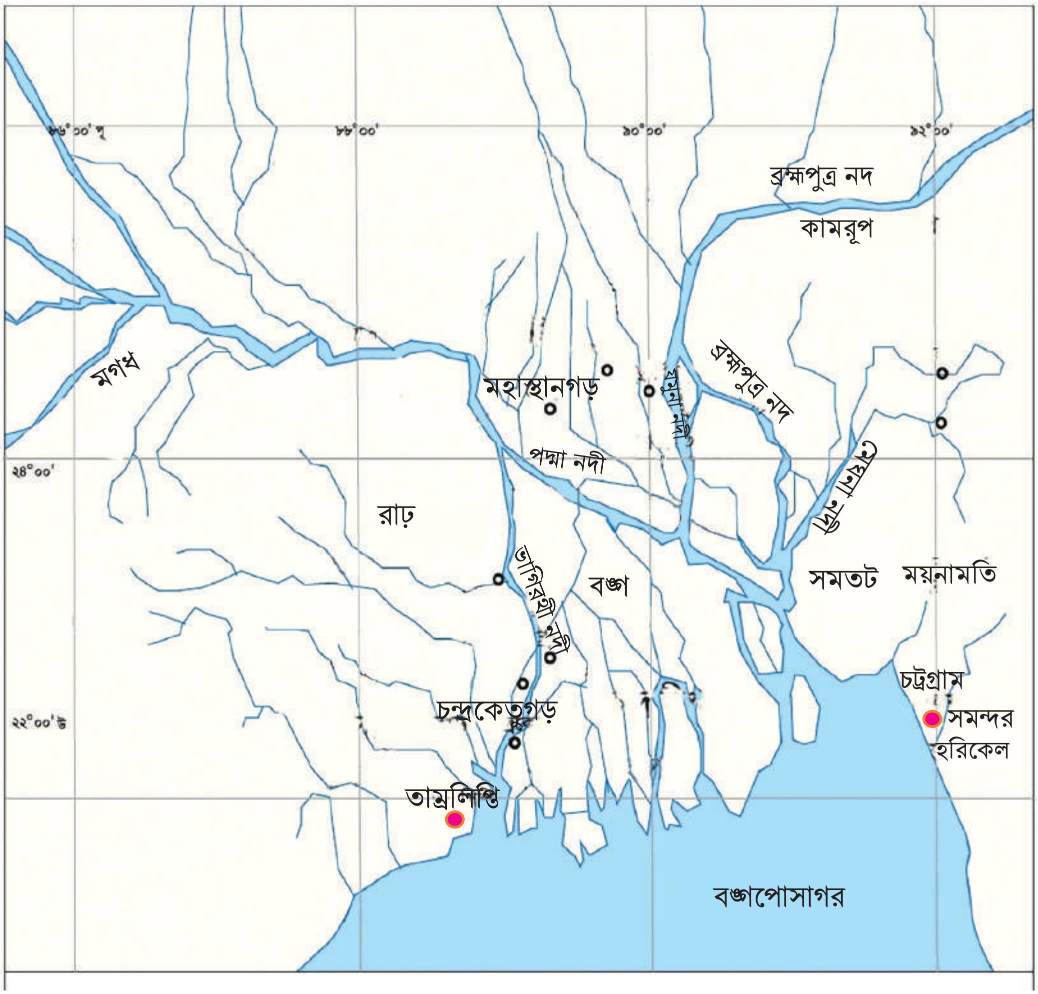

তাম্রলিপ্তি ছিল বাংলা অঞ্চলের পশ্চিমদিকে অবস্থিত বাণিজ্য-বন্দর। বন্দরটি যে সময় থেকে নিষ্ক্রিয় হতে শুরু করে সেই সময়েই বাংলার পূর্বদিকে বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সন্নিকটে সমন্দর নামে একটি বন্দরের উত্থান হয়। একাদশ শতকের অল্প কিছু আগে থেকে বাংলা অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর হয়ে ওঠে সমন্দর। এই বন্দর ধরে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে আরব বণিকেরা, পরবর্তীকালে পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসি এবং ইংরেজ বণিকেরা। বিভিন্ন উৎসে সমন্দর বন্দরটিকে সুদকাওয়ান নামেও ডাকা হয়ে থাকে।

সমুদ্র বন্দরের পাশাপাশি কয়েকটি অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরও প্রাচীনকালে বাংলা অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অভ্যন্তরীণ বন্দরের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদী তীরবর্তী উয়ারী-বটেশ্বর এবং ক্ষীরোদা নদী তীরবর্তী দেবপর্বত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন দেবপর্বত বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার লালমাই ময়নামতি এলাকায় অবস্থিত।

১৯৪৭ সালে ভারত ও বাংলা ভাগ হয়। ভারত ভাগ হয়ে হয় দুটো দেশ- ভারত আর পাকিস্তান। বাংলা ভাগ হয় দুই নামে- পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা। এই বিভাজন বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বাংলা অঞ্চলের পূর্বভাগ যা পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ব বাংলা) নাম ধারণ করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয় এটি ছিল অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া একটি এলাকা। সেই সময় পূর্ব বাংলায় পাট, লোহা, স্টিল, লবণ, কাগজ বা রাসায়নিক কারখানা- কোনটাই ছিল না। ১৯৫০-এর দশক হতে অল্পকিছু কিছু কল-কারখানা গড়ে উঠতে শুরু করলেও অধিকাংশ কারখানার মালিক ছিলেন অ-বাঙালি।

কৃষিক্ষেত্রেও বাংলার পূর্ব অংশের মানুষেরা বৈষম্যের শিকার হয়। বাংলার কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করে প্রভূত অর্থ আয় হলেও পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের হিসাবেও বৈষম্য বাড়ে।

বাংলার পূর্ব অংশের মানুষেরা অর্থনীতিতে অধিক অবদান রাখা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী দ্বারা শোষিত হতে থাকে। পাকিস্তান সরকারের এই বৈষম্যমূলক আচরণের ফলেই বাংলার পূর্ব অংশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয় তার নেপথ্যে বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির বাসনা গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

অনুশীলনী

১৯৭১ সালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঙলা অঞ্চলের পূর্ব অংশে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে কীভাবে ভূমিকা পালন করেছে তা নিয়ে উপরের পাঠের আলোকে চলো একটি প্রতিবেদন লিখি-

----

স্বাধীন বাংলাদেশ: অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে (১৯৭১-২০২৩)

হাজার বছরের কাল পরিক্রমায় বাংলা নামের যে অঞ্চলের কথা আমরা জেনেছি, সেই অঞ্চলেরই পূর্ব অংশে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র। ২০২১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছে। চলো এইবার গত ৫২ বছরের স্বাধীন

বাংলাদেশে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন এবং রূপান্তরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নেই।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, রাস্তাঘাট, অবকাঠামো- সকল কিছুই ভেঙে গিয়েছিল। অর্থনৈতিক জীবনে নেমে এসেছিল চরম বিপর্যয়। এই বিপর্যয় থেকে বাংলাদেশের মানুষকে মুক্ত করে তাদের অর্থনৈতিক জীবনে সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে বঙ্গবন্ধু নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন, একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে। এই লক্ষ্য অর্জনে তিনি দিন-রাত কাজ করে বহুদূর এগিয়েও গিয়েছিলেন। তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বেই ১৫ আগস্ট ভোরবেলা মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি তাদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দোসরদের সাথে ষড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাঁর উপস্থিত পরিবার পরিজন এবং তাঁর কিছু সহকর্মীকে হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের পর স্বাধীন বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাঙলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ থেকে ছিটকে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কার্যকলাপ মুখ্য হয়ে ওঠে। শিক্ষাক্ষেত্রে উপনিবেশিক শক্তির প্রভাব শুরু হয়। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের জন্যে সামরিক শাসন নেমে আসে। এইসব বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে সমৃদ্ধি অর্জনের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে।

অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের পথে বাংলাদেশ

রাজনৈতিক অঙ্গনের বহু বাঁধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এমনকিছু নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছেন যার ফলে বর্তমান বাংলাদেশ গোটা পৃথিবীর পাঁচটি দ্রুত বর্ধনশীল-অর্থনীতির একটির তালিকায় নাম লেখাতে সক্ষম হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার ও নীতিমালা প্রণয়ন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথ ধরেই দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং খাদ্যে নিরাপত্তা আনার জন্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার 'একটি বাড়ি একটি খামার' নামে প্রকল্প গ্রহণ করেন। দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে শিক্ষার বিস্তার, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, নারীর ক্ষমতায়ন, কমিউনিটি ক্লিনিক সেবা সহ আরও নানান পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেন। যার ফলে এখানকার মানুষের সামগ্রিক জীবনমানে দৃষ্টান্তমূলক উন্নতি সাধিত হয়েছে। ২০০০ সালেও বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮.৯% যা কিনা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে কমতে শুরু করে এবং ২০২০ সালের মধ্যে ২০.৫% এ নেমে আসে।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশের জিডিপি আকার ছিল ১৮.১৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার। ২০২১ সালে এই আকার হয়েছে ৪০৯ বিলিয়ন ইউএস ডলার। একটি দেশের অভ্যন্তরে সারা বছর ধরে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার মূল্যই হচ্ছে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি বা গ্রোস ডমেস্টিক প্রডাক্ট)। আগের বছরের তুলনায় পরের বছরে এ উৎপাদন যে হারে বাড়ে সেটি হচ্ছে জিডিপির প্রবৃদ্ধি। জিডিপি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সূচক। অর্থনৈতিক, সামাজিক, খনিজ, মানবসম্পদ, স্বাস্থ্য, এবং নারীর উন্নয়নের মানদণ্ড বা অনেকগুলো সূচকে বাংলাদেশ বর্তমানে ভারত ও পাকিস্তানকেও ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অফিসের তথ্য থেকে আমরা এবিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবো।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের ভূমিকা অপরিহার্য। ২০০৯ সাল থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ঢাকা সহ সমগ্র বাংলাদেশের জন্যে একটি ব্যাপক ও বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ফলস্বরূপ চার লেনের হাইওয়ে বা মহাসড়ক নির্মাণ করে ঢাকার সঙ্গে নতুন প্রতিষ্ঠিত বিভাগ ময়মনসিংহ এবং বন্দর নগরী চট্টগ্রামকে যুক্ত করা হয়েছে।

২০২২ সালের জুন মাসে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং এবং সর্ববৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প পদ্মা সেতু। দুইস্তর বিশিষ্ট এই সেতুটির উপরের স্তরে রয়েছে চার লেনের সড়ক পথ এবং নিচের স্তরে রয়েছে রেলপথ। পদ্মা সেতুর সড়কপথ চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকের বিরাট অংশ এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে সরাসরি ঢাকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয় স্তরের রেলপথটি চালু হবার ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশের সঙ্গে সরাসরি রেলপথেও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। পদ্মাসেতুর সাফল্যে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে দেশের আপামর জন-সাধারণ যে আস্থা ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

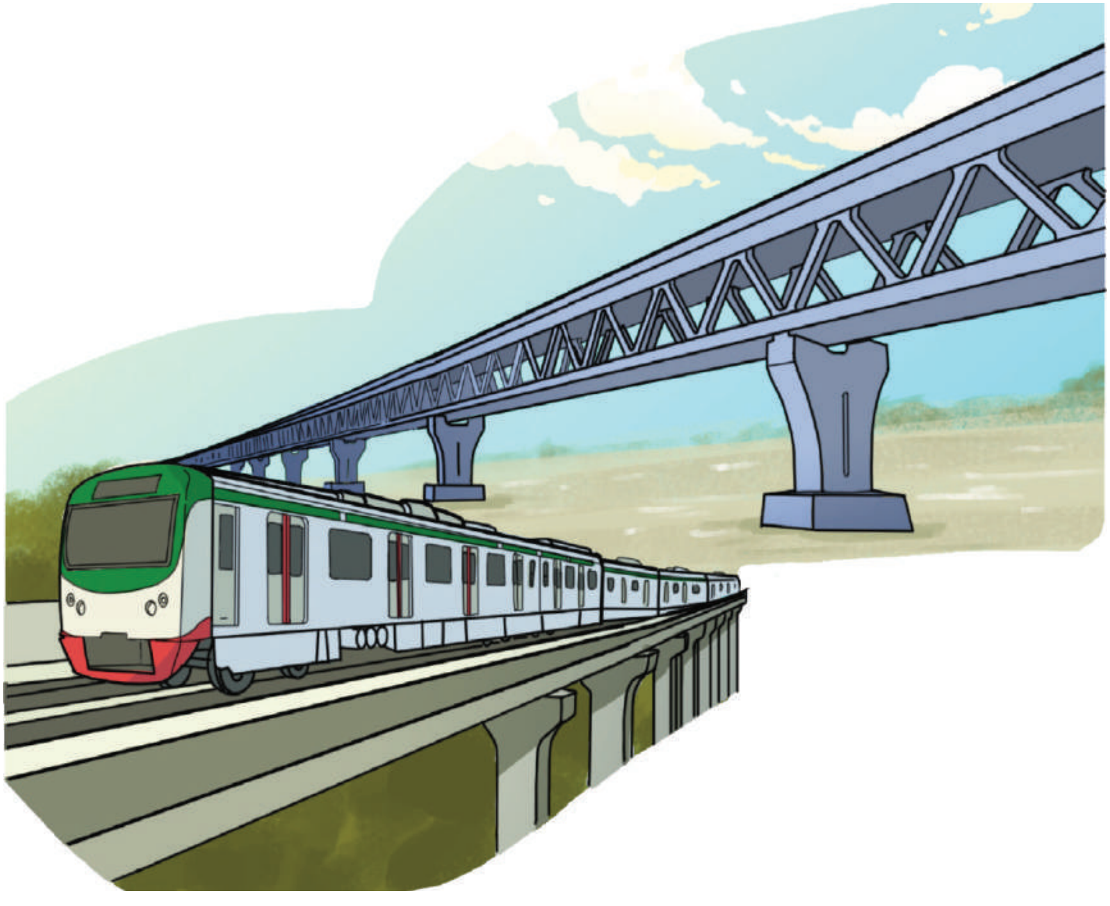

পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেল বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের অধীনে নির্মিত হয়েছে দ্রুতগামী বাস পরিবহন লেন, এক্সপ্রেসওয়ে সহ নানান ধরনের সংযোগ সড়ক। ঢাকার ভেতরে বসবাসরত নাগরিকদের চলাচলের সুবিধার জন্য বঙ্গাবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ঢাকা মেট্রোরেল সহ অনেকগুলো ফ্লাইওভার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যা ইতোমধ্যেই সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

বাংলাদেশের যোগাযোগ এবং পরিবহন ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৬০ মিটার উচ্চতায় নির্মিত থানচি থেকে আলীকদম রোড এবং কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত নির্মিত মেরিনড্রাইভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুটি সড়কের মাধ্যমে বাংলাদেশের দুর্গম পার্বত্য এবং উপকূলীয় এলাকায় চলাচল ও পরিবহনের কাজকে সহজতর করেছে। কর্ণফুলি নদীতে বঙ্গাবন্ধু টানেল বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাসে এক দৃষ্টান্তমূলক সংযোজন।

আধুনিক যুগে মানুষের সকল কর্মকাণ্ডই যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশের মানুষকে তথ্যপ্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করে উন্নয়নের পথে ধাবিত করার জন্যেই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ে তোলার রূপকল্প ঘোষণা করেছিল। এই রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রযুক্তিপণ্যকে সহজলভ্য করে মানুষের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে এবং ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ব্যবহারও সুলভ করা হয়েছে। এরই ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই, ২০২০ সালে করোনা মহামারীর কালে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই বাংলাদেশের মানুষ শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা গ্রহণ, অফিস-আদালত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে।

অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিল্পক্ষেত্রেও স্বাধীন বাংলাদেশ লক্ষ্যনীয় উন্নয়ন সাধন করেছে। বর্তমান বাংলাদেশে প্রধানতম শিল্প হচ্ছে রেডিমেড গার্মেন্টস বা তৈরি পোশাক শিল্প। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ থেকে ৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। মাত্র কয়েক দশকেই শিল্পটির ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেখা যায়, তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের যা কিনা বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮২%-এর চেয়েও বেশি। তৈরি পোশাক শিল্প ছাড়াও ঔষধ, জাহাজ ভাঙা, সিমেন্ট প্রভৃতি শিল্পক্ষেত্র বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনা তা বাস্তবায়নে দিন-রাত পরিশ্রম করে চলেছেন।

আধুনিক প্রযুক্তিপণ্য, কলকারখানা এবং যানবাহন চালনায় কয়লা, জ্বালানি তেল, গ্যাস, পেট্রোলিয়াম এবং বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কয়লা, তেল প্রভৃতি বাইরে থেকে আমদানি না করেই শক্তির চাহিদা পূরণ করার জন্যে বাংলাদেশ সরকার রাশিয়ার সঙ্গে একটি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২০১৭ সাল থেকে পাবনা জেলার রূপপুরে এই পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। রামপাল, পায়রা এবং মাতারবাড়ি পাওয়ার প্ল্যান্ট সম্পূর্ণভাবে চালু হলে শতভাগ বিদ্যুতায়নের পরিকল্পনায় বাংলাদেশ লক্ষ্য অর্জনের চূড়ান্ত ধাপে পৌঁছে যাবে।

গত প্রায় এক দশক ধরেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭% এর উপরে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয়ের হিসেবেও গত

এক দশকে যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। নিচে একটি রেখাচিত্র দেয়া হলো, যেটি বিশ্লেষণ করলে আমরা নিজেরাই ১৯৭১ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ের উর্ধ্বমুখী নমুনা বুঝতে পারবো।

জিডিপি: মাথাপিছু আয় (১৯৭১-২০২১)

জিডিপি: মাথাপিছু আয় মার্কিন ডলার $

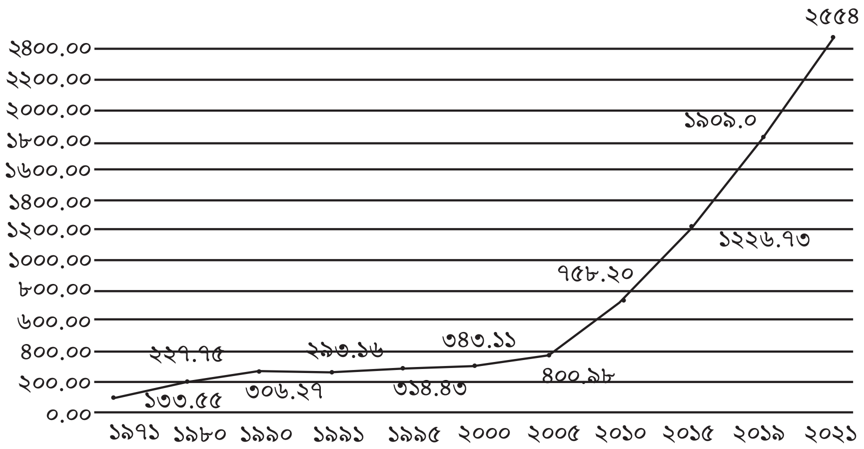

অনুশীলনী

এসো পোস্টার বা দেয়াল পত্রিকা বানাই

খুশি আপা ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীকে কয়েকটি দলে ভাগ করে দিলেন। প্রতিটি দল একটি করে পোস্টার বা দেয়াল পত্রিকা বানাবে। প্রতিটি পোস্টার বা দেয়াল পত্রিকায় থাকবে বর্ণনা ও ছবি সহ ২০১০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ। এবার পোস্টার ও দেয়াল পত্রিকাগুলো ক্লাসে কিংবা স্কুলের কোনো স্থানে টানিয়ে দাও।

হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চলে
স্বাধীন বাংলাদেশ-এর অভ্যুদয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল দিয়ে বছর শুরু হলো।

ইলিন, মাইকেল, ফাতেমা, নীলান্তরা এবার সপ্তম শ্রেণিতে।

বাংলা অঞ্চলে মানুষজন হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় কীভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল সেই ইতিহাসে তারা মগ্ন হয়ে আছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ইতিহাসের এই বিষয়গুলো খুব সহজভাবে আলাপ করেছিলেন খুশি আপা। নীলান্তদের মনে তারপরেও নানান চিন্তা ও প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। খুশি আপা বললেন তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর জানবো নিচের পাঠ থেকে।

হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চলে মানুষের জীবন ও সংগ্রাম

বাংলা অঞ্চলের ভূমি সবসময়ই উর্বর। এখানকার বনে-জঙ্গলে পাওয়া যায় খাবার উপযোগী প্রচুর সামগ্রী আর নদীসহ অন্যান্য জলাশয়গুলোতে মাছ। বাংলা অঞ্চলে মানুষের দেহ-গড়ন, ভাষা ও সংস্কৃতিতে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তার কারণ হচ্ছে আদিকাল থেকেই নানান জনধারা এবং ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ এখানে এসেছেন এবং খাদ্যের প্রাচুর্য দেখে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছেন। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে জয় করে প্রাকৃতিক সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগিয়েছেন। সহজলভ্য খাদ্য ও অন্যান্য সম্পদ আহরণে বিভিন্ন রাজবংশ, সৈনিক, ও যোদ্ধা বাংলা অঞ্চলে আক্রমণ করেছেন।

কখনো তারা সম্পদ নিয়ে চলে গিয়েছেন, কখনও আবার স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে নিজেদের ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনে তাই খাদ্যের প্রাচুর্য যেমন ছিল, তেমনই ছিল প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট নানান প্রতিকূলতা।

বাংলা অঞ্চলের ভূমি বিরল বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যময়। অঞ্চলটির তিনদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এই পাহাড়ি এলাকাগুলো থেকে নেমে আসা অনেক নদী বাংলায় প্রবেশ করে অসংখ্য শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হয়েছে। নদীগুলো সমস্ত অঞ্চলটিকে জালের মতো জটাকারে আবদ্ধ করেছে। বন-জঙ্গল এবং নদীতে রয়েছে সহজ খাদ্যের যোগান, রয়েছে নানা রকমের বন্যপ্রাণী ও কিটপতঙ্গ।

ঝড়-তুফান আর বন্যা এ অঞ্চলের মানুষের নিত্য সংগী। উঁচু-নিচু জলাভূমি ভরাট করে, বন-জঙ্গল কেটে তাদেরকে তৈরি করতে হয়েছে নিজেদের বাসভূমি এবং চাষক্ষেত্র। এখানে খাদ্যের যোগান সহজ হলেও মানুষের জীবন ছিল সংগ্রামমুখর।

ভারতবর্ষের পূর্বাংশে অবস্থিত বাংলা অঞ্চল। এই বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন 'বঙ্গ' জনপদ থেকে ধীরে ধীরে 'বঙ্গাল', তারপর 'বাঙ্গালা' এবং ১৮ শতক থেকে 'বেঙ্গাল' নাম-পরিচিতি গড়ে উঠেছে। বড় হয়ে যখন আরো বিস্তারিত পরিসরে অনুসন্ধান করবে তখন অনুধাবন করতে পারবে যে, এই 'বেঙ্গাল' বা 'বাংলা'কে পরবর্তীকালে কীভাবে 'পূর্ব বাংলা' আর 'পশ্চিম বাংলা' নামে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে কীভাবে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল।

নদীমাতৃক বাংলার নৌপথে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলার পানি, কাদা মাটি, সবুজ অরণ্য, বৃষ্টি আর সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ছিল গভীর মিতালী।

বাংলা অঞ্চলে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতের উত্তর-পশ্চিম হরপ্পা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। বাংলা অঞ্চলে কি এমন কোনো সভ্যতার কথা জানা যায়? প্রাচীন ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় সভ্যতা গড়ে ওঠার পৃথক পৃথক ইতিহাসের মতোই বাংলা অঞ্চলের মানুষজনও নিজেদের মতো করে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। পান্ডু রাজার ঢিবির কথা আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। এছাড়াও পুণ্ড্রনগর, তাম্রলিপ্তি, সমতট সহ অনেকগুলো স্থানে নগর-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে দেব, চন্দ্র, পাল এবং সেন রাজবংশ বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজত্ব করতে শুরু করে।

উত্তর ভারতে এই সময় বেশ কয়েকটি শক্তিশালী রাজবংশ তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। যাদের মধ্যে রয়েছে মৌর্য্য, কুষাণ, গুপ্ত সহ নানান রাজবংশ।

উত্তর ভারতে ক্ষমতা দখল ও রাজ্য গড়ে তোলার রাজনীতি ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই সকল রাজক্ষমতাশালীরা পূর্বদিকে তাদের ক্ষমতা বিস্তার করতে গিয়ে বাংলা অঞ্চলেও বারবার আক্রমণ পরিচালনা করেছেন, দখল করেছেন। এই রাজবংশের রাজাদের প্রায়

সকলে ছিলেন উচ্চাভিলাষী এবং বড় বড় রাজ্য বা সম্রাজ্য গড়ে তুলতে আগ্রহী।

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে ১৮০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত সময়ে নানান ভাষা, ধর্ম ও জাতি পরিচয়ের শাসকেরা একের পর এক যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়েছেন। ভারতের বিভিন্ন অংশ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সুলতানি ও মুগল শাসন নামে ক্ষমতা-বলয় গড়ে তুলেছেন। ভারতবর্ষের পূর্বাংশ তথা বাঙলা অঞ্চলের বড় একটি অংশও এই ক্ষমতা-বলয়ের মধ্যে ছিল।

পরবর্তীকালে ইউরোপীয় বণিকদের হাত ধরে এই অঞ্চলে একই প্রক্রিয়ায় দখলদারিত্ব অব্যাহত রেখেছেন পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজ সহ সুবিধাবাদী নানান জাতির একদল মানুষ। তাদের ক্ষমতা বিস্তার আর সম্পদ দখলের রাস্তা ধরে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের মানুষের উপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ শুরু হয় ১৯৪৭ সাল থেকে। এই সকল শাসন-শোষণের অবসান হয় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

বাংলা অঞ্চলে ক্ষমতার পালাবদল

৬ষ্ঠ এবং ৭ম শতকের পর থেকে বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ শাসন করেন দেব, পাল এবং চন্দ্র বংশীয় শাসকগোষ্ঠী। ধর্ম পরিচয়ে তারা ছিলেন বৌদ্ধ। যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে তারা নিজেদের শক্তি প্রমাণ করেছেন। ১২ এবং ১৩ শতকের সূচনালগ্ন পর্যন্ত বাংলা অঞ্চল শাসন করেছেন দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সেন রাজবংশ। এই বংশের রাজা বিজয়সেন বৃহৎ পরিসরে বেশ কিছু যুদ্ধ পরিচালনা করেন বলে দেওপাড়া প্রশস্তিলিপি সূত্রে জানা যায়। লিপিটি বাংলার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাহোক, বাংলা অঞ্চলে তখনও 'বাংলা' নামের রাজনৈতিক অখণ্ড কোনো পরিচয় গড়ে ওঠেনি। তবে 'বঙ্গ' এবং 'বঙ্গাল' নামে দুটি পৃথক ইউনিটের অস্তিত্ব ছিল বলে তৎকালীন উৎসগুলো থেকে জানা যায়।

১২ শতকের লিপিতে বাঙলা বর্ণমালার অক্ষর

১২ শতকে লিখিত প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ উৎস একটি লিপির নাম দেওপাড়া প্রশস্তিলিপি। লিপিটিতে কিছু অতি প্রশংসাসূচক শ্লোক রয়েছে যেগুলো সেন রাজবংশ বিশেষত বিজয়সেনের ইতিহাসের উপর আলোকপাত করে। সেনযুগের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি এবং লক্ষ্মণসেন-এর মন্ত্রী উমাপতিধর এ প্রশস্তিলিপি রচনা করেছেন। এই প্রশস্তিলিপির অক্ষর নিয়ে গবেষণা করে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, লিপিটিতে বলতে গেলে বাংলা বর্ণমালার প্রায় ২২টি অক্ষরের প্রাথমিক রূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ কারণে দেওপাড়া প্রশস্তিলিপিটিকে আধুনিক বাংলা বর্ণমালার পূর্বসূরি বলা হয়ে থাকে।

অনুশীলনী

চলো বাংলা বর্ণমালার প্রাচীন রূপ খুঁজে বের করি-

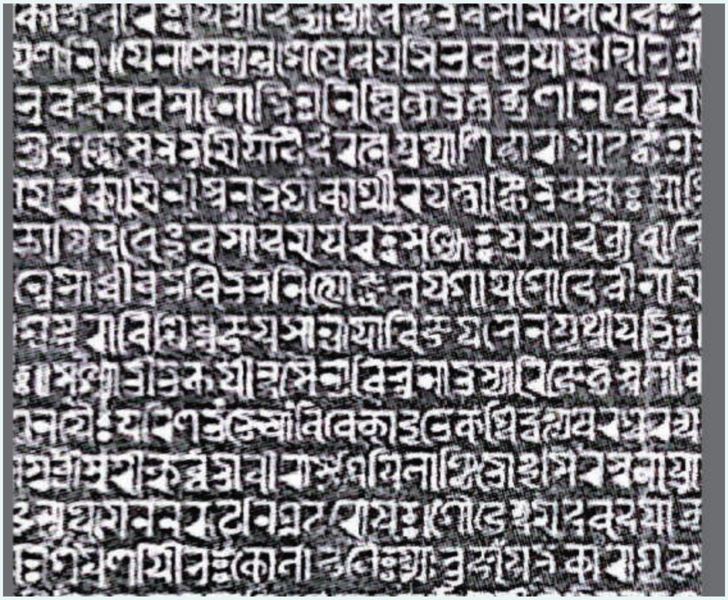

দেওপাড়া প্রশস্তির একটি খণ্ডচিত্র এটি। এই ছবিটি থেকে তোমরা কে কতোগুলি বর্ণমালা চিহ্নিত করতে পারবে। এসো তা খাতায় লিখি এবং অন্যদের সাথে মিলিয়ে দেখি।

সেন বংশের রাজারা পাল বংশের রাজাদের অধীনে সামন্ত হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। পাল ক্ষমতার দুর্বলতার সুযোগে সেন রাজারা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেন। লক্ষণসেন এবং তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন ১২২০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত সেন ক্ষমতা বাংলা অঞ্চলের বিক্রমপুরে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেনদের পর সোনারগাঁ-বিক্রমপুর সহ বাঙলার পূর্বাংশে দনুজ রায় নামে একজন শক্তিশালী রাজার উত্থান ঘটেছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। ১২৮০ সালের দিকে দিল্লির সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন যখন সোনাগাঁর-এর দিকে আসেন দনুজ রায় তখন এই অঞ্চলের শাসনকর্তা এবং তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেই দিল্লির সুলতান বলবন লখনৌতি তথা বাঙলার পশ্চিমাংশের বিদ্রোহী শাসক তুগরল খান-কে বন্দী ও পরবর্তীকালে হত্যা করেন। বিক্রমপুর ছিল প্রাচীন বাংলার একটি অন্যতম রাজধানী। বর্তমান রাজধানীটি খুঁজে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলায়।

পাল ও সেন রাজাদের মতোই পরবর্তী সময়ে বাংলা অঞ্চলের মানুষের রাজনৈতিক ভাগ্য অল্প কিছু মানুষের হাতে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। ১২ থেকে ১৪ শতকের ইতিহাসের উৎসগুলোতে বাংলা অঞ্চলে আগত যোদ্ধাদেরকে 'তুরুস্কাস', 'যবন', 'তাজিক' ইত্যাদি নামে পরিচয় দেয়া হয়েছে। এভাবেই বাংলা অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী মানুষের জীবনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে অনেকগুলো নতুন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি আর রাজশক্তি। কেননা সাধারণ মানুষের জীবনের ভাষা, ধর্ম আর সংস্কৃতি থেকে এগুলো আলাদা।

১৩ শতকের শুরুতে তুর্কী-আফগান যোদ্ধা ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বাংলা অঞ্চলের উত্তর এবং পশ্চিম সীমানার কিছু অংশে আধিপত্য বিস্তার করেন। এই অংশ বর্তমান ভারতের বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমানার মধ্যে পড়েছে। তাঁর হাত ধরেই বাংলা অঞ্চলে তুর্কী-আফগান ও পারস্যদের শাসন শুরু হয়।

বখতিয়ার খলজির পর আলী মর্দান খলজী, শিরান খলজী, ইওজ খলজী প্রমুখ বাংলার বেশ কিছু অংশে রাজত্ব শুরু করেন। তারা বেশ কিছু মসজিদ তৈরি করেন। বাংলা অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী আদি অধিবাসীদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির সঙ্গে খলজীদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির কোনো মিল ছিল না। ধীরে ধীরে খলজীরা বাংলার পূর্বদিকে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার দিকে মনোনিবেশ করেন।

তুর্কী-আফগানদের পর পারস্য থেকে আগত শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাংলা অঞ্চলের প্রধান একটি অংশ নিয়ন্ত্রণে নেন এবং 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' উপাধি গ্রহণ করেন। বোঝা যায়, ততোদিনে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে বলেই এই ভূ-খণ্ডের রাজা-কে ‘বাঙ্গালা’ কিংবা ‘বাঙ্গালিয়ান’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে জেনে রাখবে, বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ শাসনকারী ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ, গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, নসরত শাহের মতো রাজা/সুলতান কিংবা শাসকদের কেউই কিন্তু বাঙলা ভাষা-ভাষী ছিলেন না। কিন্তু এঁদের অনেকেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন। একইসঙ্গে কেউই বাংলা অঞ্চলের গোটা ভূ-খণ্ড এককভাবে শাসন করতে পারেন নি।

ভারতবর্ষ-এর পূর্বাংশে অবস্থিত বাংলা অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে আগত শাসকদের শক্তির বিরুদ্ধে সমবেতভাবে লড়াই করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের ছিল না। তবে বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের জীবনে তেমন বড় কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। মজার ব্যাপার হলো, বাংলার মুসলমান শাসকদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ছিল উত্তর ভারতের দিল্লিকেন্দ্রিক মুসলমান সুলতান এবং শাসকদের। দিল্লির সুলতান প্রায়শই বাংলার সুলতান বা কোনো একজন শাসককে দমন বা অধীনস্ত করার জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। বাংলার রাজক্ষমতা দখলে নিয়ে সুলতান যাকে অনুগত মনে করে দায়িত্ব দিতেন, দেখা যেতো অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এজন্যই বাংলা অঞ্চলকে অনেক ইতিহাসবিদ সেই সময়ে 'বলগাখপুর' বা 'বিদ্রোহের নগরী' বলেও বিভিন্ন লেখনিতে উল্লেখ করেছেন।

দিল্লির মুসলমান শাসকদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাংলা অঞ্চলের মুসলমান শাসকগণ প্রায় ২০০ বছরের 'স্বাধীন সুলতানদের আমল' প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন বলে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন। কিন্তু বাংলা অঞ্চলের সম্পূর্ণ ভৌগোলিক অংশে এই ক্ষমতা কখনই প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কেননা বাংলার রাজনৈতিক সীমানার প্রতিনিয়ত বদল ঘটেছে।

বাংলা অঞ্চল নিয়ন্ত্রন নিয়ে তুর্কী, আফগান, পারসিয়ান, তাজিক, মোগল অভিজাতরা শাসন শুরু করেন। উত্তর ভারতের অংশ হিসেবে পূর্ব ভারতে অবস্থিত বাংলা শাসিত হতে থাকে। তবে শাসনক্ষমতা মুসলমান রাজা বা সুলতানের হাতে থাকলেও বাংলার অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের প্রধান অংশ ছিল নানান ধারার হিন্দু, বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব এবং লোকধর্মের অনুসারী মানুষের মিশ্রণ।

একাদশ শতকের পর থেকে বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে পীর সূফি দরবেশরা বসতি স্থাপন করে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় তারা খানকাহ স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। ধীরে ধীরে তাদের প্রচারণায় বাংলা অঞ্চলের মানুষজন আকৃষ্ট হতে থাকেন। সাধারণ মানুষের অনেকেই ইসলামে

ধর্মান্তরিত হতে শুরু করেন। প্রথমদিকে এই প্রক্রিয়া ছিল ধীর গতিসম্পন্ন। আস্তে আস্তে দিল্লির মুগল শাসকদের সময়ে বাংলা অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেন। বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ১৮৭২ সালে ভারতে পরিচালিত প্রথম আদমশুমারীতে দেখা যায়, ভারতবর্ষের পূর্বাংশে অবস্থিত বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা বেশি। আবার বাংলা অঞ্চলের পশ্চিম অংশের তুলনায় পূর্ব অংশে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ মুসলমান।

১৬ শতকের শেষ দিক থেকে বাংলা অঞ্চলের অংশবিশেষ মুগল শাসকদের নিয়ন্ত্রণে যেতে শুরু করে। মুগলদের বিরুদ্ধে বাংলার ছোট ছোট ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ কখনো ঐক্যবদ্ধ আবার কখনো এককভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এইসব প্রতিরোধ 'বারো ভূঁইয়া'দের প্রতিরোধ নামে ইতিহাসে খ্যাত। ঈসা খান এবং মুসা খান ছিলেন বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। মুগলদের সাথে বারো ভূঁইয়াদের যে লড়াই সেখানেও কিন্তু বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের তেমন কোন সম্পৃক্ততা ছিল না।

ব্রিটিশ শাসনে বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ

বাংলা অঞ্চলে ইংরেজদের আগমন এবং শোষণের ইতিহাস অতীতের শোষণের ইতিহাস থেকে খুব একটা পৃথক নয়। মূলত অর্থ এবং ক্ষমতার জন্যই তারা বাংলা অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তবে এ সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, শাসক শ্রেণির মানুষদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ এবং প্রতিরোধ আন্দোলন।

ব্রিটেন থেকে আগত কতিপয় ব্যবসায়ী ইংরেজ অতিরিক্ত কর ও মুনাফা আদায়ের জন্য এমন কিছু নীতি গ্রহণ করেছিলেন যার ফলে বাংলা অঞ্চলের কৃষক শ্রমিক থেকে শুরু করে সকল পেশাজীবী মানুষের জীবনে নানান সংকট দেখা দেয়। শাসক হিসেবে আবির্ভূত হবার পর ইংরেজরা গরীব কৃষকদের ভূমিতে জোর করে নীল সহ অন্যান্য কৃষি দ্রব্যাদি চাষে বাধ্য করতেন এবং একই সাথে তাদের উপর প্রয়োগ করতেন নানান পীড়নমূলক নীতি। এর ফলে দেখা দেয় নানান বিদ্রোহ। নীল বিদ্রোহের পাশাপাশি তিতুমীরের আন্দোলন, টংক, নানকার, ফরায়েজি, স্বদেশী, সাঁওতাল বিদ্রোহ, অসহযোগ আন্দোলন সহ নানান আন্দোলন ক্রমেই দানা বেঁধে উঠে। আর এইসব আন্দোলনে সাধারণ মানুষ ও কৃষককূল ব্যাপকভাবে অংশ নিতে শুরু করে।

২০ শতকের শুরুতেই সংঘটিত হয়েছিল স্বদেশি আন্দোলন। দেশি পণ্য ব্যবহারের পক্ষে বাঙলা অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই ঘটনা সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনাকে যে শানিত করেছিল তা বলাই বাহুল্য। স্বদেশী আন্দোলন চলাকালীন সময়েই ১৯০৫ সালে প্রথমবার বাঙলা ভাগ করা হয় (ইতিহাসে এই ঘটনা 'বঙ্গভঙ্গ' নামে পরিচিত)। পরবর্তীতে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় এবং ১৯৪৭ সালে বাঙলা-কে দ্বিতীয়বারের মতো বিভক্ত করা হয়।

বাংলা অঞ্চলের মেয়েরাও বিপ্লব এবং প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। ইংরেজ শাসকদের বিতাড়িত করার আন্দোলনে যোগ দিয়ে শহীদ হন বিপ্লবী নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শহিদ বিপ্লবী নারী
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯২১-১৯৩২

পাকিস্তান আমলে কৃষক আন্দোলনের সংগ্রামী নেত্রী
ইলা মিত্র (১৯২৫-২০০২)

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান আমলেও বিপ্লবী ইলামিত্র সহ অনেকেই নানান নির্যাতনের শিকার হন। বাংলা অঞ্চলের মতো গোটা ভারতবর্ষেই এই ধরণের আন্দোলন চলতে থাকে। সাধারণ মানুষের শতাধিককালের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মুখে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানি শোষক গোষ্ঠীর কবলে ২৫ বছর থাকার পর ১৯৭১ সালে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করে।

১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছরের ইংরেজ শাসনামলে ভারত তথা বাংলা অঞ্চলের মানুষজন পাশ্চাত্য শিক্ষা, দর্শন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংগে পরিচিত হয়। এর বহুবিচিত্র প্রভাব পড়েছিল এতদঞ্চলের ইতিহাসে। বাংলা অঞ্চল সহ ভারতীয় উপমহাদেশে সংস্কারমুক্ত একদল মানুষের উত্থান ঘটে যারা হাজার বছর ধরে চলমান ধর্ম-সামাজিক গোঁড়ামিকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির পথ তৈরিতে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। এই তালিকায় রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নওয়াব আবদুল লতিফ, হাজি মোহাম্মদ মহসিন, বেগম রোকেয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রথা বিলুপ্ত করে নারীদের শিক্ষার আলোতে নিয়ে আসার জন্যে তারা আমৃত্যু সংস্কার আন্দোলন এবং লেখালেখি করেছেন।

বাংলা ভাগ এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতার পথে বাংলাদেশ

ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বাঙলা অঞ্চলের কোলকাতা নগর-কে কেন্দ্র করে ১৮ ও ১৯ শতকে রাজনৈতিক নানান ঘটনা ঘটতে থাকে। বাংলার মানুষেরা ক্রমেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হতে থাকেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবেসে তাদের সামগ্রিক মুক্তির জন্যে তখনো কোনো একক গ্রহণযোগ্য নেতাকে বাংলা ভূ-খণ্ডে দেখা যায়নি।

২০ শতকের প্রথমভাগে তেমনই একজন মানবতাবাদী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)। সাধারণ মানুষের নেতা হিসেবে তিনি মানুষের মুক্তির জন্যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সফলভাবে নেতৃত্ব দেন।

ক্ষমতায় তখন অধিষ্ঠিত ব্রিটিশ শক্তি এবং ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ সহ অন্যান্য কয়েকটি দল। এরই মধ্যে যুক্ত বাংলা বা অবিভক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও চলছিল।

১৯৪৭ সালে বাংলার দুই অংশকে দুই দেশের সাথে জুড়ে দেয়া হয় ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অদ্ভুত যুক্তিতে। বাংলা অঞ্চল-কে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত করে এর পূর্ব অংশকে পাকিস্তানের সাথে এবং পশ্চিম অংশকে ভারতের সাথে জুড়ে দেবার রাজনীতি সামনে আসে।

বঙ্গবন্ধু মনে-প্রাণে ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব এবং সকল মানুষের নিজ নিজ ধর্ম-সংস্কৃতি পালনের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তিনি কখনো মানুষের মধ্যে ধর্মের নামে বিভেদ চাইতেন না। এর প্রমাণ আমরা পাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ গ্রন্থে। সকল মানুষের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসাই ছিল বঙ্গবন্ধুর কাছে প্রথম ও শেষ কথা।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, একে ফজলুল হক এবং মাওলানা ভাসানীর মতো রাজনীতিবিদদেরকে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য আন্দোলন করে গেছেন। বাংলার পূর্ব অংশের সাধারণ মানুষের উপর পাকিস্তানের মুসলমান শাসকদের শোষণ, অত্যাচার ও আধিপত্য তিনি কখনই মেনে নেননি।

অনুশীলনী

চলো পোস্টার বানিয়ে প্রদর্শনী করি

চলো আমরা একটা অনুসন্ধানী কাজ করি। বঙ্গবন্ধু তাঁর গোটা জীবনে গরীব-দুখী মানুষের মুক্তি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলে-মিশে বসবাস করা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা রক্ষা আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে যা যা কাজ করেছেন সেগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধান কাজগুলো বড় বড় করে লিখে সুন্দর সুন্দর পোস্টার বানিয়ে ফেলি। এই কাজে তথ্য সংগ্রহের জন্যে ইন্টারনেট-এর mujib100.gov.bd ওয়েবসাইট ব্যবহার করা যাবে। এরপর চলো, সবগুলো পোস্টার পাশাপাশি সাজিয়ে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করে ফেলি।।

ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানি শাসকদের সময়ে বঙ্গবন্ধু মানুষের মুক্তির আন্দোলন করেছেন। শোষণ এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে বারবার জেল খেটেছেন, সাধারণ মানুষকে পাকিস্তানি শাসকদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জীবন বাজি রেখে কাজ করেছেন। বাংলা অঞ্চলের মাটি-কাদা-পানির বাস্তবতা এবং জন-মানুষের মধ্য থেকে উঠে আসা একজন মানবতাবাদী নেতা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

হাজার বছর ধরে বাংলা অঞ্চলের মানুষের উপর শাসন ও শোষণের নামে যে অত্যাচার, নির্যাতন সংগঠিত হয়েছে। সে সকল শোষণ মুক্তির আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু সফল ও কার্যকরভাবে অনেকগুলো রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করেন। যেমন ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৮ সালের আয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যূত্থান এবং ১৯৭১ সালের শুরুতে অসহযোগ আন্দোলন। এসকল আন্দোলন চূড়ান্ত রুপ লাভ করে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মধ্যে দিয়ে যার বাস্তব রূপ হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় গণমানুষের কাতারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালির মধ্যে যারা ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল পরিচয়ের বিভেদ পেছনে ফেলে কেবল মানুষ পরিচয়কে সামনে নিয়ে বঙ্গবন্ধু যেভাবে এগিয়ে গিয়েছিলেন ইতিহাসে তা দৃষ্টান্তমূলক। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম ও ত্যাগের পথ পেরিয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু জনগণের ম্যান্ডেট পান। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।‘

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙ্গালি জনগণের উপর পৃথিবীর ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা চালায়। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালে মাত্র ৯ মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর, রাজাকার, আল বদর, আল শামস বাহিনীর হাতে ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের আত্বত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

বাংলা ভূ-খণ্ডের মানুষ বরাবরই শান্তিপ্রিয়, অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মসহিষ্ণু। সকলে মিলে-মিশে এবং বিপদে-আপদে পাশে থেকে বাস করার প্রবণতাই বাংলার ইতিহাসের চালিকাশক্তি। ভৌগোলিক বৈচিত্র্য বাঙলার

মানুষের আচার-আচরণে, খাদ্যাভাসে, চিন্তা-চেতনায়, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে স্বকীয়তা তৈরি করেছে। পানির প্রচুরতা ও বৃষ্টি সেচ ও কৃষিকে একদিকে যেমন করেছে সহজ, তেমনি আবার করেছে কঠিন। অঞ্চলটি খাদ্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ থাকায় দূর-দূরান্তের ভূ-খণ্ড থেকে আগত মানুষের অনেকেই এখানে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তুলেছেন। এখানকার আদি অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে সকলের কাছে স্বীকৃত। ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, জাত, গোত্রের অনেক উর্ধ্বে উঠে তিনি এই ভূমির সকল মানুষের জন্য, মানবতার ধর্মে আস্থা রেখে, শ্রমিক ও মেহনতী মানুষকে সাথে নিয়ে সকলের মুক্তির আন্দোলন করেছেন। এইজন্যেই 'বঙ্গবন্ধু'কে মানবতাবাদী এবং অসাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে 'বিশ্ববন্ধু' অভিধায়ও সম্মানিত করা হয়েছে। বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক 'জুলিও কুরি' পদকপ্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৩ সালের ২৩ মে পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল এই অভিধায় ভূষিত করেন।

অনুশীলনী

উপরের পাঠের আলোকে চলো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন লিখি। প্রতিবেদনে নিচের বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করি

- বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনা
- বাংলার কাদামাটি, নদী আর সবুজ অরণ্য থেকে উঠে এসে সাধারণ মানুষের জন্যে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র নির্মাণ
- বঙ্গবন্ধুর ‘বিশ্ববন্ধু’ উপাধি প্রাপ্তি

মুক্তিযুদ্ধের বিদেশি বন্ধুরা

মামুন আজ ক্লাসে এসে ওর বন্ধুদের বলল, সে এবার ঈদের বন্ধে মা বাবার সাথে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বেড়াতে গিয়েছিল। জাদুঘরে তারা মাদার তেরেসাসহ আরও কয়েকজন বিখ্যাত মানুষের ছবি দেখেছে, যারা বিদেশি হয়েও মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ সাংবাদিক, কেউ রাজনীতিবিদ, কেউ বা সমাজকর্মী ছিলেন।

মিলি বলল, তাই নাকি! তোমার কথা শুনে আমারও তাদের দেখতে ইচ্ছে করছে।

এমন সময় খুশি আপা ক্লাসে প্রবেশ করে তাদের কাছে জানতে চাইলেন তারা কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছে।

মিলি বলল, আপা মামুন এবারের ছুটিতে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে ও অনেক বিখ্যাত মানুষের ছবি দেখেছে, যারা বিদেশি হয়েও মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের সাহায্য করেছিলেন। ওর কথা শুনে আমাদেরও বাংলাদেশের সেইসব বন্ধুদের দেখতে ইচ্ছা করছে।

খুশি আপা বললেন, তাই! তাহলে চলো আমরা এ রকম কয়েকজন বিখ্যাত মানুষের ছবি দেখি।

সাইমন ড্রিং (ব্রিটিশ সাংবাদিক)

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী (ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী)

মাদার তেরেসা (নোবেলজয়ী মানবতাবাদী)

লিওনিদ ব্রেজনেভ(তৎকালীন সোভিয়েত নেতা)

শরণার্থী শিবিরে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি

ব্রিটিশ গায়ক জর্জ হ্যাঁরিসন

বিখ্যাত সেতারাবাদক পন্ডিত রবিশংকর

উইলিয়াম এস অর্ডারল্যান্ড
মুক্তিযুদ্ধে অংশনেয়া অস্ট্রেলীয় নাগরিক

খুশি আপা যখন শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইলেন ছবির ব্যক্তিদের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কী, তখন দেখা গেল ওরা আন্দাজ করে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে পারলেও বিস্তারিত তেমন কিছু জানে না।

খুশি আপা বললেন, চলো তাহলে এসব বিখ্যাত মানুষের মধ্যে থেকে একজনের সম্পর্কে আমরা জেনে নিই। তার নাম সাইমন ড্রিং। উনি পেশায় ছিলেন সাংবাদিক ।

সাইমন ড্রিং: বাংলাদেশের বন্ধু

ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিংকে বলা হয় বাংলাদেশের একজন 'প্রকৃত বন্ধু'।

১৯৭১ সালে সাইমন ড্রিং ২৬ বছরের একজন তরুণ সাংবাদিক। ঢাকায় এসেছিলেন পাকিস্তানের গণতন্ত্রে উত্তরণের সংকট কীভাবে সমাধান হচ্ছে তার খবর সংগ্রহ করতে। আরও কয়েকজন বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি ছিলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে।

কিন্তু পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানিরা সব বিদেশি সাংবাদিকদের ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তারা পাহারা দিয়ে তাদের বিমান বন্দরে পৌঁছে দিচ্ছিল। তরুণ সাইমন ড্রিংক আঁচ করতে পেরেছিলেন যে ঢাকায় বড় ধরনের কোনো ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, যা সরকার বিদেশিদের কাছে গোপন করতে চায়। তখনই তিনি ঠিক করলেন যেভাবে হোক খবরটা তাঁকে সংগ্রহ করতে হবে।

পাকিস্তানি সামরিক সদস্যদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সাইমন ড্রিং ৩২ ঘণ্টার বেশি সময় হোটেলে লুকিয়ে ছিলেন। উদ্দেশ্য একটাই, পাকিস্তানের হিংসাত্মক ঘটনার খবর তিনি বিশ্ববাসীকে জানাবেন। ২৭ ঘণ্টা পরে যখন কারফিউ বা সান্ধ্য আইন তুলে নেওয়া হয় তখন তিনি রাস্তায় টহলরত মিলিটারির চোখ এড়িয়ে পথে নামলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং পুরানো ঢাকার কিছু জায়গা থেকে তিনি গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের ছবি তুললেন, খবর সংগ্রহ করলেন।

তাঁর আসল কাজ তো হলো, এবার অবরুদ্ধ দেশ থেকে যত দ্রুত সম্ভব বেরোতে হবে, কারণ খবরটা তো বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে। নানা কৌশলে, এমনকি তথ্য টুকে রাখা কাগজ, ছবির নেগেটিভ মোজার মধ্যে লুকিয়ে রেখে.কোনো মতে বিমানে উঠে অবরুদ্ধ দেশ ছেড়ে সাইমন ব্যাংকক পৌঁছান।

ব্যাংকক থেকেই তিনি তাঁর বিখ্যাত প্রতিবেদন 'পাকিস্তানে ট্যাংকের নিচে বিদ্রোহ দমন' শিরোনাম পাঠিয়ে দেন তাঁর পত্রিকা লন্ডনের দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফে। এটি ২৯ মার্চ প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদনটির শুরুর বাক্য ছিল এ রকম- সৃষ্টিকর্তা এবং ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের নামে ঢাকা আজ বিধ্বস্ত ও ভয়ার্ত এক শহর। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে ঠান্ডা মাথায় বর্বরভাবে কামানের গোলার আঘাতে ঢাকায় এক রাতে অন্তত ৭০০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, বিভিন্ন এলাকার ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার সংগ্রামকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

সে রাতের বিধ্বস্ত, অগ্নিদগ্ধ, স্তুপিকৃত লাশের এক শহর দেখে তাঁর মনে হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম তখনকার মতো শেষ। কিন্তু এই খবর এবং তার সাথের ছবিগুলো বিশ্ববাসীর কাছে এই বাংলায় পাকিস্তানিদের চালানো ভয়ঙ্কর হত্যাকান্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বার্তা দিয়েছিল। এটি মুক্তিযুদ্ধে আমাদের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে সহায়ক হয়েছিল।

সাইমন ড্রিং সারা জীবনে ভিয়েতনাম যুদ্ধসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ২০টি যুদ্ধ ও বিপ্লবের খবর সংগ্রহ করে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন, টিভিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন। ২০২১ সালে ৭৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

সাইমনের কাহিনি শেষ করে খুশি আপা বললেন, এ তো একজন সাইমন ড্রিংকের কথা হলো। নয় মাসজুড়ে আরও অনেক সাংবাদিক যুদ্ধের সময়কার খবর পাঠিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং টিভি ও রেডিয়োতে। এমন সময় ক্লাসের একটু চুপচাপ মেয়ে নীলা বলল, কিন্তু কেবল কি বিদেশি সাংবাদিকরাই আমাদের পক্ষে কাজ করেছিল?

খুশি আপা একটু রহস্য করে হেসে বললেন, তোমাদের কী মনে হয়?

ওরা একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে আপার দিকেই তাকিয়ে থাকল।

খুশি আপা হেসে বললেন, দেশি সাংবাদিকরাও দুঃসাহসী কাজ করেছেন।

রবিন জিজ্ঞেস করল, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কি সারা বিশ্বেই আলোড়ন ফেলেছিল?

খুশি আপা মাথা নেড়ে বললেন, আমরা একা ছিলাম না। তাছাড়া বিশ্বের একটা অঞ্চলে যুদ্ধ বাধলে পাশের দেশ তো চুপ থাকতে পারে না। এমনকি মানবিক সংকট হলেও তারা নিশ্চুপ থাকতে পারে না।

ওদের এ আলোচনায় জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন (ইউএনএইচসিআর -UNHCR), সেভ দ্য চিলড্রেনসহ আরও কিছু কিছু বিদেশি ও দেশি সংস্থার নাম উঠে আসে। তবে আপা ওদের জানাতে ভুললেন না যে এ রকমই এক কঠিন দুঃসময়ে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে 'মাদার অব হিউম্যানিট' বা মানবতার জননী উপাধি পেয়েছেন।

যুদ্ধের আরও ফ্রন্ট

খুশি আপা বললেন, তাহলে দেখো যুদ্ধ শুধু সৈনিকরাই করেন না, কেবল অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ হয় না। কেবল রণাঙ্গনেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকে না।

মিলি বলল, আপা সাইমন ড্রিং যেমন তার সংগ্রহ করা খবর লন্ডনের দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন তেমনি মুক্তিযুদ্ধের সময় তো আরও অনেক গণমাধ্যমও ছিল। তারাও তো নিশ্চয় আমাদের খবর প্রকাশ করেছে।

কনক বলল, আমি মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা একটি বই পড়েছিলাম। ওখানে বিবিসি ও আকাশবাণীর নাম পেয়েছিলাম।

এবারে খুশি আপা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইলেন যুদ্ধের অন্যান্য ফ্রন্টের নাম।

মিলি বলল, 'বিবিসি, আকাশবাণী।

ফ্রান্সিস শুধরে নিয়ে বলল, সংবাদপত্র ও বেতার-টিভি মিলিয়ে বলা যায় গণমাধ্যম।

এভাবে খুশি আপার সাহায্য নিয়ে ওরা সম্ভাব্য ফ্রন্টের একটা তালিকা তৈরি করবে।

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ কনক। দেখো, যুদ্ধ দুই দেশের মধ্যে বাধলেও উভয় পক্ষেই আরও বন্ধুরাষ্ট্রের সমর্থন সাহায্য প্রয়োজন হয়। যুদ্ধ বা সমস্যা যদি বড় আকারের হয় তখন তার রেশ অঞ্চল ছাপিয়ে বিশ্বেও প্রভাব ফেলে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তেমন একটি ঘটনা ছিল। আমাদের নেতৃবৃন্দও চেয়েছেন দেশের স্বাধীনতার পক্ষে বন্ধুরাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়াতে।

এ সময় আনুচিং বলল, আমি শুনেছি জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়ন খুব বড় ভূমিকা পালন করেছিল। নন্দিনী

বাবার কাছে শোনা একটি কথা বলে খুশি আপাকে তাক লাগিয়ে দিল। সে বলল, এ হলো কূটনৈতিক যুদ্ধ।

আপা বললেন, একদম ঠিক বলেছ তুমি, বহু দেশ এবং বহু মানুষের সহযোগিতায় আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে নয় মাসে স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি।

এখানে কূটনীতি এবং রাজনীতি উভয়েরই ভূমিকা আছে।

তখন হারুন একটা জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করল। ও বলল, আমি শুনেছি চীন, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু কেন?

ফ্রান্সিস ও সালমা বলল, তাহলে মুক্তিযুদ্ধ কেবল আমাদের দেশের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, পৃথিবীর অনেক দেশ, অনেক মানুষ, অনেক প্রতিষ্ঠান এতে যুক্ত হয়েছিল।

এবারে আদনান বলল, এতসব আমরা জানব কীভাবে? রনি বলল, আমরা মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক খবর, বৈশ্বিক খবর, বিভিন্ন ফ্রন্টের খবর সবই জানতে চাই। চলো এ বিষয়ে একটা প্রকল্পমূলক কাজ করা যাক।

খুশি আপা বরাবরই হাসিখুশি মানুষ তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন। উনি এবার বললেন, তোমরা হলে এক একজন খুদে গবেষক। রীতিমত গবেষকের মতো কাজ করবে তোমরা। যখন সক্রিয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা কোনো সমস্যা সমাধান করি কিংবা কোনো জটিল প্রশ্ন/বিষয়ের উত্তর খুঁজি তখন প্রকল্পভিত্তিক কাজ করাই ভালো। সাধারণত এ ধরনের কাজগুলো তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময় ধরে করতে হয়। এভাবে অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে যেমন তথ্য জানা যায় তেমনি সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন/প্রশ্নসমূহের জবাব পাওয়া যায়। আর এভাবে এমন একটা প্রতিবেদন তৈরি হয়ে ওঠে যাতে সব দিকসহ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সবার স্পষ্ট ধারণা হয়।

প্রকল্পভিত্তিক কাজের ধাপগুলো সম্পর্কে আমরা জেনে নিই।

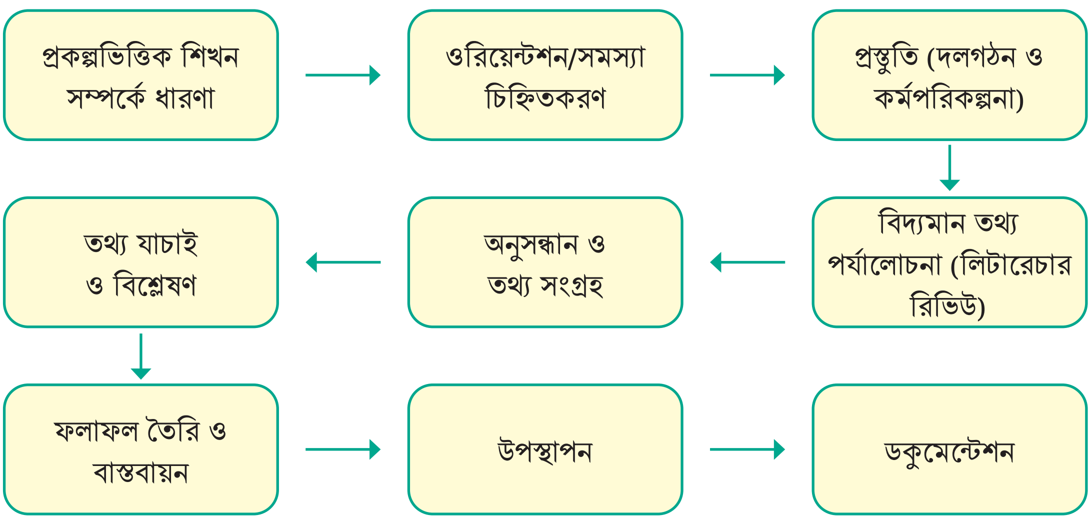

চলো, আমরাও ওদের মতো করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে যারা বিদেশি হয়েও মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন তাদের কথা জেনে নিই।

এবারে খুশি আপা প্রকল্পে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তা তাদের আলোচনা করে বের করতে বললেন। আলোচনার মাধ্যমে তারা প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ের তালিকা তৈরি করল।

আনাই ও তার দলের তালিকা

১. মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সংবাদিকদের ভূমিকা, (গণমাধ্যম)।
২. মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের ভূমিকা, (গণমাধ্যম)।
৩. শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলায় মূল ভার বহনকারী দেশ ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের ভূমিকা, (মানবিক সহায়তা)।।
৪. মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন এবং বিজয় অর্জন পর্যন্ত তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব ও এতে দেশটির অবদান, (রাজনীতি)।
৫. জাতিসংঘ ও অন্যান্য বিশ্ব সংস্থার ভূমিকা, (কূটনীতি)।
৬. সোভিয়ত ইউনিয়ন ও অন্যান্য মিত্র দেশের, ভূমিকা (কূটনীতি)।
৭. শিল্পী-সাহিত্যিকদের উদ্যোগ, (সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র)।

শ্রেণির সবাইকে নিয়ে যখন দল ভাগ করা হচ্ছে তখন দীপঙ্কর ও আয়েশা জানতে চাইল, কোন দল কোন বিষয়ে কাজ করবে সেটা কীভাবে ঠিক করা হবে?

খুশি আপা হেসে বললেন, আবার কীভাবে, সবাই মিলে আলোচনা করেই ঠিক করব। কারও কারও যদি মনে হয় বিষয়টা কঠিন, তাহলে আমরা সবাই তাদের সাহায্য করব। এর মধ্যে শিহান একটা জটিলতার কথা তুলে ধরল। বলল, বায়ান্ন বছর আগেকার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কি সহজে পাওয়া যাবে?

সবাই যখন মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে ঠিক তখনই মিলি বলল, প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই বয়স্ক আত্মীয় বা বয়স্ক প্রতিবেশীর সন্ধান নিশ্চয় পাওয়া যাবে। যারা অন্তত কৈশোরে এ যুদ্ধ সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন বা জেনেছেন।

তারপর সবাই মিলে তথ্যের উৎস নির্ণয়ের চেষ্টা শুরু করল। তাতে বিভিন্নজন সম্ভাব্য বিভিন্ন উৎসের কথা বলেছে। যেমন-

- বয়স্ক আত্মীয় বা প্রতিবেশী বা পরিচিত ব্যক্তি
- পাঠ্যবই
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই স্থানীয় লাইব্রেরি

- তখনকার পত্রপত্রিকা
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বিভিন্ন প্রকাশনা
- নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট

এবারে কাজ কীভাবে করা যাবে তার পরিকল্পনা করতে শুরু করল শ্রেণির সবাই মিলে। তারা প্রথমে দল ভাগ করবে, তারপর তৈরি করবে দলভিত্তিক কাজের নিয়মাবলি।

দলভিত্তিক কাজের নিয়মাবলি

১. দলের সক্ষমতার ধরন নির্বিশেষে সবার জন্য অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি,
২. দলের প্রত্যেকের মতামতকে মূল্য দিয়ে নিজের মতামত যৌক্তিকভাবে দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন,
৩. নিজের মতামত নির্দ্বিধায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ,
৪. অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তা বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ বা নিজের ভিন্নমত প্রদান,
৫. সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি গ্রহণ,
৬. দীর্ঘ কাজে কোনো লাইব্রেরি বারবার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেভাবে অনুমতি গ্রহণ,
৭. কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই, ছবি বা অন্য কোনো নথি ব্যবহার করতে হলে তাঁর অনুমতি গ্রহণ,
৮. ব্যবহৃত সব উপকরণের যথাযথ যত্ন নেওয়া ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যথা সময় ফেরত দেওয়া,
৯. দলের সব সদস্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা,
১০. কাজটি তথ্যে ও বিন্যাসে যেন সমৃদ্ধ হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান,

বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা (লিটারেচার রিভিউ)

আজ খুশি আপা জানতে চাইলেন যে এই অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যেসব ঘটনা ইতোমধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে সেসব কোথায় পাওয়া যাবে? এর উত্তরে সবাই মিলে যা বলল, তার একটা তালিকা করলে দাঁড়ায় বই, পত্রিকা, ডকুমেন্টারি, দলিলপত্র ইত্যাদি। সবাই মিলে আলোচনা করে তখন ঠিক করল যে সবগুলো দল প্রয়োজনীয় তথ্যের সম্ভাব্য উৎসের তালিকা তৈরি করবে এবং তালিকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তথ্য উৎসের তালিকা, অনুসন্ধান প্রক্রিয়াসহ প্রাপ্ত তথ্যাবলি নিয়ে খুশি আপার সাথে আলোচনা করবে।

খুশি আপা বললেন, যে সময়ে কোনো ঘটনা ঘটে সেই সময় বা তার কাছাকাছি সময় বিভিন্ন মানুষ তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভিঙ্গি অনুসারে ঘটনাটির পর্যালোচনা করে থাকে। আমরা সেই পর্যালোচনা থেকে তথ্য নিয়ে সেই সময়ের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা পেয়ে থাকি। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এভাবে আমরা তথ্য পর্যালোচনা করে থাকি।

খুশি আপা সেই সাথে বললেন, কীভাবে আমরা নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারি সে সম্পর্কে সপ্তম শ্রেণির ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আছে। প্রয়োজনে আমরা সেটি আবারো একটু পড়ে নিতে পারি।

বই পড়া ক্লাব গঠন

মিলি বলল, আপা তথ্য সংগ্রহের জন্য লাইব্রেরি থেকে বিভিন্ন বইয়ের সাহায্য নিতে পারি।

তথ্যের সন্ধানে

কাজটা শুরু করতে হবে তথ্য সংগ্রহ করে। তথ্যের সম্ভাব্য উৎসগুলোও জানা হয়েছে। কেউ কেউ হয়তো আরও নতুন কোনো উৎসও পেয়েছে। কিন্তু কাজটা শুরু করবে কীভাবে?

নন্দিনী ও গণেশ একই দলে। এক ছুটির সকালে গণেশ নন্দিনীদের বাসায় এসে হাজির। বলল, সত্যি কাজ কীভাবে শুরু করব সেটা নিয়ে ভেবে কিন্তু কূল পাচ্ছি না। নন্দিনীও বলল, হ্যাঁ, একদম শূন্য থেকে শুরু করা বেশ মুশকিল। নন্দিনীর বাবা তখন ওখানে বসে পত্রিকা পড়ছিলেন। উনি স্থানীয় কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। বললেন, তোমাদের কথা আমি শুনেছি। আসলে যে বিষয়ে তোমরা কাজ করবে প্রথমে সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো বই পড়বে, নির্ভরযোগ্য লেখকের নির্ভরযোগ্য বই। অথবা কোনো নির্ভরযোগ্য মানুষের কাছ থেকে ইতিহাসটা শুনবে।

গণেশ বলল, চাচা, আপনি মনে হচ্ছে নির্ভরযোগ্য শব্দটার ওপর জোর দিচ্ছেন খুব। কেন?

নন্দিনীর বাবা বললেন, হ্যাঁ, মুশকিল হয়েছে অনেকেই বই লেখেন, প্রবন্ধ লেখেন, কিন্তু তথ্যগুলো ভালোভাবে যাচাই করে নেন না। কিছু কিছু ভুল থেকে যায়। তাই তোমাদের নির্ভরযোগ্য বই বা ব্যক্তির কথাই বলছি।

তখন নন্দিনী বলল, তো আব্বু, তুমি তো ইতিহাস পড়াও, আবার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখিও করো। বাসায় তোমার সংগ্রহে তো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনেক বই আছে। তুমিই একদিন আমাদের বলো না কেন মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সাংবাদিক, দেশ-বিদেশের আরও মানুষের ভূমিকা আর অবদানের কথা।

এ সময় গণেশ বলল, চাচা, আপনি দুদিন বললে ভালো হবে। একদিন বলবেন মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট নিয়ে। আরেক দিন বলবেন এতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ব্যক্তি ও পক্ষের ভূমিকা, অবস্থান ও অবদান নিয়ে।

শুনে নন্দিনীর বাবা বললেন, ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তোমাদের আগ্রহ দেখে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। আমি তোমাদের স্কুলে যাব।

অমনি গণেশ যোগ করল, তাহলে চাচা আমরা একদিন ক্লাসে আসার জন্যে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাব।

নন্দিনীর বাবা অধ্যাপক আজিজুল হক একটু ভেবে বললেন, ঠিক আছে। শুনে ওরা দুই জন হৈ হৈ করে আনন্দ প্রকাশ করল।

অধ্যাপক আজিজুল হক সেদিন গণেশ-নন্দিনীদের যেসব কথা বলেছিলেন তা এবার তোমরা সবাই জেনে নিতে পার।

মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

তোমরা তো জানো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল ১৯৭১ সালে। বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমরা তখন স্বাধীনতার জন্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। সেই ইতিহাস তোমরা অনেকটাই জানো। এ রকম একটা যুদ্ধ আমাদের একার পক্ষে জেতা খুব কঠিন হতো। পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল থেকেছে কারণ আমরা বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে সহায়তা ও সমর্থন পেয়েছিলাম। এটা ঠিক যে কিছু দেশ আমাদের বিরুদ্ধেও ছিল।

স্বাভাবিক মিত্র ভারত: শরণার্থীর ঢল

১৯৭১-এর পঁচিশে মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তানি বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে এদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা শুরু করেছিল তা থেকে প্রাণ বাঁচাতে প্রথমে হাজার হাজার ও পরে লাখ লাখ মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করে। বিদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী এই মানুষদেরই বলা হয় শরণার্থী। তারা মূলত আমাদের সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। তবে পূর্ব দিকের ত্রিপুরা রাজ্যও হয়ে উঠেছিল একটি বড় আশ্রয়কেন্দ্র। উত্তর-পূর্বের মেঘালয় ও আসাম রাজ্যেও কিছু মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। অল্প কিছু মানুষ মিয়ানমারেও আশ্রয় নেন। মুক্তিসংগ্রামের সময় ভারতের রাজধানী দিল্লি রাজনৈতিক কারণে, কলকাতা বাংলাদেশ সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র হিসেবে এবং আগরতলা শরণার্থীদের বড় অংশের ট্রানজিট ও যুদ্ধের প্রস্তুতি ক্যাম্প হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তখন বাস্তবতাই প্রতিবেশী ভারতকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত করে নিয়েছিল। এই যোগ ছিল বহুমাত্রিক।

যুদ্ধের পুরো নয়মাস জুড়েই ভারতের দিকে শরণার্থীর ঢল বহমান ছিল। ভারত সেদিন শরণার্থীদের জন্যে সীমান্তের সব পথ খুলে দিয়েছিল, শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিল, তাদের খাবার ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করেছিল। নয় মাসে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক কোটি। মনে রেখো, তখন দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি।

রাজনৈতিক সংযোগ:

তোমরা তো জানো ২৫ মার্চ মধ্যরাতে নিজ বাড়িতে গ্রেপ্তার বরণ করার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রাম যেন এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেন। তাজউদ্দীন আহমদ প্রথমে কয়েক দিন আত্মগোপনে থেকে দলের কয়েকজন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। পাকিস্তানি আক্রমণের পর ৩১ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে সে দেশের পার্লামেন্ট লোকসভায় বাংলাদেশের অনুকূলে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়- 'আমাদের সীমান্তের এত কাছে যে ভয়াল মৃতুর ঘটনা ঘটছে তার প্রতি এই সংসদ উদাসীন থাকতে পারে না।

এই সংসদ প্রত্যয়ের সাথে তাদের জানাতে চায় যে তাদের (বাংলাদেশের জনগণকে) সংগ্রাম ও ত্যাগ ভারতের জনগণের সর্বাত্মক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করবে। ' আর জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী সমর সেন জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব উথান্টকে এক চিঠিতে জানান, 'বাংলাদেশের জনগণের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের শোষণ ও অবমাননাকর আচরণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে একে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় ভেবে আর চুপ থাকা যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বিবেচনায় এখানে হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। ' এই অবস্থায় যখন তাজউদ্দীন আহমদ ও তাঁর সঙ্গীরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন তখন তাঁর কাছ থেকে সহায়তার আশ্বাস পেতে দেরি হয়নি।

তাজউদ্দীন আহমদ যেসব বিষয়ে সহযোগিতা চেয়েছিলেন সেগুলো হলো মুক্তিসংগ্রামে সর্বাত্মক সহযোগিতা, প্রবাসী সরকার গঠনে সহায়তা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত অস্ত্র সহায়তা এবং শরণার্থীদের জন্যে সব রকম মানবিক সাহায্য। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস নিয়ে দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে তাজউদ্দীন আহমদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম সরকার গঠনের উদ্যোগ নেন। ভারত সে কাজেও সহযোগিতা দেয়। তোমরা জানো যে সরকার গঠিত হয়েছিল বর্তমান মুজিবনগর, তৎকালীন কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায়, ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে। তবে সরকারের দপ্তর ছিল কলকাতায়।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রও চট্টগ্রাম, আগরতলা হয়ে কলকাতায় স্থাপিত হয়। এই সময় ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস ছিল লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। তাই ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে সরকারও ছিল তাদের। তবে লোকসভায় সক্রিয় ছিল আরও কয়েকটি দল ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিআই), ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্ক্সিস্ট), ভারতীয় জনতা দল ইত্যাদি। ইন্দিরা গান্ধী সবার মতামত নিয়ে বাংলাদেশ ইস্যুতে একটি শক্তিশালী সর্বসম্মত রাজনৈতিক অবস্থান নেন। এতে বাংলাদেশের জন্যেও কাজ করতে বিশেষ সুবিধা হয়।

সামরিক সহযোগিতা

ভারত আশ্রয়প্রার্থীদের জন্যে শরণার্থী শিবির খোলার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা এবং তাদের প্রশিক্ষণ ও গোলাবারুদসহ প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিল। এভাবে ভারতের সামরিক বাহিনীও বাংলাদেশের সংগ্রামে যুক্ত হয়ে যায়। তারা গেরিলা যোদ্ধা, নিয়মিত বাহিনীর নতুন সদস্য, নৌ কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদেরও ব্যবস্থা করেছে। আমাদের নিয়মিত বাহিনীকে সম্মুখযুদ্ধের সময় দূরপাল্লার কামানের সাহায্যে আক্রমণে সাহায্য করেছে। আর শেষে যৌথভাবে মিত্রবাহিনী গঠন করে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রায় চার হাজার ভারতীয় সৈন্য শহিদ হয়েছেন। এভাবে ভারত প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

সর্বাত্মক সহযোগিতা

আমাদের দেশে বর্তমানে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চাপের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে প্রায় এক কোটি শরণার্থী কেবল অর্থনৈতিক চাপ নয় স্থানীয় সমাজেও অনেক রকমের চাপ তৈরি করেছিল। যদিও শরণার্থীদের জন্যে জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ও উন্নত দেশ সহায়তা দিচ্ছিল তবু এর মূল চাপ নিতে হয় ভারতের সরকার ও জনগণকে।

আদতে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা ছিল সর্বাত্মক। তাদের বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠন শরণার্থী শিবির নির্মাণ, ত্রাণ বিতরণ, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সব সহযোগিতা দিয়েছে। তাদের জনগণ শরণার্থীদের জন্যে বাড়তি করও দিয়েছেন। আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে কলকাতার শিল্পী-সাহিত্যিকরা গঠন করেছিলেন 'মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'। এর সভাপতি ছিলেন কথাসাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সর্বভারতীয় অঙ্গনেও বহু মানুষ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে মানবতাবাদী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন থেকে ২১ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের

অংশগ্রহণে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করেছিলেন। এই সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের মিত্রদের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন নারী সংগঠন, খেলোয়াড়দের সংগঠন ইত্যাদি সমাজের সব অংশই সেদিন আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে কাজে যুক্ত হয়েছিল। এ ধরনের নানা উদ্যোগ সারা বছরই চলেছে।

আঞ্চলিক রাজনীতির তখনকার হালচাল

আমরা তো জানি যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা এই উপমহাদেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় দেশ ভাগ করে দুটি আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান ও ভারতকে স্বাধীনতা দিয়েছিল। সেটা ছিল ১৯৪৭ সালের ঘটনা পাকিস্তান সে বছর ১৪ আগস্ট ও ভারত ১৫ আগস্ট স্বাধীন হয়েছিল। পাকিস্তান ছিল মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের যে দাবি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ তুলে ধরেছিল তারই বাস্তব রূপায়ণ। ফলে এর শাসকরা চেয়েছিল পাকিস্তানকে একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে গড়ে তুলতে।

অপরদিকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারত সরকার চেয়েছে দেশকে সব ধর্মের ও মতামতের মানুষের আবাসভূমি হিসেবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে। বলা যায়, স্বাধীনতার পর থেকেই দুটি দেশের আদর্শ ছিল ভিন্ন। তাছাড়া পাকিস্তান দীর্ঘকাল উপমহাদেশের অঙ্গ হিসেবে থাকার পরে অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করতে গিয়ে হিন্দু ও ভারত বিরোধিতার রাজনীতি শুরু করেছিল। তোমরা শুনলে অবাক হবে, আমাদের ভাষা আন্দোলনকেও তারা হিন্দু ও ভারতীয় চরদের কারসাজি ও ষড়যন্ত্র বলে প্রচার চালিয়েছিল।

এর বাইরে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিবেশী হিসেবে এ অঞ্চলের রাজনীতিতে চীনেরও প্রভাব ছিল। একসময় চীন-ভারত খুব বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু পরে দু'দেশের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে মতবিরোধ হয়। যা ১৯৬২ সালে যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। এরপর থেকে এই দুই বড় দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তারা একপর্যায়ে ভারতের বদলে পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়।

এদিকে ভারত বিশ্বরাজনীতিতে স্বাধীন অবস্থান বজায় রাখতে চাইলেও পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে গভীর সম্পর্কে জড়ায়। পাকিস্তান শক্তিধর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একাধিক সামরিক চুক্তি এবং বিভিন্ন সহযোগিতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল।

বিশ্বরাজনীতির তখনকার হালচাল

সেই সময় বিশ্বের দুটি প্রধান শক্তিধর দেশ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে। ১৯৯০ পর্যন্ত এই দেশ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন বা দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পরবর্তীকালে সেসব দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তবে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয় এবং এটি ভেঙে ইউরোপ ও এশিয়ায় অনেক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মনে রেখো আমরা বলছি ১৯৭১ সনের কথা যখন এদেশটিও যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশ্বরাজনীতিতে প্রভাবশালী শক্তিধর দেশ।

তখন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে বলা হতো পরাশক্তি। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের গণতান্ত্রিক ও বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী দেশগুলো আর অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এবং ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবা জোটবদ্ধ হয়েছিল।

এভাবে দুটি শিবির বা মেরুতে যেন বিভক্ত হয়ে পড়েছিল পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো। চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ হলেও ষাটের দশকের গোড়াতেই তাদের আদর্শগত ও কৌশলগত বিরোধ তৈরি হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে। তাই তারা ছিল এই দুই মেরুভিত্তিক বিভাজন থেকে দূরে। তখন বাকি উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোকে বলা হতো তৃতীয় বিশ্ব।

১৯৫০-এর দশকজুড়ে উপনিবেশের শৃঙ্খল থেকে একে একে মুক্ত হয়েছে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ আর সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন ও আদর্শ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সারা বিশ্বের তরুণ এবং সৃষ্টিশীল লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। ১৯৫৯ সালে কিউবায় ঘটে যায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লব এবং এর দুই নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো এবং চে গুয়েভারা সারা বিশ্বের তরুণসমাজের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন জাগিয়ে তোলেন। বিশ্বরাজনীতির এই বাস্তবতার মধ্যে ষাটের দশকজুড়ে আমাদের দেশের মানুষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে গেছে, যা ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ঘোষণার মাধ্যমে এক দাবি স্বাধীনতায় এসে পৌঁছায়। এই প্রেক্ষাপট মনে রাখলে মুক্তি সনদ ছয় দফায় এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতন্ত্রের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপট নিশ্চয় বোঝা কঠিন হবে না।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝতে আমাদের আরও একটি উদ্যোগের কথা জানতে হবে।

১৯৬১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ আহমদ সুকর্ণ, মিশরের জাতীয়তাবাদী নেতা প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসের, ঘানার স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রেসিডেন্ট কোয়ামে এনক্রুমা এবং তৎকালীন যুগোশ্লোভিয়ার (বর্তমানে বহু দেশে বিভক্ত, যেমন বসনিয়া, সার্বিয়া, মেসিডোনিয়া, ক্রোয়েশিয়া ইত্যাদি) প্রেসিডেন্ট জোসেফ ব্রজ টিটো প্রমুখ মিলে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ তৃতীয় পথ তৈরির চেষ্টা করেছিলেন।

সেটি তখন সফলও হয়েছিল। এটির নামকরণ হয়েছিল নন-অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট (NAM) বা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন। এটি একটি জোট। ষাট ও সত্তরের দশকে বিশ্বরাজনীতিতে এই জোট ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সর্বশেষ ১২০টি দেশ এর সদস্য ছিল। এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো গণ্য হতো তৃতীয় বিশ্ব নামে। প্রথম বিশ্ব পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক উন্নত পশ্চিমা দেশগুলো, দ্বিতীয় বিশ্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনসহ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ। তবে এখন এভাবে আর বলা যায় না, কারণ বাস্তবতা পাল্টে গেছে।

ভারত ছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় দেশ। আর পাকিস্তান ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বলয়ের অন্তর্ভুক্ত দেশ। বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে দু'দেশের অবস্থানের পার্থক্য নিশ্চয় তোমাদের কাছেও পরিষ্কার।

বিশ্বরাজনীতির বাস্তবতায় মুক্তিযুদ্ধ

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের এই সমীকরণের প্রভাব পড়েছিল। দেখা গেল ভারত যখন স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সহায়তা দেওয়ার জন্যে উদ্যোগী হয়েছে তখন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতো দুই শক্তিধর দেশের অবস্থান ছিল তার বিপক্ষে। তবে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা জাপানের মতো যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী অনেক মিত্র দেশ ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতা এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানের অমানবিক নিষ্ঠুরতার কারণে বাংলাদেশ ইস্যুতে অনেকটা নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

আমাদের সরকারও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মিত্র বাড়ানোর তৎপরতা চালিয়ে গেছে। আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সর্বাত্মক প্রয়াস ছিল অতুলনীয়। দেশের অভ্যন্তরে তিনি সব রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির ঐক্য গঠনে সফল হয়েছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের সব প্রভাবশালী দেশ সফর করে তাদের কাছ থেকে মানবিক সহায়তা, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সমর্থন এবং পাকিস্তানকে অস্ত্র সহায়তা বন্ধে সম্মত করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

এছাড়া তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বিচার বন্ধেও সমর্থন আদায়ে চেষ্টা চালিয়ে যান। বাংলাদেশে পাকিস্তানের নির্মম অমানবিক হত্যাযজ্ঞের চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে বাংলাদেশ সরকার ও তাঁর প্রয়াসের কারণে অনেক দেশই শরণার্থীদের জন্যে মানবিক সহায়তার কাজে অংশ নিয়েছে। শুধু তাই নয় বাংলাদেশ ইস্যুতে বিশ্বের অনেক প্রভাবশালী দেশই নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখেছে। এতে মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ব শক্তির অবস্থান অনেকাংশেই বাংলাদেশের অনুকূলে ছিল। এ সময় বাংলাদেশ সরকার বিচারপতি আবু সায়ীদ চৌধুরীকে সরকারের ভ্রাম্যমাণ দূত হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল জাতিসংঘ ও পশ্চিমা বিশ্বের সমর্থন আদায়ে কাজ করার জন্যে।

তবে একথা মানতে হবে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের দামাল যোদ্ধারা অকুতোভয় ভূমিকা পালন করায় এবং সারা দেশের অধিকাংশ মানুষ স্বাধীনতার পক্ষে থাকায় হানাদার বাহিনীর পক্ষে কিছুতেই সুবিধা করা সম্ভব হয়নি। আমাদের যোদ্ধারা জীবনপণ লড়াই করায় এ যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হয়েছে।

মিত্র দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের অবদান

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের অনুকূলে প্রস্তাব উত্থাপিত হলে পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন দুবার তাদের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল। ভেটো ক্ষমতা কেবল পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য রাষ্ট্রের রয়েছে। এ ক্ষমতার ফলে তারা এককভাবে অন্যদের সম্মিলিত প্রস্তাবও ঠেকিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সবকটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন প্রয়োজন। তোমাদের নিশ্চয় জানতে ইচ্ছা করছে বিশ্বের কোন ৫টি রাষ্ট্র এমন ক্ষমতাধর। সেই দেশগুলো হল চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।

৯ আগস্ট ১৯৭১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সাথে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করে যেন প্রতিপক্ষকে জানান দিল যে পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করলে তারা চুপ থাকবে না, বন্ধুরাষ্ট্রের সহায়তায় এগিয়ে আসবে। এ সত্ত্বেও ডিসেম্বরে যখন পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা চালায় ও দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায় তখন সবার ধারণা হয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্যে বঙ্গোপসাগরে তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ সপ্তম নৌবহর পাঠাবে।

আর চীন হিমালয়ের দিকে থেকে ভারতে আক্রমণ চালাবে। তবে সোভিয়েত হুঁশিয়ারি ও সহায়তা এবং ভারত-বাংলাদেশ মিত্রবাহিনীর তৎপরতায় যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি বলে তারা কেউই পাকিস্তানের পক্ষে কোনো রকম সামরিক তৎপরতা চালাতে পারেনি। বরং যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপর ৬ ডিসেম্বর একই দিন প্রথমে ভুটান ও তারপরে ভারত স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ বিজয়ের আগেই আমাদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি আসতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্বজনমত

পঁচিশে মার্চের সেই কালরাতে অপারেশন সার্চলাইট শুরুর আগে পাকিস্তানের তখনকার প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদরা ঢাকায় অবস্থান করে নির্বাচনে বিজয়ী বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধুর সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর ও সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা বৈঠক চালাচ্ছিল।

তবে গণমাধ্যমে এর চেয়েও বড় চমক ঘটিয়েছে ও প্রভাব বিস্তার করেছে অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস নামে এক পাকিস্তানি সাংবাদিকের প্রতিবেদন। অপারেশন সার্চলাইটের নেতিবাচক ধারণা মুছতে পূর্ব পাকিস্তানে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক চলছে তা প্রমাণ করার জন্যে গভর্নর টিক্কা খান এক দল পাকিস্তানি সাংবাদিককে এপ্রিল মাসে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানান। সফরের সময় খোদ সামরিক কর্মকর্তাদের মুখেই শোনা গেছে তাদের নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের কথা। তাছাড়া নানা জায়গা ঘুরে ম্যাসকারেনহাস আসল ঘটনা বুঝতে পেরেছিলেন। অন্যরা করাচি ফিরে পাকিস্তান সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী বানোয়াট খবর ছাপালেও ম্যাসকারেনহাস তা পারেননি। তাঁর বিবেক এমন কাজে সায় দেয়নি। তিনি প্রথমে অসুস্থতার কথা বলে খবর লেখা থেকে বিরত থাকেন।

তারপর বোনের অসুখের কথা বলে তাঁকে দেখতে লন্ডন চলে যান এবং সেখানে লন্ডনের প্রভাবশালী পত্রিকা সানডে টাইমসের সম্পাদক হ্যারল্ড ইভান্সের সাথে দেখা করে সব কথা খুলে বলেন। এ ভদ্রলোক আগেই এ ঘটনার কথা শুনেছিলেন বলে ম্যাসকারেনহাসকে আস্থায় নেন। খবরটি ছাপানো হলে তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিপদ হবে বলে তিনি একটু সময় নেন। দেশে ফিরে ম্যাসকারেনহাস পরিবারকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তখন পাকিস্তানের নাগরিকদের বছরে একবারের বেশি বিদেশ সফরে নিষেধাজ্ঞা থাকায় তিনি পেশোয়ারে এসে পায়ে হেঁটে দুর্গম সীমান্ত পার হয়ে আফগানিস্তান পৌঁছান।

তারপর সেখান থেকে প্লেনে আসেন লন্ডনে। এরপর প্রকাশিত হয় তাঁর ৯ হাজার শব্দের বিস্ফোরক খবর। শিরোনাম ছিল এক শব্দে–'গণহত্যা'। সম্পাদক ইভান্স লেখেন ছোট্ট নিবন্ধ 'হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করো'। ম্যাসকারেনহাসের এই প্রতিবেদন বিশ্বের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ এবং জনগণকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। এটি যেন মুক্তিযুদ্ধের গতিপথ ঠিক করে দেয়।

এভাবে আরও কয়েকজন সাংবাদিক ভেতরের খবর বাইরে পাঠাতে সক্ষম হন। দেশের ভেতর থেকে বাংলাদেশি সাংবাদিকরাও বিদেশে খবর পাঠিয়ে গেছেন পুরো নয় মাস। এঁদের মধ্যে শহীদ নিজামুদ্দীন আহমেদ ও সৈয়দ নাজমুল হক বিদেশি গণমাধ্যমে কাজ করতেন। তাঁরা দু'জন এবং আরও অনেকেই ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হিসেবে আলবদরদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন। তবে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের পাঠানো ছবি ও খবর বিশ্ববিবেককে নাড়া দিয়েছিল। ফলে প্রথম থেকেই সারা বিশ্বের সাধারণ মানুষের সমর্থন আমাদের পক্ষেই তৈরি হতে থাকে।

দেখা গেল খোদ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের জনপ্রতিনিধিরাও দলে দলে শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে আসছেন এবং বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ-কষ্টের সমব্যথী হচ্ছেন ও অনেকেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। এঁদের মধ্যে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, স্যাক্সবি, গ্যালাঘ এবং ব্রিটিশ এমপি জন স্টোনহাউজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

এদিকে ফ্রান্সের সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী, বিশিষ্ট লেখক আঁদ্রে মালরো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোর বন্দর ঘেরাও করেন সাধারণ মার্কিন নাগরিকরা। তাঁরা পাকিস্তানের জন্যে জাহাজে অস্ত্র বোঝাই করতে দেবেন না। তাঁদের বাধা সেদিন উপেক্ষা করা যায়নি।

পাক হানাদার বাহিনীর আক্রমণের পরে বাংলাদেশের যেসব সাংবাদিক, শিল্পী-সাহিত্যিক আগরতলা বা কলকাতায় পৌঁছান তাঁরাও ভারত ও অন্যান্য দেশের সাংবাদিকদের কাছে দেশের ভেতরের প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করেন। ফলে প্রথম থেকেই ভারতীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম এবং শরণার্থীদের খবর প্রচার করে এসেছে।

ইংল্যান্ডের বেসরকারি বেতার কেন্দ্র বিবিসি, মার্কিন বেতার কেন্দ্র ভয়েস অব আমেরিকা, ভারতের আকাশবাণীসহ বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণের খবর ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। পাশাপাশি নয় মাসজুড়েই তারা মুক্তিযোদ্ধাদের নানা সাফল্যের খবরও পরিবেশন করেছে। এতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে শরণার্থী শিবিরে লাখ লাখ মানুষের কষ্টকর জীবন, অসহায় মৃত্যু, খাদ্যাভাবে অপুষ্টির শিকার শিশুদের অসহায় দুর্ভোগের বিবরণী ও ছবি প্রভৃতি।

বিশ্বের খ্যাতিমান সব পত্রিকা ও সাময়িকীতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে খবর, ফিচার ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত সাময়িকী টাইম ও নিউজউইকে একাধিকবার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রচ্ছদ কাহিনি ছাপা হয়েছিল, একবার প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। সেই সময় কিছু সাংবাদিকের নাম মানুষের মুখে মুখে ফিরেছিল, যেমন– সাইমন ড্রিং, ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ, পিটার হেজেলহার্স্ট, সিডনি শ্যানবার্গ, অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস, জুলিয়ান ফ্রান্সিস, মার্ক টালি, উইলিয়াম ক্রলি, ভারতীয় আলোকচিত্রি রঘু রাই, কিশোর পারেখ প্রমুখ।

প্রথম সারির ব্রিটিশ পত্রপত্রিকা ডেইলি টেলিগ্রাফ, গার্ডিয়ান, ইকনোমিস্ট, স্টেটসম্যান, দি টাইমস, ফিন্যাসশিয়াল টাইমস প্রভৃতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউইয়র্ক টাইমসের মতো পত্রিকাসহ সারা বিশ্বের অধিকাংশ পত্রিকার ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের অনুকূলে। বিশ্বজনমত তৈরিতে এটি বড় ভূমিকা রেখেছিল।

শিল্পী-সাহিত্যিকদের অবদান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ভূমিকা গ্রহণে শিল্পী-সাহিত্যিকরাও পিছিয়ে থাকেন নি। বিখ্যাত ভারতীয় সেতারবাদক পণ্ডিত রবিশংকর ও ব্রিটিশ গায়ক বিটল খ্যাত জর্জ হ্যারিসন মিলে বাংলাদেশের যুদ্ধে সহায়তার জন্যে ১৯৭১-এর আগস্টের ১ তারিখ নিউইয়র্কের মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে আয়োজন করেছিল কনসার্ট ফর বাংলাদেশ। তাতে হ্যারিসন এবং আরেকজন খ্যাতিমান মার্কিন গায়িকা জোয়ান বায়েজ বাংলাদেশ নিয়ে আবেগপূর্ণ গান গেয়ে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেন।

পণ্ডিত রবিশংকর, উস্তাদ আলী আকবর খান ও পণ্ডিত আল্লারাখার সেদিনের বাদন মানুষ আজও স্মরণ করে। পঞ্চাশ হাজার মানুষ এই কনসার্ট সরাসরি উপভোগ করেছিল। এদিকে ভারতজুড়ে শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা নানা আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রবাসী বাংলাদেশিরাও বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতার সপক্ষে

সম্মিলিতভাবে কাজ করেছিলেন। আন্তর্জাতিক মানবিক উদ্যোগও গঠিত হয়েছিল অনেকগুলো। শরণার্থী শিবিরে অসংখ্য শিশুর চরম ভোগান্তি ও মৃত্যু উন্নত বিশ্বের শিশুদেরও টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে বাংলাদেশের জন্যে সহায়তা তহবিলে দানে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অক্সফাম, সেভ দ্য চিলড্রেন, ইউনিসেফসহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা শরণার্থীদের সহায়তায় নিরলস কাজ করে গেছে। তখন বাংলাদেশের পক্ষে অনেক বেসরকারি সংস্থাও গড়ে উঠেছিল। যুক্তরাষ্ট্রে গঠিত হয়েছিল ফ্রেন্ডস্ অব বাংলাদেশ, আমেরিকান ফর ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন, বাংলাদেশ ডিফেন্স লিগসহ অনেক প্রতিষ্ঠান। ইংল্যান্ডের অপারেশন ওমেগা, অ্যাকশন বাংলাদেশ, ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টস্ প্রভৃতি বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেছে।

ষাটজনের সাক্ষ্য

বিশ্বের বিখ্যাত ষাটজন মনীষী প্রকাশ করেছিলেন টেস্টিমনি অব সিক্সটি ষাটজনের সাক্ষ্য। এ হলো এমন ষাটজন খ্যাতিমান মানুষের বক্তব্য যাঁরা তখন পূর্ব পাকিস্তানে যে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটেছিল তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মাদার তেরেসা, মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, বিখ্যাত সাংবাদিক ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ, জন পিলজার প্রমুখ। মাদার তেরেসা সাক্ষ্য দিয়ে লিখেছেন 'আমি পাঁচ-ছয় মাস ধরে শরণার্থীদের মধ্যে কাজ করছি। আমি এসব শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মরতে দেখেছি। সে কারণেই আমি পৃথিবীকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এই পরিস্থিতিটা কত ভয়াবহ এবংপরিস্থিতি মোকাবেলায় কত জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য দরকার। '

আর মার্কিন গায়িকা জোয়ান বায়েজের কণ্ঠে নিউইয়র্কের মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে ধ্বনিত হয়েছিল তাঁরই রচিত গানের কলি -

বাংলাদেশ বাংলাদেশ

যখন সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায়

তখন বাংলাদেশের দশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের একদিকে বহু বিয়োগান্তক ঘটনা, অসংখ্য নিষ্ঠুরতা, ধ্বংস, হত্যা, রোগ, অপুষ্টি, মৃত্যু আর অন্যদিকে মৈত্রী, সেবা, সহানুভূতি, মানবতা, যুদ্ধ, বীরত্ব, ত্যাগ, বিজয় এবং বিজয়ের উল্লাস।

তবে বিশ্বমানবতা সেদিন আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং তাই শেষ পর্যন্ত সব বাধা পেরিয়ে আমরা অর্জন করতে পেরেছি স্বাধীনতা । আমাদের শ্যামল জমিনে রক্তলাল রঙে সূর্য উদিত হয়েছিল অমানিশার অন্ধকার কাটিয়ে।

অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ

নন্দিনীর বাবার কাছ থেকে সব কিছু শুনে ওরা সবাই যেন হঠাৎ করে অনেক বড় হয়ে উঠল। মুক্তিযুদ্ধের এদিকটি তারা আগে কখনো খেয়াল করেনি।

আয়েশা মুগ্ধতা নিয়ে বলল, সত্যিই তো কত দেশ কত মানুষ কত কত প্রতিষ্ঠান আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন!

আদনান বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, এ নিয়ে আমাদের খুব ভালো কাজ করতে হবে। সবাই কিন্তু এ ব্যাপারে সিরিয়াস থাকব আমরা।

খুশি আপা ওদের মনোভাব দেখে খুশি মনে বললেন, তোমরা তো আগেই অনুসন্ধানের বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনেছ, এবার প্রত্যেকটি বিষয়ে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজবে তা ঠিক করে ফেল।

ওরা আলোচনা করে অনুসন্ধনের প্রশ্ন ঠিক করল।

১. মুক্তিযুদ্ধের সময় বিপুল শরণার্থী কোথায় এবং কীভাবে আশ্রয় পেয়েছিল?

২. অপারেশন সার্চলাইটের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর বিশ্বে কীভাবে ছড়িয়েছিল?

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে কারা সাহায্য করেছিল?

এভাবে আমরা আরও প্রশ্ন তৈরি করব। প্রত্যেক দল নিজ নিজ বিষয়ভিত্তিক সম্ভাব্য প্রশ্নের তালিকা, তথ্য প্রাপ্তির উৎসের তালিকা এবং প্রাপ্ত তথ্য যাচাইয়ের পদ্ধতি লিখব।

এরপর ক্লাসের সব বন্ধুদের প্রতিটি দলের প্রত্যেকে প্রথমে নিজ পরিবার এবং পরে এলাকার অন্যান্য বয়স্ক মানুষ থেকে তথ্য সংগ্রহ করল। দলের সব সদস্য তাদের প্রাপ্ত তথ্য একত্র করে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করল। প্রতিটি দল খুশি আপার সাথে তাদের প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে আলোচনা করল।

– খুশি আপা দলগুলোর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগোচ্ছে কি না তার খোঁজ-খবর রাখলেন এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সকল ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা দিলেন। কিন্তু কোনো মতামত চাপিয়ে না দিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন এবং প্রয়োজনে কারিগরি (যেমন- তথ্য সংগ্রহের জন্য রেকর্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদি) ও প্রশাসনিক (যেমন- কোনো জায়গায় প্রবেশ করতে বিশেষ অনুমতি দরকার হলে প্রধান শিক্ষকের পরামর্শক্রমে চিঠি দেওয়া) সহায়তা দিলেন।

– দলগুলো মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সংবাদিকদের ভূমিকা, মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের ভূমিকা, শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলায় মূল ভার বহনকারী দেশ ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের ভূমিকা, প্রবাসী সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন এবং বিজয় অর্জন পর্যন্ত তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব ও এতে দেশটির অবদান, জাতিসংঘ ও অন্যান্য বিশ্ব সংস্থার ভূমিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য মিত্র দেশের ভূমিকা, শিল্পী-সাহিত্যিকদের উদ্যোগ সম্পর্কে বর্ষীয়ান বা তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করল। এ বিষয়গুলো নিয়ে জানার চেষ্টা করল এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ দলের সদস্যরা নোট করে নিল।

– দলের প্রত্যেক সদস্যই পর্যায়ক্রমে যাতে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, অবদান রাখতে পারে খুশি আপা সতর্কতার সাথে সে বিষয়টি নিশ্চিত করলেন।

তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণ

– খুশি আপা বারবার দলগুলোর কাছ থেকে তথ্যের সত্যতা কীভাবে যাচাই করবে তার ধারণা নিলেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন। তবে দলগুলোর ওপর কোনো মতামত চাপিয়ে দিলেন না।

– সবাই দলগতভাবে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ-বর্জন করে তা বিশ্লেষণ করল এবং নিজেদের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই কাজের অভিজ্ঞতাসমূহ শ্রেণিকক্ষে খুশি আপা ও অন্যান্য দলের সামনে উপস্থাপন করল।

ফলাফল তৈরি ও উপস্থাপন

- এই পর্যায়ে খুশি আপা জানতে চাইলেন, এই কাজের মধ্য দিয়ে তোমরা মুক্তিযুদ্ধের যেসব ঘটনা খুঁজে এনেছ সেগুলো কীভাবে অন্যদের জানাতে পার?

- সবাই দলে আলোচনা করে বিভিন্ন সৃজনশীল ও অভিনব উপায় পরিকল্পনা করল। যেমন ফটোবুক, ডকুমেন্টারি, দেয়ালিকা, পোস্টার, লিফলেট, ফটোগ্রাফি বা আঁকা ছবির প্রদর্শনী, বই, নাটক ইত্যাদি। খুশি আপা এই ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে তাদের পরিকল্পনা করতে দিলেন, শুধু সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও ইস্যুসমূহ সম্পর্কে সচেতন করলেন। খুশি আপার পরামর্শ নিয়ে দলগুলো তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করল এবং কোনো জাতীয় দিবসে তা অন্যান্য ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করল।

- এবার খুশি আপা বললেন, বিদ্যালয়ে উদযাপিত হয় এমন যেকোনো জাতীয় দিবস যেমন- ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৪ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখ, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস প্রভৃতি জাতীয় দিবসের সাথে মিলিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কমিউনিটির ব্যক্তিবর্গের সামনেও তোমাদের প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করতে পার। আমরা মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক এসব তথ্য পরবর্তী গবেষণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বা জাতীয়ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করব।

- এছাড়াও তোমরা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বইয়ের প্রদর্শনী, বছরব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই পাঠ প্রতিযোগিতা, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী (যেমন স্টপ জেনোসাইড, লিবারেশন ওয়ার, নাইন মান্থস্‌ টু ফ্রিডম, মাটির ময়না প্রভৃতি), মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্রাঙ্কন ও প্রদর্শনী, মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র প্রদর্শনী, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক মঞ্চায়ন, মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি বহুবিধ আয়োজনের মাধ্যমে তোমাদের আগ্রহ, উপলব্ধি ও দক্ষতার প্রমাণ রাখতে পারবে।

- সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ফিডব্যাক অনুসারে বন্ধুরা তাদের প্রকল্পটি উপস্থাপনের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। অতিথি হিসেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, অভিভাবক, স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি/মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত থাকলেন।

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ

এরপর খুশি আপা মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করেছিল সেসব বিদেশি বন্ধুদের স্মৃতি ধরে রাখার স্থায়ী কোনো উপায় করা যায় কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। বললেন যে, প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতিফলন হিসেবে তোমরা নিজ নিজ এলাকায় "শিক্ষার্থী কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারী বিদেশি বন্ধুদের উদ্দেশ্যে নির্মিত "মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ" করতে পার বা পুনর্নির্মাণের নকশা তৈরির পরিকল্পনা বা প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে পার/ তাদের নামে কোনো রাস্তা বা বিশেষ জায়গা করা যায় কি না তা ভাবতে পার এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয় ও স্থানীয় প্রশাসনের (উপজেলা বা জেলা) সহযোগিতার আবেদন করতে পার।

ডকুমেন্টেশন

সবশেষে দলগুলো দলীয় কাজের বিভিন্ন ধাপের তথ্যসমূহ, আত্ম-প্রতিফলনের লিখিত রূপ এবং অর্জিত শিখনের সারসংক্ষেপ (ছবি/ভিডিও/লিখিত রূপ/খসড়া এর হার্ড বা সফট কপি) খুশি আপার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ করল।

সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো ও রীতিনীতি

নীলা ক্লাসে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওর বন্ধুরা ওকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু নীলার কান্না কিছুতেই থামছে না। এমন সময় খুশি আপা এলেন। তিনি জানতে চাইলেন, কী হয়েছে নীলা, কাঁদছ কেন?

তাতে নীলার কান্নার বেগ আরও একটু বাড়ল কেবল। নীলার বন্ধুরা খুশি আপাকে যা জানাল তা হলো, বড় বোন ছিল নীলার সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের একজন। কয়েক দিন আগে সেই বোনের বিয়ে হয়েছে, বোন শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। আজ কথা প্রসঙ্গে ফ্রান্সিস তার বোনের কথা জিজ্ঞেস করতেই হঠাৎ করে নীলা কাঁদতে শুরু করে।

খুশি আপা নীলাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কষ্ট! তোমার দুঃখে আমাদের সবারই অনেক মন খারাপ হচ্ছে। কিন্তু এমন কষ্ট শুধু তোমার একার নয়, আমাদের সমাজে প্রায় সবারই এ রকম কষ্টের অভিজ্ঞতা আছে।

নীলা একটু শান্ত হলে খুশি আপা বললেন, চলো আমরা দলগতভাবে একটা লেখা থেকে কিছু অংশ পড়ি। আজ থেকে প্রায় ১৩০ বছরেরও বেশি আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটি লিখেছিলেন। খুশি আপার কথা শুনে নীলা কান্না থামিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল।

ছিন্নপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

.....বোধ হয় বয়সে বারো-তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চোদ্দ-পনেরো দেখাচ্ছে। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান, সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরল ভাব। ...ছেলেদের মতো আত্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব এবং তার সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারি নতুন রকমের একটি মেয়ে তৈরি হয়েছে। .. অবশেষে যখন যাত্রার সময় হলো তখন দেখলুম আমার সেই চুল-ছাঁটা, গোলগাল-হাতে-বালা-পরা, উজ্জ্বল-সরল-মুখশ্রী মেয়েটিকে নৌকায় তুললে। বুঝলুম, বেচারা বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে, নৌকা যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, দুই একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক চোখ

মুছতে লাগল। একটি ছোটো মেয়ে, খুব এঁটে চুল বাঁধা, একটি বর্ষীয়সীর কোলে চ'ড়ে তার গলা জড়িয়ে তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। যে গেল বোধ হয় এ বেচারির দিদিমণি, এর পুতুল খেলায় বোধ হয় মাঝে মাঝে যোগ দিত, বোধ হয় দুষ্টুমি করলে মাঝে মাঝে সে একে টিপিয়েও দিত।

সকাল বেলার রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদের পূর্ণ বোধ হতে লাগল!.. মনে হলো, সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ। ... বিদায়কালে এই নৌকা করে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্যে যেন আরও একটু বেশি করুণা আছে। অনেকটা যেন মৃত্যুর মতো তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া-যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ...

পড়া শেষে হলে মিলি বলল, এটাতো নীলার বড় বোনের শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার মতো একই রকম ঘটনা মনে হচ্ছে! গল্পের ছোট মেয়েটাও নীলার মতো ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। সাবা বলল, আরও কয়েকজন মেয়েও কাঁদছে। রফিক অবাক হয়ে বলল, আচ্ছা, সবাই যখন এত কষ্টই পাচ্ছে, তখন মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠাচ্ছে কেন! নীলা বলল, আমার বোনের বিয়ের পরে আমিও এই কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। সবাই বলেছে, এটাই নিয়ম। বিয়ের পর মেয়েরা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। ওমেরা বলল, সব মেয়েদের তো শ্বশুরবাড়িতে যেতে হয় না!

গারো সম্প্রদায়ে, বেদে সম্প্রদায়ে বিয়ের পরে ছেলেরাই মেয়েদের বাড়িতে চলে আসে। বুশরা জিজ্ঞাসা করল, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে এমন ভিন্ন রকম ব্যবস্থা কেন? খুশি আপা বললেন, দারুণ! আলোচনা জমে উঠেছে। তোমরা অসাধারণ কিছু প্রশ্ন তুলেছ! আচ্ছা এসব প্রশ্নে উত্তর খোঁজার আগে চলো আমরা আরেকটা মজার ছবি দেখে নিই।

পাশাপাশি তোমরা জেনে রেখো আজকাল শহরে অনেককেই আর শ্বশুড়বাড়ি যেতে হয় না। তাছাড়া বাল্যবিয়ের বিরূদ্ধে আইন রয়েছে এমনকি বাল্যবিয়ে ঠেকাতে সয়ং মেয়েরাও উদ্যোগী হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন, এলাকার আলোকিত ব্যাক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া, জনসাধারনের মাঝে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করছে এবং এটি যে আইনত একটি অপরাধ সে বিষয়ে ধারণা দিচ্ছে।

মিষ্টি খাওয়াও!

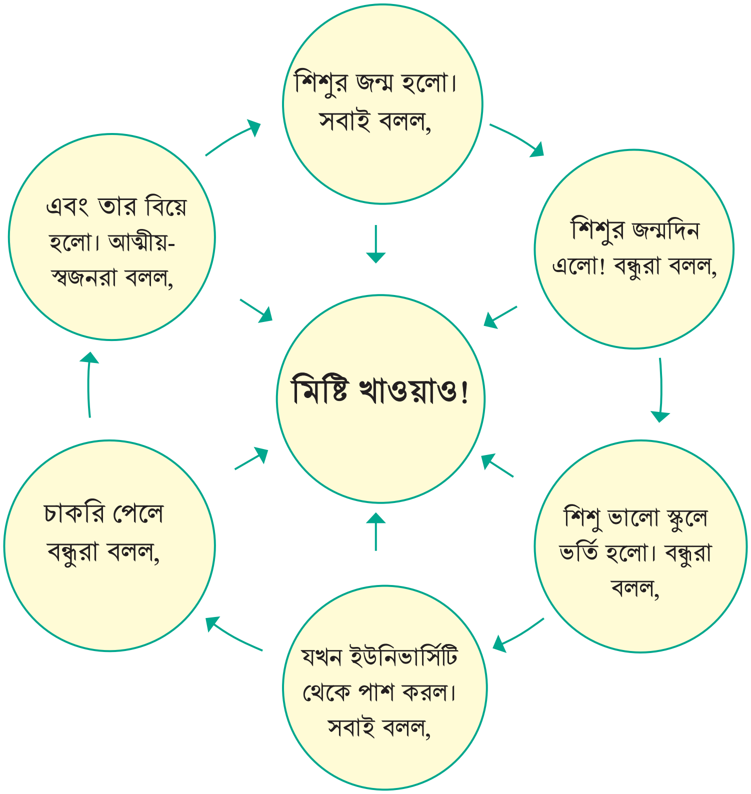

খুশি আপা বললেন, এই ছবির মতো ঘটনা কি তোমরা কখনো দেখেছ? ফাতেমা বলল, আমার পাশের বাড়িতে একটা বাচ্চা জন্মেছিল। ওদের বাড়ি থেকে পাড়ার সবাইকে মিষ্টি খাইয়েছিল। গণেশ বলল, আমার বড় বোনের পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়ার পর বাবা-মা সবাইকে মিষ্টি দিয়েছিল। আয়েশা বলল, আমার ছোট মামা চাকরি পাওয়ার পর আমাদের বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে এসেছিলেন।

খুশি আপা বললেন, এই ঘটনাগুলো আলাদা আলাদা কিন্তু সবগুলো ঘটনার মধ্যে একটা মিল আছে। আয়েশা বলল, হ্যাঁ আপা, সবগুলোই আনন্দের খবর। খুশি আপা বললেন, ভালো কিছু হলে অন্যদের 'মিষ্টিমুখ করানো' আমাদের সমাজের একটা নিয়ম। এবার চলো একটা মজার কাজ করি।খুশি আপা ওদের নিচের ছবিগুলো দেখিয়ে জানতে চাইলেন, ছবিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?

ওরা ছবি দেখে বর্ণনা দিল, কারো সাথে দেখা হলে সালাম বিনিময় করা, বড়দের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা, মালা বদল, পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ খাওয়া। খুশি আপা: এগুলোও আমাদের সমাজে প্রচলিত নিয়ম। এ রকম আর কোনো নিয়মের কথা কি তোমাদের মনে পড়ছে?

আয়েশা: একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারে ফুল দেওয়া।

মোজাম্মেল: বেদে সম্প্রদায়ে বিয়ের সময় ছেলেদের গাছের উঁচু ডালে উঠে বসে থাকা।

আনাই: সাংগ্রাইয়ের সময় মারমাদের ‘পানি খেলা’।

ফ্রান্সিস: প্রথম পড়া দাঁত বালিশের তলায় রেখে দেওয়া।

সালমা: জন্মদিনে কেক কাটা।

মাহবুব: টয়লেট ব্যবহার করার পর পরিষ্কার করে রাখা।

খুশি আপা বললেন, বাহ্, আমরা তো দেশ-বিদেশের অনেক সামাজিক নিয়মের কথাই জানি! এবার চলো, এগুলো নিয়ে একটা মজার কাজ করি। প্রত্যেকে পরের পৃষ্ঠার ছকটা ব্যবহার করে আমাদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলে তারা কোন কোন সামাজিক নিয়ম মেনে চলে তার একটি তালিকা তৈরি করি। এসব নিয়ম-কানুন তারা কোথা থেকে জানতে পেরেছেন? নিয়ম না মানলে কী হতে পারে? এসব প্রশ্নের উত্তরও জেনে নিই। ছকটিতে উদাহরণ হিসেবে একটি সামাজিক নিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা যতগুলো খুঁজে পাবো সবগুলো এই তালিকায় যোগ করব আর প্রশ্ন করে উত্তরও জেনে নেবো। আমরা আরও বেশি ঘর এঁকে যতগুলো সম্ভব সামাজিক নিয়ম এই তালিকায় যুক্ত করব।

ক্রম	সামাজিক নিয়মের তালিকা	নিয়ম পালনের কথা কে বলে দিয়েছে?/কোথা থেকে জেনেছেন?	এই নিয়ম পালন না করলে কী হতে পারে?
১।	বড়দের শ্রদ্ধা করা	বাবা-মা, বয়স্ক আত্মীয়-স্বজন	সবাই অপছন্দ করবে। অভদ্র বলবে।
২।	....		
৩।	....		
৪।	....		

কয়েক দিন পর শ্রেণিকক্ষে সবাই অনেকগুলো সামাজিক নিয়মের তালিকা নিয়ে হাজির হলো। খুশি আপা বললেন, অসাধারণ কাজ করেছ তোমরা! সবার উপস্থাপন শেষে বোঝা গেল:

- অধিকাংশ মানুষ সামাজিক নিয়ম-কানুনগুলো জেনেছে তাদের পরিবার, পাড়া-পড়শি এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে।
- সবাই জানে, এসব নিয়ম-কানুন মেনে না চললে আইন কোনো শাস্তি দেয় না। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ মানুষ এসব নিয়ম-না-মানা মানুষদের অপছন্দ করে।

এবারে ওপরের ছকটি ব্যবহার করে চলো আমরাও কাজটি করি। নিজেরা দেখে নিই, যাদের কাছে জিজ্ঞেস করে তালিকাটি তৈরি করছি,

- তারা নিজেরা এসব নিয়ম-কানুনের বিষয়ে কী মনে করেন?
- তারা কোথা থেকে নিয়মগুলো পেয়েছেন?
- এসব নিয়ম না মানলে কী হয়?

খুশি আপা এবার বললেন,

সমাজের এই অলিখিত নিয়ম-কানুনগুলোকে সামাজিক রীতিনীতি বা সংস্কার বলে। সামাজিক রীতিনীতি আমাদের বলে দেয় কোন পরিস্থিতিতে, কোন পরিবেশে, কার সাথে একজন মানুষকে কী ধরনের আচরণ করতে হবে। এগুলো মেনে চলবার কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু কেউ না মানলে সমাজের মানুষ তাকে অপছন্দ করতে পারে।

শিহান বলল, কিন্তু আমরা যে দেখলাম আমাদের বন্ধু নীলা ও তার পরিবার, এমনকি রবীন্দ্রনাথের গল্পের

মানুষগুলোও রীতিনীতি মেনে চলতে গিয়ে অনেক কষ্ট পেল! সাবা বলল, আবার এটাও তো দেখলাম, অনেক রীতিনীতি আমাদের আনন্দ দিচ্ছে, অনেক উপকারেও লাগছে। যেমন, বড়দের শ্রদ্ধা করা, বসার জায়গা দেওয়া, টয়লেট ব্যবহারের পর ভালোভাবে পরিষ্কার করে বের হওয়া ইত্যাদি।

খুশি আপা বললেন, তোমরা ঠিকই বলেছ। সমাজে প্রচলিত কিছু রীতিনীতি অনুসরণ করা অনেক সময় কষ্টকর হলেও বেশির ভাগ রীতিনীতি আমাদের জন্য উপকারী। চলো, এবার তাহলে আমরা এতক্ষণ যে কাজগুলো করেছি তা বিশ্লেষণ করি। ভাবনা-চিন্তা করে দেখি, আমাদের সামাজিক রীতিনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো কী? সবার আলোচনা থেকে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া গেল।

সামাজিক রীতিনীতির বৈশিষ্ট্য

১. সামাজিকভাবে তৈরি হয়।

২. এগুলো সমাজের একটি অপরিহার্য অংশ।

৩. এগুলো ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে।

৪. একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়/দেশে আলাদা রকমের সামাজিক রীতিনীতি হতে পারে।

৫. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলো হল অলিখিত নিয়ম-কানুন।

৬. সমাজের অধিকাংশ মানুষ চেষ্টা করে সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে।

৭. সমাজে নির্দেশমূলক ও নিষেধমূলক এই দুই ধরনের রীতিনীতি দেখা যায়। নির্দেশমূলক রীতিনীতি মানুষকে কোনো কাজ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়। আর নিষেধমূলক রীতিনীতি কোনো কেনো বিশেষ কাজ করতে নিষেধ করে থাকে।

বুশরা বলল, রীতিনীতির বৈশিষ্ট্য তো বুঝলাম। কিন্তু এগুলো আসলে সমাজে কী কাজ করে সেটা ভালো করে বুঝতে পারছি না। খুশি আপা বললেন, চলো তাহলে আলোচনা করে বুঝে নিই সমাজে সামাজিক রীতিনীতির ভূমিকা কী।

সমাজে সামাজিক রীতিনীতির ভূমিকা

১. সমাজে মানুষের আচার ব্যবহার কেমন হবে তা ঠিক করে দেয়।

২. সমাজের যাতে সবকিছু ঠিকমতো কাজ করে তা নিশ্চিত করতে ভূমিকা পালন করে।

৩. মানুষের সমাজ গড়ে তোলার যে মূল উদ্দেশ্য সবাইকে নিয়ে ভালো থাকা, তা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৪. সামাজিক মূল্যবোধ চর্চার সুযোগ তৈরি করে।

৫. সামাজিক বিচারে সফলতার মানদণ্ড তৈরি করে মানুষের মাঝে সফলতার অনুভূতি তৈরি করতে সহায়তা করে।

গৌতম বলল, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, সমাজে সবাই একই ধরনের রীতিনীতি বা নিয়ম-কানুন মেনে চলে কেন?

খুশি আপা বললেন, খুবই ভালো প্রশ্ন করেছ। তোমরা যখন এমন সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করো তখন আমার খুব আনন্দ হয়!চলো আমরা দলে আলোচনা করে কয়েকটি বিষয় খোঁজার চেষ্টা করি। পরিবার ও স্কুলে রীতিনীতি বা নিয়ম-কানুন মেনে না চললে কী কী হতে পারে?

আমরাও নিচের ছকটি পূরণ করি।

পরিবারে নিয়ম-কানুন মেনে না চললে কী হতে পারে	স্কুলে নিয়ম-কানুন মেনে না চললে কী হতে পারে

সবাই ছকটি পূরণ করে দলগতভাবে তাদের কাজ উপস্থাপন করল। সবার খুব সুন্দর উপস্থাপনের পর খুশি আপা প্রচলিত রীতি-নীতি মেনে চলার কিছু কারণ তুলে ধরলেন।

প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলার কারণ?

১. রীতিনীতি নানাভাবে সমাজের মানুষের উপকার করে। রীতিনীতি সমাজে বিভিন্ন মানুষের সাথে বিভিন্ন পরিবেশে কী ধরনের আচরণ করতে হবে তা শিখতে সহযোগিতা করে। ভালো আচরণ বা খারাপ আচরণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়। সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাপনে শৃঙ্খলা রক্ষা করে।

২. মানুষ সাধারণত পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-পরিচিতজন সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে পছন্দ করে। তাই সে সবার পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দেয়। সমাজের অধিকাংশ মানুষ সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলে বলে কারোর যদি রীতিনীতি নিয়ে কোনো ভিন্নমত থাকে, তবুও সবার মতামত মেনে নেয়।

৩. মানুষ সাধারণত অধিকাংশ মানুষের কাজ বা চিন্তাকে সঠিক মনে করে। কোনো মানুষের পক্ষেই অধিকাংশ মানুষের পছন্দের আচরণ কী তা জানা সম্ভব নয়। মানুষ তার আশপাশের মানুষের আচরণকে অধিকাংশ মানুষের আচরণ ভেবে ভুল করে। ফলে আশপাশের মানুষের আচরণকে অধিকাংশ মানুষের পছন্দের আচরণ ভেবে তাদের আচরণ বা রীতিনীতি মেনে চলে।

৪. মানুষ সাধারণত দলে চলতে পছন্দ করে। একটা দলের সামনের অংশ যেদিকে যায়, পেছনের অংশ পেছন থেকে দেখতে না পেয়েও সেদিকেই যায়। একইভাবে সমাজের মানুষও পূর্ব পুরুষরা যে সব রীতিনীতি মেনে চলেছে তা বিচার-বিশ্লেষণ না করেই অনুকরণ করে।

৫. সাধারণত ভিন্ন চিন্তার মানুষেরা সমাজে নিজেদের সংখ্যালঘু বা সংখ্যায় কম বলে মনে করে। আর অন্যদের সংখ্যায় বেশি বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মনে করে। শেষ পর্যন্ত নিজের রীতিনীতি বদলে ফেলে অন্যদের রীতিনীতি মেনে নেয়।

৬. অধিকাংশ মানুষ কেমন রীতি-নীতি পছন্দ করে সে সম্পর্কে মানুষ একটা অনুমান করে। প্রায়শই সে ধারণা ভুল হলেও সে সেই অনুমান অনুসারে রীতিনীতি মেনে চলে।

৭. প্রচার মাধ্যমে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ যে রীতিনীতি মেনে চলে তা দেখে তরুণ প্রজন্ম সেটা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৮. সমাজ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের ওপর রীতিনীতি মেনে চলার জন্য নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে।

মূল্যবোধ

পরদিন শ্রেণিকক্ষে এসে খুশি আপা বললেন, চলো আজ আমরা বই থেকে আরও কিছু ছবি দেখি। ক্লাসের সবাই মিলে নিচের ছবিগুলো দেখল।

ছবি দেখা শেষ হলে খুশি আপা সবাইকে দলে বিভক্ত হয়ে ছবিগুলো থেকে কী বোঝা গেল তা আলোচনা করে দলগতভাবে উপস্থাপন করতে বললেন।

সবাই তখন দলে বিভক্ত হয়ে নিচের ছক ব্যবহার করে তাদের চিন্তাগুলো সাজিয়ে সবার সামনে উপস্থাপন করল।

ক্রম	ছবির শিরোনাম	ছবি দেখে যা মনে হয়েছে
১.	চারপাশটা পরিচ্ছন্ন রাখি সবাই মিলে ভালো থাকি (এটা একটি উদাহরণ)	সবাই মিলে সমাজের কাজগুলো করলে সবাই মিলে ভালো থাকা যায়। (এটা একটি উদাহরণ)
২.		
৩.		
৪.		

সবার উপস্থাপনা শেষ হলে খুশি আপা বললেন, তোমাদের সবার কথা থেকে বোঝা গেল যে ছবিতে কিছু সামাজিক ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে যেখানে কোনো ব্যক্তি বা একদল মানুষ কিছু কাজ করছেন। আচ্ছা বলো তো, ছবিতে যে সব কাজ দেখানো হয়েছে সেগুলো কি ভালো না মন্দ? সবাই বলল, ভালো!

খুশি আপা বললেন, কেউ যদি এই কাজগুলো করে তাহলে আমরা তাকে কেমন মানুষ বলে মনে করি? সবাই বলল, ভালো মানুষ। খুশি আপা বললেন, ভালো মানুষের কী কী বৈশিষ্ট্য ছবিগুলোয় দেখতে পাচ্ছি? "সেবা, দয়া, মায়া, পরোপকার, সহযোগিতার মনোভাব ধারণ ও ব্যক্তিগত জীবনে সেসব চর্চা করা" ওরা জবাব দিল। এবার খুশি আপা ভালো মানুষের আর কী কী বৈশিষ্ট্য হয় তা জানতে চাইলেন। জবাবে ওরা নানা রকম বৈশিষ্ট্যের কথা বলল।

খুশি আপা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আমরা কীভাবে জানলাম যে এগুলো ভালো মানুষের বৈশিষ্ট্য? সবাই কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল। একটু পর বুশরা বলল, বড়দের কাছ থেকে জেনেছি। আমার বাবা তো প্রায়ই আমাকে বলেন, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, মানুষের উপকার করবে। এবার আস্তে আস্তে সবাই মুখ খুলতে শুরু করল। শফিক বলল, আমার খালা আমাকে বলেছেন রাস্তায় যদি কোনো অসহায় মানুষ দেখো, তাহলে তাকে সাহায্য করবে।

খুশি আপা বললেন, তার মানে আমাদের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী বা সমাজ আমাদের শিখিয়েছে যে এগুলো ভালো কাজ। দেখা যাচ্ছে সমাজের অধিকাংশ মানুষ এগুলোকে ভালো কাজ হিসেবে মনে করছে। সবাই সহমত হলো।

খুশি আপা বললেন, এবার চলো আমরা পরিবারে ও সমাজে ভালো কাজ হিসেবে মনে করা হয় এমন কিছু কাজ চিহ্নিত করি এবং এসব ভালো কাজ করার পেছনে যে মূল্যবোধগুলো থাকে সেগুলো খুঁজে বের করি।

ক্রম	সমাজস্বীকৃত ভালো কাজের নমুনা	মূল্যবোধ
১.	বয়স্ক ব্যক্তিকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করা	পরোপকার
২.	অন্যের মতামত মেনে নিতে না পারলেও শ্রদ্ধাসহ শোনা	পরমতসহিষ্ণুতা

৩.	অন্যের জিনিস অনুমতি ছাড়া না নেওয়া	
৪.		
৫.		

ওরা সবাই মিলে অনেকগুলো ভালো কাজের পেছনের মূল্যবোধগুলো খুঁজে বের করল। খুশি আপা বললেন, মূল্যবোধের মাধ্যমে আমরা কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা খারাপ কাজ তা বুঝতে পারি।

মূল্যবোধ

সমাজস্বীকৃত যেসব নীতিমালা সাধারণভাবে সমাজের মানুষকে কোন কাজ সঠিক আর কোন কাজ ভুল, সে সম্পর্কে ধারণা দেয় তাকে মূল্যবোধ বলে।

এই মূল্যবোধগুলোর মাধ্যমে আমরা সমাজ কী গ্রহণ করবে ও করবে না সে সম্পর্কে জানাতে পারি। মূল্যবোধগুলো সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে। সমাজ বিভিন্নভাবে মানুষকে এসব নীতির সাথে প্রতিনিয়ত পরিচিত করায় এবং মানার পরিবেশ তৈরি করে, কখনো মানতে বাধ্য করায়। নানা সমাজে গ্রহণযোগ্য মূল্যবোধগুলো আমরা সেখানকার প্রচলিত নানান কথা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচনে খুঁজে পাই। চলো এবার আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রবাদগুলো পড়ি-

আফ্রিকার প্রবাদ

- যে নির্দেশ মানতে চায় না, সে নেতৃত্ব দিতেও পারে না।
- সংকটের সময় বুদ্ধিমানরা সাঁকো তৈরি করে আর বোকারা বানায় দেওয়াল।
- যদি দ্রুত যেতে চাও তাহলে একা হাঁটো, আর যদি দূরে যেতে চাও তাহলে সকলকে সঙ্গে নিয়ে আগাও।

চীন দেশের কিছু প্রবাদ

- যে ফুল উপহার দেয় তার হাতে কিছুটা সুগন্ধ লেগে থাকে।
- কাউকে একটা মাছ দেওয়ার মানে তুমি তাকে এক দিন খেতে দিলে, কাউকে মাছ ধরা শিখিয়ে দিলে তুমি তাকে সারা জীবন খাবার সুযোগ করে দিলে।
- তুমি যা করো তা যদি কাউকে জানতে দিতে না চাও, তাহলে সে কাজ কখনো করো না।

আমাদের দেশেও এ রকম প্রবাদবাক্য আছে

- দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।
- ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
- সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ওরা প্রবাদবাক্যগুলোর অর্থ এবং এর মধ্যকার মূল্যবোধ নিয়ে দলে আলোচনা করল। কোনোটায় পারস্পরিক সহযোগিতা, কোনোটায় সময়ানুবর্তিতার মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে। মিলি বলল, দারুণ মজার তো! আমরা যদি নানান দেশের প্রবাদবাক্যগুলো জানতে পারি, তাহলে সেই সমাজের মূল্যবোধগুলো সম্পর্কেও অনেক কিছু জানতে পারব।

প্রবাদবাক্য	মূল্যবোধ
সংকটের সময় বুদ্ধিমানরা সাঁকো তৈরি করে আর বোকারা বানায় দেওয়াল।	পারস্পরিক সহযোগিতা
তুমি যা করো তা যদি কাউকে জানতে দিতে না চাও, তবে সে কাজ কখনো করো না।	সততা/সচ্ছতা/জবাবদিহিতা
দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।	একাত্মতা

এরপর খুশি আপা ওদের দলে ভাগ হয়ে বিদেশে থাকা পরিচিতজন, ইন্টারনেট, আশপাশের মানুষ, বিভিন্ন বই ইত্যাদি উৎস থেকে প্রবাদবাক্য সংগ্রহ করে এর মধ্যকার মূল্যবোধগুলো খুঁজে বের করতে বললেন। ওরা কাজটি করে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে উপস্থাপন করল।

চলো, আমরাও ওদের মতো বিভিন্ন উৎস থেকে নানান দেশের প্রবাদবাক্য সংগ্রহ করে মূল্যবোধগুলো খুঁজে বের করে উপস্থাপন করি।উপস্থাপনা শেষ হলে খুশি আপা বললেন, আমি খুবই খুশি হয়েছি যে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ খুঁজে বের করতে পেরেছি। আমরা বেশ কিছু মূল্যবোধ খুঁজে বের করেছি যা আমাদের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হচ্ছে-

একতা, দেশপ্রেম, পরমতসহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, শ্রদ্ধা, সততা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পরোপকার, দয়া, শুদ্ধাচার প্রভৃতি

মামুন বলল, কিন্তু আপা আমার তো রীতিনীতি আর মূল্যবোধ অনেকটা একই রকম মনে হচ্ছে!

রূপা বলল, আমার মনে হয়, সামাজিক রীতিনীতি কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা ক্ষেত্রে কী আচরণ করতে হবে তা জানতে সাহায্য করে যেমন, হাঁচি-কাশির সময় মুখে রুমাল অথবা টিস্যু দেওয়া কিংবা কনুই চেপে ধরা, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা ইত্যাদি। আর মূল্যবোধ সাধারণভাবে কোন কাজ বা আচরণ ভালো আর কোনটা খারাপ সে সম্পর্কে ধারণা দেয়। যেমন, সততা, পরোপকার ইত্যাদি।

খুশি আপা বললেন, একদম ঠিক বলেছ! নিচের সারণি থেকে আমরা দেখে নিই সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য কী।

ক্রম	সামাজিক রীতিনীতি	মূল্যবোধ
১.	কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সমাজের মানুষ কীভাবে আচরণ করবে তার আদর্শ।	কিছু নীতিমালা যা কোনো একটি সমাজের মানুষের জন্য কোন ধরনের আচরণ বা কাজ মূল্যবান বা ভালো আর কোন ধরনের আচরণ মন্দ তা বুঝতে সাহায্য করে।
২.	কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট আচরণের নির্দেশনা।	আচরণের সাধারণ নীতিমালা।
৩.	সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত আচরণ।	কোনো একজন ব্যক্তির মেনে চলা নীতি বা বিশ্বাস।
৪.	একেক সমাজে একেক রকম রীতিনীতি দেখা যায়।	একেক ব্যক্তি একেক রকম মূল্যবোধে বিশ্বাসী হয় ।
৫.	উদাহরণ: কারো সাথে দেখা হলে কুশল বিনিময় করা, বড়দের শ্রদ্ধা করা, হাঁচি-কাশি দেবার সময় মুখে হাত দেওয়া, কারো সাথে ধাক্কা লেগে গেলে দুঃখ প্রকাশ করা প্রভৃতি।	উদাহরণ: সততা, দয়া, শ্রদ্ধা, পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি।

খুঁজে দেখি রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ

খুশি আপা বললেন, আমরা আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় নানা রকম রীতিনীতি আর মূল্যবোধের দেখা পাই। অরিত্রর গল্পটা থেকে চলো আমরা বিষয়টা আরও একবার বোঝার চেষ্টা করি।

স্কুলের প্রথম দিন

অরিত্র আজ প্রথম স্কুলে যাবে। মা ওকে সকাল থেকে তৈরি করছেন আর নানা রকম উপদেশ দিচ্ছেন। বলেছেন স্কুলে যাওয়ার আগে বাড়ির বড়দের সালাম করতে। স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের সালাম দিতে। অরিত্র দাদিকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করার পর দাদি ওকে বিশ টাকার একটা নোট দিলেন। আর বললেন, দোয়া করি, অনেক বড় হও। তখনি টিকটিকিটা টিকটিক করে উঠল। দাদি তখনই বললেন, ঠিকঠিকঠিক আর আঙুল দিয়ে টেবিলে তিনবার টোকা দিলেন। অরিত্রকে উপদেশ দিলেন, স্কুলে ভদ্র আর শান্ত হয়ে থাকবে। কারো সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করবে না। টিফিনের কৌটা ব্যাগে ভরতে ভরতে মা বললেন, বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খেয়ো। জিনিসপত্র ডান হাত দিয়ে দেওয়া-নেওয়া করবে। বাম হাত দিয়ে কাউকে কিছু দিয়ো না। এতসব নিয়ম-কানুনের কথা শুনে অরিত্রর একটু ভয় ভয় করতে লাগল। বাবার সঙ্গে বের হওয়ার আগে অরিত্র সবাইকে বিদায় জানাল। স্কুলে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত বাবাও ওকে যতটা সম্ভব উপদেশ দিলেন। অরিত্রর ভয়টা আরও বেড়ে গেল। তবে স্কুলের গেট দিয়ে ঢোকার সময় দারোয়ান চাচা ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসায় ওর তক্ষুনি স্কুলটাকে খুব আপন লাগতে শুরু করল।

খুশি আপা বললেন, চলো, আমরা খুঁজে দেখি এই গল্পের মধ্যে কী কী রীতিনীতি আর কী কী মূল্যবোধ খুঁজে পাই।

রীতিনীতি	মূল্যবোধ

চলো, আমরাও ওদের মতো কাজটি করি

নির্বাচন ও মূল্যবোধ

পারি। গনেশের আজ খুব মন খারাপ। খুশি আপা জিজ্ঞেস করলেন ”তোমার আজ কী হয়েছে?” গনেশ বলল, “তার এক প্রতিবেশীর একটি বিড়াল ছানা মারা গেছে।” সাবা জিজ্ঞেস করল, ”কীভাবে?” গনেশ বলল, গতকালই জন্ম নিয়েছে ছানাটি। মা বিড়ালের সাথে বিড়াল ছানাটি রাস্তার পাশে একটি গাড়ির নীচে বসেছিল। গাড়ির ড্রাইভার অসচেতন হয়ে গাড়ির চাকা উঠিয়ে দেয় তার উপর। এ কথা শুনে সবার ভীষণ মন খারাপ হল। মিলি বলল, আমাদের চারপাশে এমন অনেক প্রাণী আছে যারা সচেতনতার অভাবে মারা যাচ্ছে। এই প্রাণীদের সংরক্ষণের দায়িত্ব নেওয়া দরকার। এজন্য আমাদের নতুন করে কমিটি করা দরকার।

সেদিনই ঠিক হলো, প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাব-কমিটি গঠন করা হবে সেখানে প্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণে তারা বিভিন্ন রকম কাজ করবে। এজন্য তারা নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিল। দিন-তারিখও ঠিক হলো।

সবার আলোচনার ভিত্তিতে প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাব-কমিটিতে কী কী পদ প্রয়োজন, তার তালিকা তৈরি হলো। নির্বাচনে কে কোন পদে মনোনয়ন চায়, তাদের নামেরও তালিকা হলো।

প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাব-কমিটির সদস্য পদের তালিকা
সভাপতি:
সহ-সভাপতি:
সাধারণ সম্পাদক:
কোষাধ্যক্ষ:
.... সম্পাদক:
.... সম্পাদক:
.... সম্পাদক:
সদস্য ১:
সদস্য ২:
সদস্য ৩:

খুশি আপা বললেন, নির্বাচন যে হবে, তার আয়োজন করবে কে? নির্বাচনের আয়োজন করার জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি করা হলো। যার নাম দেওয়া হলো নির্বাচন কমিশন। তারা নির্বাচনের প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ করল। ক্লাসের সবার নাম লিখে ভোটার তালিকা তৈরি করল। নির্বাচনের নিয়ম-কানুনও তৈরি করল। যার নাম হলো নির্বাচনি আচরণবিধি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

চলো, আমরাও নির্বাচনি আচরণবিধি জানি

- এমনভাবে প্রচার করতে হবে যেন শ্রেণি কার্যক্রম বিঘ্নিত না হয়
- নির্ধারিত জায়গার বাইরে পোস্টার লাগানো যাবে না
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী কেবল একটি করে ভোট দিতে পারবে। চলো আমরাও ওদের মতো কাজটি করি

নির্বাচন ঘিরে সারা স্কুলে একটা উৎসবের আমেজ! এবারের নির্বাচনে তিনটি প্যানেল অংশ নিচ্ছে। তাদের সুন্দর সুন্দর সব স্লোগান তৈরি হয়েছে।

আমরা প্রকৃতির সন্তান;

তাই প্রকৃতির যত্ন নেবো

প্রতিটি পাড়া মহল্লা এলাকা হবে বন্য প্রাণীর অভয়াশ্রম

অসহায় প্রাণীদের খাবার, চিকিৎসা সেবা ও আশ্রয়ের দায়িত্ব নেবো

নির্বাচনের জন্য পোস্টার, স্লোগান তৈরি, প্রচার-প্রচারণার জন্য গান গাওয়া, বক্তৃতা করায় সবার খুব উৎসাহ! নির্বাচনে অংশ নেওয়া দলগুলো নিজেদের নির্বাচনি ইশতেহারও বানিয়েছে। তাদের প্যানেল নির্বাচনে জয়ী হলে প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য কী কী কাজ করা হবে তার বর্ণনা এই ইশতেহারে লেখা আছে। নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি লিখে প্লাকার্ডও বানানো হয়েছে। টিফিনের সময় প্লাকার্ড হাতে মিছিল হয় রোজ।

অবশেষে নির্বাচনের দিন এসে গেল। ওই দিন নির্বাচন কমিশন প্রচার-প্রচারণা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। তারা প্রার্থীর প্রতীকসহ ব্যালট পেপার তৈরি করেছে।

প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাব নির্বাচন		
প্রার্থীর নাম	প্রতীক	সিল দেওয়ার স্থান
ক		
খ		
গ		

সবার মনেই আজ উৎসবের আনন্দ! শতভাগ ভোট পড়েছে! আজ সপ্তম শ্রেণির কেউ অনুপস্থিত নেই। সবাই সক্রিয় নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে।

ভোটগ্রহণ শেষ হলে স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় ভোট গণনা করা হলো। এক একজন বিজয়ী প্রার্থীর নাম

ঘোষণা হয়, আর সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে। সবার নাম ঘোষণার পর বিজয়ীদের অভিনন্দন জানানো হলো। সুন্দর একটা নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য শিক্ষকগণ ওদের প্রশংসা করলেন। যারা নির্বাচনে জিততে পারেনি তারাও বিজয়ীদের অভিন্দন জানাতে ভুলেনি।

প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাব-নির্বাচনে যারা বিজয়ী হয়েছে তাদের নামের তালিকা নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

চলো আমরাও ওদের মতো নিচের ধাপ অনুসরণ করে প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাবের নির্বাচনের আয়োজন করি।

- সবার আলোচনার ভিত্তিতে প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাব-কমিটিতে কী কী পদ প্রয়োজন, তার তালিকা তৈরি করা
- বিভিন্ন পদপ্রার্থীর একাধিক প্যানেল তৈরি করা
- নির্বাচন কমিশন গঠন করে তাদের নির্বাচনের নিয়ম-কানুন ও ব্যালট পেপার তৈরি করতে দেওয়া, নির্বাচনের আয়োজন করতে কমিশনকে সহযোগিতা করা
- স্লোগান, ইশতেহার, পোস্টার, প্লাকার্ড, গান ইত্যাদি তৈরি করে নির্বাচনি প্রচারণা করা
- নির্বাচন অনুষ্ঠান করে, ভোট দিয়ে কমিটি নির্বাচন করে, কমিটির সদস্যদের নাম নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দেওয়া

খুশি আপা বললেন, আমরা যেভাবে প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাবের কমিটি নির্বাচন করেছি, বাংলাদেশের আইনসভার সদস্য নির্বাচনও এভাবে হয়। বাংলাদেশের আইনসভাকে 'সংসদ' বলা হয়। তবে আমাদের নির্বাচন আর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে কিছু তফাতও আছে। সংসদ নির্বাচনে

- ভোট দিতে পারে কমপক্ষে আঠারো বছর বয়সি বাংলাদেশি নাগরিকরা
- রাজনৈতিক দল থেকে অথবা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যায়।
- বাংলাদেশকে তিন শত নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করা হয়। প্রতিটি এলাকা থেকে একজন করে মোট ৩০০ জন সংসদ সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন।
- নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা সংবিধান অনুযায়ী সংরক্ষত নারী আসনে পঞ্চাশজন নারী সদস্যকে নির্বাচন করেন। এভাবে আমাদের জাতীয় সংসদে মোট আসন সংখ্যা হল ৩৫০। সংসদ সদস্যরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীদের নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি।

মাহবুব জানতে চাইল, আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্লাব কমিটি গঠন করে ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনা করব। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে কী হয়? জবাবে খুশি আপা বললেন, সংসদ অর্থাৎ আইনসভার সদস্যদের বাছাই করা হয়। এভাবে নির্বাচিত ৩০০ সদস্যের সমন্বয়ে আইনসভা বা সংসদ গঠিত হয়।

আয়েশা বলল, চলো, আমরা প্রথমে পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন বই, ইন্টারনেট, শিক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তি যারা এ বিষয়ে অনেক তথ্য জানেন তাদের সহযোগিতা নিয়ে অনুসন্ধানী কাজ করি। মিল-অমিলের ছক ব্যবহার করে দেখতে পারি আমাদের ক্লাবের নির্বাচন আর জাতীয় নির্বাচনের মধ্যে কোথায় মিল আর কোথায় অমিল আছে।

খুশি আপা বোর্ডে নিচের ছকটি আঁকলেন। বললেন, ছকের বামদিকে আমরা আমাদের নির্বাচন নিয়ে লিখব আর ডানদিকে লিখব জাতীয় নির্বাচনের কথা। আর যে বিষয়টি দুই নির্বাচনেই এক রকম সেটি বসাব মাঝখানে। এ রকম ছককে ‘ভেন রেখাচিত্র’ বলে।

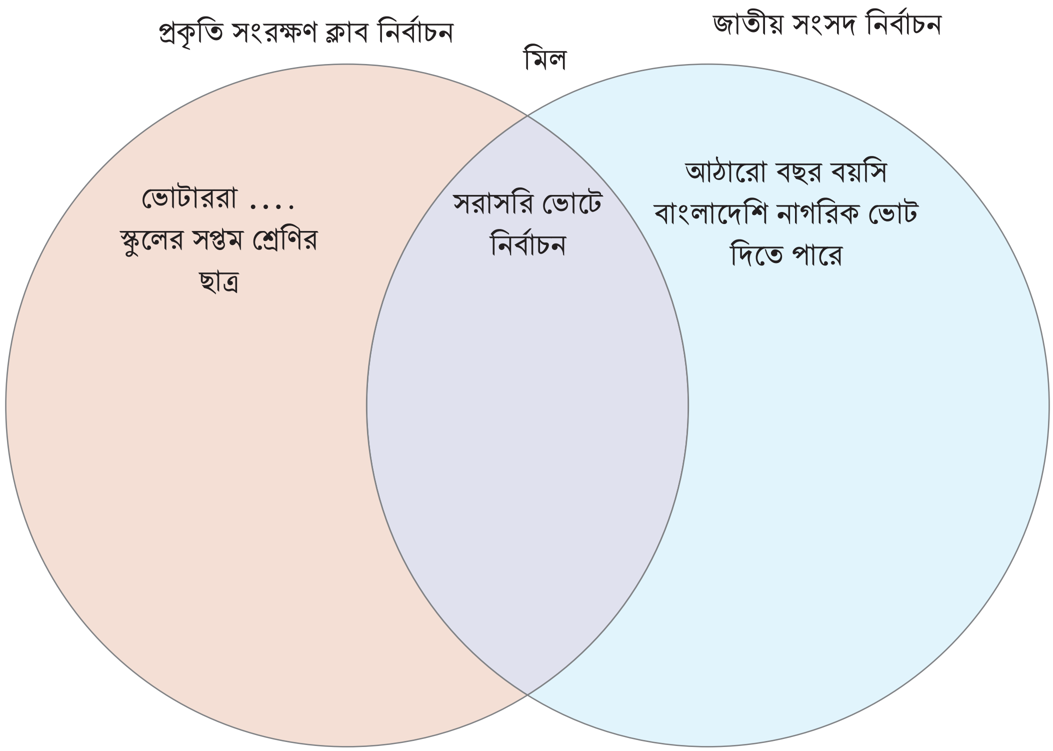

চলো, আমরাও ওদের মতো দুটো নির্বাচনের মধ্যকার মিল-অমিলের ছকটি পূরণ করি।

সালমা বলল, সংসদ নির্বাচন আর আমাদের নির্বাচনের মধ্যে যত তফাতই থাক, একটা মিল কিন্তু দারুণ! দুই জায়গায়ই ভোটের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থী নির্বাচন করা যায়। তাতে সবার মতামত দেওয়ার সুযোগ হয়। সেই প্রার্থীরা সবার পক্ষ থেকে সংসদে কথা বলেন। অর্থাৎ সবারই মতামত প্রকাশের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

ছায়া সংসদে 'পথের প্রাণী' বিষয়ক আইন

আনুচিং বলল, আমি খবরে দেখেছি, নওগাঁর পাহাড়পুর জাদুঘর এলাকায় কিছু শিয়াল আছে। শিয়াল তো এখন বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী। ওই জাদুঘরের কাস্টডিয়ান ফজলুল করিম আরজু তার সহকর্মীদের নিয়ে শিয়ালগুলোকে প্রতিদিন খাবার দেন। তাঁরা বাচ্চা শিয়ালদের দেখেশুনে রাখেন। ফাতেমা আনাইয়ের কথায় সায় দিতে যাচ্ছিল, এরমধ্যে গৌতম বলল, শিয়াল খুঁজে পাওয়া তো মুশকিল! শিহান বলল, শিয়াল না পাই, পথে পথে তো অনেক অসহায় কুকুর থাকে।

ওদের খাবার, আশ্রয়, চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই। আমরা ওদের জন্য কাজ করতে পারি। হাস্না বলল, আমাদের এলাকায় একটা বিড়াল থাকে। সে সবার বাড়ি থেকে খাবার চুরি করে খায়। সে জন্য লোকের হাতে মারও খায়।
সেদিন পাশের বাড়ির একজন বলছিল, "ধরতে পারলে বিড়ালটাকে মেরেই ফেলব। " ওই বিড়ালটাকে কি আমরা রক্ষা করতে পারি? সালমা বলল, প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাবের মাধ্যমে আমরা পথের বিড়াল-কুকুরদের সাহায্য করতে পারি। সুমন বলল, আমাদের পাশের বাড়িতে একটা পাখিকে খাঁচায় আটকে রেখে বাড়ির লোকজন বেড়াতে চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে পাখিটা মরে গেছে। আমরা খাঁচার পাখিদেরও রক্ষা করতে পারি। গণেশ বলল, পথের বিড়াল-কুকুর নোংরা জিনিসপত্র খায়, ওরা জীবাণু ছড়ায়। সুযোগ পেলে কামড়েও দিতে পারে। আমরা বরং খাঁচার পাখিকে বাঁচাতে কাজ করি। গণেশের কথায়ও কয়েকজন সায় দিল।

খুশি আপা যখন ক্লাসে এলেন, তখনও ওদের কথা চলল। খুশি আপা বললেন, আমরা তো ক্লাবের মাধ্যমেই এই সংকটের সমাধান করতে পারি! শফিক বলল, আপা, আমরা কোন কাজটা করব সেটা জানা থাকলে ক্লাব কাজ করতে পারত। কিন্তু পথের কুকুর-বিড়ালকে নিয়ে কাজ করব নাকি খাঁচার পাখি নাকি গাছপালা, পুকুর, নদী সংরক্ষণ— সেই সিদ্ধান্তই তো এখনও নিতে পারিনি। খুশি আপা বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই টেলিভিশনে জাতীয় সংসদের অধিবেশন দেখেছ? আমরা ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে জাতীয় সংসদের আদলে 'ছায়া সংসদ' তৈরি করতে পারি। সেখানে পথের কুকুর বিড়ালকে আমরা সাহায্য করব নাকি খাঁচার পাখি, গাছপালা, পুকুর, নদী সংরক্ষণ কাজ করব সেই বিষয়টি বিল আকারে আসতে পারে। ওরা দারুণ উৎসাহ প্রকাশ করল। খুশি হয়ে খুশি আপা বললেন, এবার তাহলে সংসদে বসে আমরা নতুন আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেব। আমাদের এই শ্রেণিকক্ষই হবে আইনসভা।

ক্লাব নির্বাচনে বিজয়ীদের মধ্য থেকে সাধারণ সম্পাদককে করা হলো রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি ক্লাবের নির্বাচিত সভাপতিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাব নিয়োগ দিল। প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রমুখ মনোনয়ন দিলেন। রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ অনুমোদন করেন। একজন স্পিকারও নিযুক্ত হলো। বিজয়ী প্যানেলের বাকিরা সরকারি দলের সাংসদ আর অন্যরা বিরোধী দলের সাংসদ হলো। সাবা বলল, বাহ্! আমরা তো সরকার তৈরি করে ফেললাম!

কয়েকজন সংসদ সদস্য মিলে আলোচনার ভিত্তিতে “প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাব যে-কোনো গৃহহীন প্রাণীকে সাহায্য করবে, এমনকি যদি কোনো মানুষ তার পোষা প্রাণীর ঠিকমতো যত্ন না নেয়, সেক্ষেত্রেও ব্যবস্থা নেবে” এই মর্মে আইনের একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করল। এরপর বিরোধী দলের একজন সদস্য আইনের খসড়াটি সংসদে বিল আকারে উপস্থাপন করল। সরকারি ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল। সবশেষে স্পিকার মৌখিক ভোটের আয়োজন করলেন। কণ্ঠভোটে “হ্যাঁ” জয়যুক্ত হলো।

আইনটি লিখিতভাবে পেশ করা হলে রাষ্ট্রপতির তাতে স্বাক্ষর করলেন। এভাবে প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাবের একটি আইন তৈরি হলো।আইনটি প্রণীত হওয়ার পর পথের কুকুর-বিড়াল কিংবা খাঁচার পাখি— এদের নিয়ে কাজ করতে ওদের আর কোনো বাধা থাকল না। তবে আইনে একটি শর্তও রয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বড়দের পরামর্শ নিতে হবে এবং সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।এরপর ওরা দলগতভাবে নিচের ছক ব্যবহার করে সারা বছর কী কাজ করবে তার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করল

ক্রম	কাজের বিবরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	এলাকায় যাদের সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে	কোন এলাকায় কাজটি করা হবে	সময়কাল
	বন্য প্রাণীদের আবাস ও খাবারের প্রাকৃতিক উৎস নিশ্চিত করার জন্য গাছ লাগানো				
	বাড়ির বাড়তি খাবার পথের প্রাণীদের দেওয়ার জন্য প্রতিটি বাড়ির সামনে একটি করে পানির পাত্র ও খাবারের পাত্র রাখা				
	শিশু ও অসুস্থ প্রাণীদের জন্য সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা				
	পশু চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে বিনা খরচে/স্বল্প খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা				

	পথের প্রাণীদের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ দূর করতে ও খাঁচার পাখিকে অবমুক্ত করতে জনসচেতনামূলক পোস্টার তৈরি করা				
	খাঁচার পাখি যারা বিক্রি করে তাদের এই কাজ থেকে নিবৃত করার চেষ্টা করা				

সংবিধানের ধারণা

খুশি আপা আরও বললেন, ক্লাব পরিচালনার জন্য কিছু নিয়ম-কানুন থাকলে ভালো হয় তাই না?

রাজিব বলল, জ্বি আপা, এই নিয়ম-কানুনগুলো লিখিতভাবে থাকলে ভালো হয়।

খুশি আপা বললেন, তাহলে সবার অংশগ্রহণে ক্লাবের জন্য কিছু নিয়ম ঠিক করে ফেলি।

ক্লাব পরিচালনার জন্য অবশ্য পালনীয় নিয়ম

খুশি আপা জিজ্ঞেস করলেন, এই নিয়মগুলো না থাকলে কী হতে পারে?

ফ্রান্সিস বলল, ক্লাবের মাধ্যমে ঠিক মতো কাজ পরিচালনা করা যবে না।

খুশি আপা বললেন, ঠিক তাই। আমরা ১৯৭১ সালে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি লাভের জন্য যুদ্ধ করেছি। লক্ষ প্রাণ ও রক্তের বিনিময়ে একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। তাহলে এই দেশটি পরিচালনার

জন্যও কিছু নিয়ম-কানুন থাকা প্রয়োজন। তাই না?

ওমেরা বলল, জ্বি আপা, আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নিয়ম-কানুন ও কর্তব্য লিখিত আকারে রয়েছে সংবিধানে।

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছো ওমেরা। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে জানা যায় সংবিধানের মাধ্যমে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। পরবর্তীতে সেই বছর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস থেকে বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর হয়।

প্রতিষ্ঠানে মূল্যবোধ

খুশি আপা জানতে চাইলেন, নির্বাচন আর ছায়া সংসদের অভিজ্ঞতা কেমন লাগল? ওরা বলল, আমাদের খুব ভালো লেগেছে! দারূণ মজা হয়েছে!! আচ্ছা, আমরা যে নির্বাচন করলাম, সরকার গঠন করলাম, ছায়া সংসদে বিল পাশ করলাম, সেখানেও কি মূল্যবোধ, রীতিনীতি কাজ করেছে? খুঁজে দেখি। ওরা খুঁজে বের করে একটা তালিকা তৈরি করল।

সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রীতিনীতি, মূল্যবোধ

ক্রম	কাজের বিবরণ	দায়িত্বশীল সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নাম	সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের নাম
১	অন্যকে মত প্রকাশ করতে দেওয়া	......	গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
২	নিজের মত প্রকাশ করা	......	...
৩	সবার মতকে সম্মান করা	......	....
৪	অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা	......	
৫			
৬			
৭			
৮			

ওপরের ছক ব্যবহার করে আমরাও আমাদের নির্বাচন, ছায়া সংসদের অভিজ্ঞতা, রাষ্ট্র ও সরকার সংক্রান্ত কাজ থেকে পাওয়া মূল্যবোধগুলোর একটা তালিকা তৈরি করি।

সালমা বলল, আপা, টেলিভিশনের সংসদ অধিবেশনে আমরা দেখেছি সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যরা কথা বলেন। কিন্তু আমাদের ছায়া-সংসদে তো কোনো সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য ছিল না! খুশি আপা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, সংসদে যদি কোনো মেয়েই না থাকত তাহলে কেমন হতো? ওরা সবাই বলল, যে, ব্যাপারটা মোটেও ভালো হতো না। "কেন ভালো হতো না?" খুশি আপার প্রশ্ন। ওরা বলল, কেবল ছেলেরা অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে, মেয়েরা পাবে না, এটা অন্যায়। ছেলে-মেয়ে সবারই সবকিছুতে সমান অধিকার আছে।

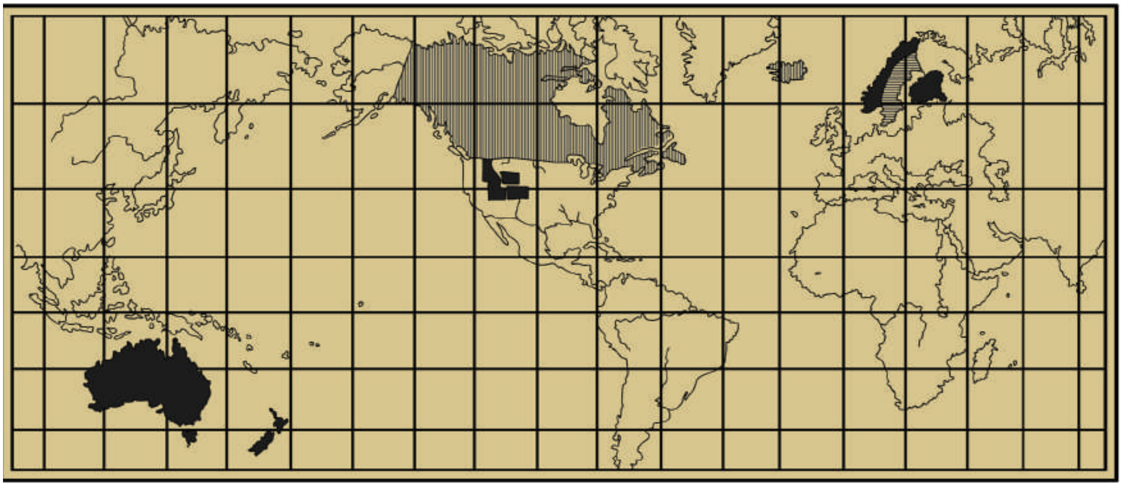

১৯০৮ সালেও কেবল পৃথিবীর কালো চিহ্নিত অংশটুকুতে সমস্ত নারীদের ভোটাধিকার ছিল

একসময় অস্ট্রেলিয়ায় আইন অনুযায়ী যাদের গায়ের রং সাদা কেবল তারাই ভোট দিতে পারত। এ রকম অদ্ভুত আইন কেন! ওরা অবাক হলো। খুশি আপা বললেন, খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছ। আচ্ছা মনে আছে তো আইন কারা তৈরি করে? কীভাবে তৈরি করে?

সিয়াম বলে উঠল, আইনসভায় তৈরি হয়! আইনসভার সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে!

গৌতম বলল, কিন্তু আইনসভার সদস্যরা তো সমাজের সবার মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন! মানুষ তাহলে অমন প্রার্থীদের ভোট দিত কেন? সালমা বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল, তার মানে কি তখনকার মানুষের সামাজিক রীতিনীতি-মূল্যবোধও ঐ রকম ছিল! তখন খুশি আপা বললেন, চলো তাহলে আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক রামমোহন রায় এর জীবনীর অংশবিশেষ পড়ে দেখি মানুষের মাঝে সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কীভাবে কাজ করে? আর কীভাবে তা সময়ের সাথে বদলে যায়।

রাজা রামমোহন রায়

তোমরা হয়তো রাজা রামমোহন রায়ের নাম শুনেছ। তাঁকে বলা হয় প্রথম আধুনিক বাঙালি। প্রচলিত অর্থে তিনি কোনো রাজা ছিলেন না এ উপাধি তাঁর অর্জিত। তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৭৭২ সালে হুগলি জেলার এক বনেদি ব্রাহ্মণ পরিবারে। প্রথমে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখলেও নিজের আগ্রহে ফারসি ও আরবি ভাষা শেখেন। এই দুই ভাষা তিনি এত ভালো রপ্ত করেছিলেন যে অনেকে ঠাট্টা করে তাঁকে ডাকতো

'মৌলভী রামমোহন'। তিনি হিন্দু, খ্রিষ্টান ও মুসলিম ধর্মশাস্ত্র ও পড়েছিলেন। তবে এই দূরদর্শী তরুণের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে ভবিষ্যতে উন্নতির জন্য ইংরেজি ভাষা শেখা জরুরি। ফলে রামমোহন এক ইংরেজের কাছে ভালোভাবে ভাষাটি আয়ত্ত করেন। তিনি দেশে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের পক্ষে কাজ করেছেন। তার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, রামমোহন রায় আধুনিক বাঙালি সমাজের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন।
এই সময় ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজে একটি অত্যন্ত অমানবিক কুপ্রথা চালু ছিল। এটি হলো সতীদাহ বা সহমরণ। এই ব্যবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও তার চিতায় পুড়িয়ে মারা হতো। রামমোহন এই প্রথাটি বন্ধে উদ্যোগী হন। তখন বাংলায় ইংরেজ শাসন চলছে, তাঁরা প্রথাটির বিরুদ্ধে থাকলেও এদেশীয় একটি প্রচলিত ব্যবস্থা বদলানোর উদ্যোগ নিজেরা গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু রামমোহন সতীদাহ প্রথা বন্ধে ইংরেজ শাসকের সহযোগিতা কামনা করেন।

এক ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেও রামমোহনের ভাবনায় এই প্রথাবিরোধী বিদ্রোহী ভাব তৈরি হওয়ার পেছনে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কাজ করেছে। তাঁর দাদা জগমোহন রায়ের স্ত্রী ছিলেন অলকমণি দেবী। রামমোহন এই বউদিকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন। দাদা জগমোহন অকালে মারা গেলে সামাজিক চাপে বউদি অলকমণিকে চিতায় পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা হয়। তিনি নিজে সহমরণ চাননি। খবর পেয়ে রামমোহন বউদিকে বাঁচাবার জন্য ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি পৌঁছবার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। তবে ঘটনাটি তার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

এই ঘটনা তুলে ধরে কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন- "বউদির চিতার পাশে পাথরের মূর্তির মতো এসে দাঁড়ালেন রামমোহন। এক চোখে আগুন, আর এক চোখে জল নিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, জীবনে যে-কোনো মূল্যে ভারতবর্ষ থেকে নারী হত্যার এই পৈশাচিক প্রথা তিনি চিরদিনের মতো লোপ করে দেবেন।"

রক্ষণশীল হিন্দু পন্ডিতগণ তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে, তবে রামমোহন ছিলেন উদারচিত্তের সাহসী মানুষ। সৌভাগ্যের বিষয় সেই সময় ভারতবর্ষে গভর্নর জেনারেল হিসেবে এসেছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক। তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস আর সত্যনিষ্ঠার জন্যে রামমোহনকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। সতীদাহ প্রথা বন্ধের উদ্যোগকে কেন্দ্র করে তখন হিন্দু সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অনেক রাজা-মহারাজা এর বিরুদ্ধে থাকলেও কোনো কোনো শাস্ত্রজ্ঞানী পন্ডিত তাঁর পক্ষে ছিলেন। ফলে রক্ষণশীল সমাজের ব্যাপক প্রচারণার মধ্যেও রামমোহনের জয় হলো। ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে আইন পাশ হয়ে গেল। এ আইন বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়তো আরও কয়েক বছর সময় লেগেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ রকম একটি অমানবিক কুপ্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছিল।

রাজা রামমোহন রায়কে এ উপমহাদেশের একজন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করার আরও অনেক কারণ রয়েছে। বিলেতে অবস্থানের সময় তিনি ইংল্যান্ডের রিফর্ম বা সংস্কার বিলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের অধিকারের পক্ষে অনেকগুলো সুপারিশ তুলে ধরেছিলেন। আইনসভার ইংরেজ সদস্যদের অনেকে তাঁকে সমর্থন দিয়েছিলেন। তিনি এদেশে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষার প্রসারের বিশ্বাস করতেন। নারীদের জন্যে আধুনিক শিক্ষার আয়োজনেও তাঁর ছিল অগ্রণী ভূমিকা। রামমোহন নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং মেয়েরা যেন সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে তার পক্ষেও কাজ করেছেন। এছাড়া বাংলা গদ্যের সূচনাকারীদের অন্যতম একজন রাজা রামমোহন রায়।

এরকম ঘটনা শুধু এই বাংলায় ঘটেনি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তনে অনেকেই আত্মত্যাগ করেছেন। এরকম একজন হচ্ছেন জোয়ান অব আর্ক। সেইসময় ইউরোপে নারীদের যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। জোয়ান অব আর্ক পুরুষ বেশে যুদ্ধ পরিচালনা কর যুবরাজ চার্লসকে সিংহাসনে বসাতে ভূমিকা রাখেন। সেটি ১৪২৯ সালের কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছুদিন পর তিনি আরেক দলের হাতে ধরা পড়েন। এরা তাকে শত্রু বাহিনীর হাতে তুলে মৃত্যুদণ্ড দেয়।

অনুশীলনী

রামমোহন রায় ও জোয়ান অব আর্ক এর জীবনী পড়া শেষ হলে ওরা দলগতভাবে নিচের ছক ব্যবহার করে সামাজিক রীতিনীতি কীভাবে পরিবর্তন হলো তার প্রক্রিয়াটি নিজের ভাষায় লিখে উপস্থাপন করল।

কীভাবে সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তিত হয়?

এ পর্যায়ে খুশি আপা বললেন, আচ্ছা চলো তাহলে আমরা এ বিষয়ে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করি। হুর রে!! সবাই খুশি হয়ে উঠল। তারপর সবাই মিলে বতর্কের বিষয় ঠিক করল।

বিতর্কের বিষয়

কেবল আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমেই সম্ভব সব মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

সব মানুষের মতামতের কোনো গুরুত্ব নেই, কেবল বুদ্ধিমানের মতামতই শোনা উচিত।

....

....

বিতর্ক শেষে খুশি আপা যারা বিতর্কে অংশগ্রহণ করেনি তাদের মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের আহ্বান করলেন। সে আলোচনায় ওরা সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আইন, সরকার— এসবের বদল নিয়ে মুক্ত আলোচনা করল।

আনাই বলল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক কাঠামোয় কত রকম বদল হয়! এই বদলগুলো হয় কী করে?

মিলি বলল, আমাদের এলাকায় একটা মেয়ের বিয়ের কথা হয়েছিল। ওর বাবা-মা রাজিও ছিল। কিন্তু মেয়েটার বয়স মাত্র পনেরো বলে বিয়েটা আর দেয়নি। কারণ ওর চাচা বাধা দিয়েছেন। বলেছেন, এখন বাল্যবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ। যখন আইনে বাধা ছিল না তখন অনেক ছোটবেলায় ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। সিয়াম বলল, আচ্ছা, তাহলে তো আইন-কানুনও মূল্যবোধ ও রীতিনীতিকে প্রভাবিত করে!

খুশি আপা বললেন, সমাজের অগ্রসরমান অংশের আন্দোলনের ফলেও মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন হয়। আর চিন্তার পরিবর্তন থেকে রীতিনীতি আর মূল্যবোধেও পরিবর্তন আসে। অতীতকাল থেকেই অনেক মানুষ আমাদের সামাজিক রীতিনীতি আর মূল্যবোধের পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ। তারা অনেক রীতি নীতি বদলে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

আলোচনা শেষে ওরা ঠিক করল, বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে দেশ-বিদেশের সমসাময়িক ঘটনা এবং অতীত ইতিহাস থেকে সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ে ওরা তথ্য সংগ্রহ করবে। ওরা তারা নিচের ছকে লিখিত প্রশ্নের মতো প্রশ্ন তৈরি করল। তারপর তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করল।

রাষ্ট্র, সরকার, আইন কীভাবে রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে?

রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কীভাবে রাষ্ট্র, সরকার, আইনকে প্রভাবিত করে?

....

....

প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা

অবস্থান অনুযায়ী ভূমিকা

শুক্রবারের সকালবেলায় স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা হবে। কে কে যাবে তাই নিয়ে ক্লাসে আলাপ হচ্ছিল। প্রায় সবাই যেতে চায়। হঠাৎ সুমন কাগজ দিয়ে একটা মস্ত গোঁফ বানিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, আমি যেখানে খুশি যেতে পারি, কারোর অনুমতি লাগে না। ওর ভাবভঙ্গি দেখে বন্ধুরা সব হেসেই কুটিকুটি! সুমন উচ্চস্বরে বলল, এত হাসির কী হলো? ধমক শুনে ওরা আরও জোরে হেসে উঠল। তবে সবাই স্বীকার করল, সুমনকে দারুণ মানিয়েছে! গণেশ বলল, এ রকম গোঁফ লাগিয়ে সত্যি সত্যি বাবার মতো বড় হওয়া গেলে আমিও লাগাতাম।

এই সময় খুশি আপা এলেন। তিনি বললেন, ছোটবেলায় আমিও এ রকম ভেবেছি। খুশি আপা ওদের ফুটবল মাঠের ফরমেশনের একটা ছবি দেখলেন। এখানে এক দলের খেলোয়াড়দের পজিশন সাজানো হয়েছে।

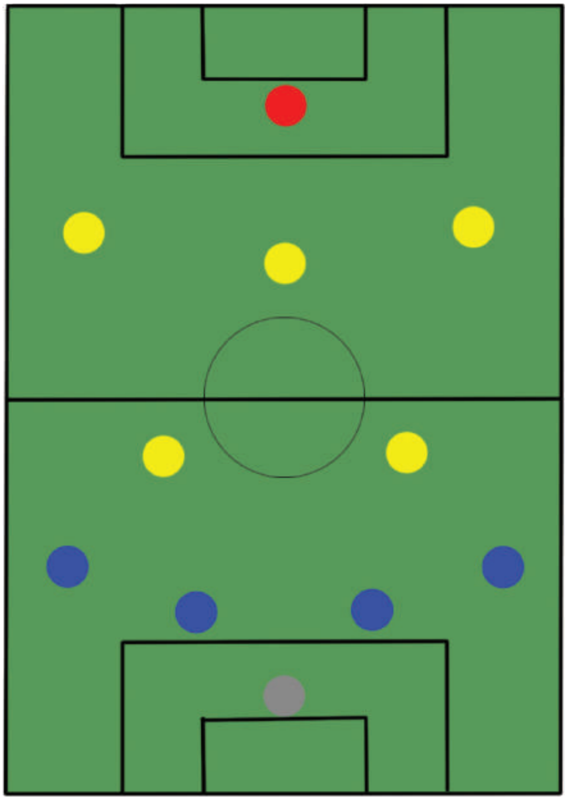

চিত্র: ফুটবল মাঠ

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে গোলরক্ষকের অবস্থান কোথায়? আনাই জবাব দিল, গোলরক্ষকের অবস্থান নিজেদের গোলপোস্টের সামনে। খুশি আপা বললেন, আর সেন্টার ফরোয়ার্ডের অবস্থান? হাস্না বলল, সেন্টার ফরোয়ার্ডের অবস্থান বিপক্ষ দলের গোলপোস্টের কাছে। খুশি আপা বললেন, চমৎকার! এবার বলো, ফুটবল খেলায় গোলরক্ষকের ভূমিকা কী? মামুন বলল, বিপক্ষ দলকে গোল দিতে না দেওয়া। “বাহ্! সেন্টার ফরোয়ার্ডের ভূমিকা কী, বলো তো?” খুশি আপা আবার প্রশ্ন করলেন। মাহবুব বলল, প্রতিপক্ষের জালে গোল দেওয়া।

এবারে খুশি আপা বললেন, যদি এমন হয়, খেলার সময় এরা যার যার অবস্থানে থাকল ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ গোলরক্ষকের মনে হলো, “আর কত গোল ঠেকাব! এবার বরং একটা গোল দিই।” অন্যদিকে সেন্টার ফরোয়ার্ডের মনে হলো, “সারা জীবন কি কেবল গোলই করে যাব! এবার বরং দুএকটা গোল ঠেকাই।” তারা তখন নিজেদের ভূমিকা বদলে ফেলল, তাহলে কেমন হবে? তিনি বোর্ডে একটা ছক আঁকলেন

	অবস্থান	মূল ভূমিকা	পরিবর্তিত ভূমিকা
গোলরক্ষক	নিজেদের গোলপোস্টের সামনে	গোল দিতে বাধা দেওয়া	গোল দেওয়া
সেন্টার ফরোয়ার্ড	প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের সামনে	গোল দেওয়া	গোল দিতে বাধা দেওয়া

তারপর বললেন, আবার যদি অন্যরকম হয়। তারা দুজনই ভাবল, “এক জায়গায় আর কত খেলব! যাই, একটু অন্যদিকে খেলি।” গোলরক্ষক আর সেন্টার ফরোয়ার্ড দুজনে দুজনার অবস্থান অদল বদল করল কিন্তু তাদের ভূমিকা ঠিক থাকল। তাহলেই বা কী ঘটবে? তিনি আরও একটা ছক আঁকলেন।

	মূল অবস্থান	পরিবর্তিত অবস্থান	ভূমিকা
গোলরক্ষক	নিজেদের গোলপোস্টের সামনে	প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের সামনে	গোল দিতে বাধা দেওয়া
সেন্টার ফরোয়ার্ড	প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের সামনে	নিজেদের গোলপোস্টের সামনে	গোল দেওয়া

ছক দুটো দেখে ওরা হেসে ফেলল। আদনান বলল, শুক্রবারের খেলায় যদি এ রকম ঘটনা ঘটে তাহলে কী ভীষণ কাণ্ড হবে! সালমা বলল, অত কাণ্ডের কোনো দরকার নেই। যে যার অবস্থানে থেকে নিজের ভূমিকা ঠিকঠাক পালন করলে আমরা মজা করে খেলা দেখতে পারব।

আমরাও ছক দুটো ভালো করে দেখি আর আলোচনা করি, ইচ্ছেমতো অবস্থান কিংবা ভূমিকা বদলালে কী ঘটনা ঘটবে।

ছোটবেলার অবস্থান ও ভূমিকা বড় হলে বদলায়

খুশি আপা বললেন, অবস্থান আর ভূমিকা বদল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা গল্প আছে। তিনি ওদের গল্পটা শোনালেন।

ইচ্ছা পূরণ

সুবলচন্দ্রের ছেলে সুশীলচন্দ্র ভারি দস্যি। সবাইকে জ্বালিয়ে মারত। সেদিন ছিল ওদের পাড়ায় জমজমাট উৎসব। সন্ধ্যায় বাজি পোড়ানো হবে। সুশীলের ইচ্ছে সেখানেই সারাদিন কাটাবে। তাই সে বুদ্ধি করে বাবাকে বলল, আমার পেট ব্যথা। আজ স্কুলে যাব না। বাবা সবই বুঝতে পারলেন। তবু বলল, আজ তাহলে ঘর থেকে বের হয়ে কাজ নেই। তোর জন্য লজেন্স (চকলেট) এনেছিলাম সেটাও আর খেতে হবে না। বরং পাঁচন খেয়ে সারা দিন শুয়ে থাক। পাঁচন একটা ভয়ানক তিতা ওষুধ। পাঁচনের ভয়ে সুশীলের পেটব্যথা সেরে গেল, কিন্তু সুবল তাকে ছাড়লেন না। জোর করে পাঁচন খাইয়ে ঘরে বন্ধ করে চলে গেল। মনের দু:খে সুশীল সারা দিন কাঁদল আর ভাবল, যদি আমার বাবার মতো বয়স হতো, তাহলে কী মজা হতো! যা ইচ্ছে তাই করতে পারতাম। এদিকে সুবল ভাবল, যদি ছেলেবেলাটা ফিরে পেতাম, তাহলে সারাদিন শুধু লেখাপড়া করতাম। ইচ্ছা ঠাকরুণ সেকথা শুনে ভাবলেন, ঠিক আছে। এদের যেমন ইচ্ছে তেমনই হোক।

পরদিন সকালে বাবা সুবলচন্দ্র ঘুম থেকে উঠে দেখে তার টাক মাথায় চুল গজিয়েছে, পড়ে যাওয়া দাঁতগুলোও গজিয়েছে। মুখে একটাও গোঁফদাড়ি নেই। সে একদম সুশীলের মতো ছোট হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে সুশীলের হলো উল্টোরকম ব্যাপার। মাথায় চকচকে টাক, মুখে গোঁফদাঁড়ি, কয়েকটা দাঁতও পড়ে গেছে। আর শরীরটা কত বড় হয়ে গেছে! তাদের মনের একটা ইচ্ছা পূরণ হলো ঠিকই কিন্তু বাকি ইচ্ছাগুলো হারিয়ে গেল।

সুশীল ভাবত বাবার মতো হলে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারবে, সারাদিন হাডুডু খেলা, পুকুরে ঝাঁপ দেওয়ায় আর গাছে চড়ায় কোনো বারণ থাকবে না। কিন্তু বড় হয়ে তার আর এসব করতেই ইচ্ছে হলো না। তবুও একবার

চেষ্টা করে দেখতে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে গেল। পথচলতি লোকেরা বুড়ো মানুষের এই ছেলেমানুষী কান্ড দেখে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। সুশীলের কত প্রিয় ছিল লজেন্স, এক টাকায় একরাশ লজেন্স কিনে এনে একটা মুখে দিয়ে স্বাদটা ভারি বিশ্রী লাগল। এমনকি নিজের বন্ধুদের দেখেও ছেলেমানুষ আর বিরক্তিকর বলে মনে হলো।

এদিকে যে সুবল ভেবেছিল আবার ছোট হতে পারলে কত পড়াশোনা করবে, এমনকি সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুমার কাছে গল্প শোনা বাদ দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত কেবলই পড়া মুখস্থ করবে। অথচ এখন সে আর কিছুতেই স্কুলে যেতে চায় না। সারাদিন খেলার জন্য অস্থির থাকে। সুশীল তাকে জোর করে স্কুলে পাঠায়। কাজের সময় গোলমাল করলে একটা স্লেট নিয়ে অঙ্ক করতে বসিয়ে দেয়, এমনকি বন্ধুদের সঙ্গে দাবা খেলার সময় ছেলেকে শান্ত রাখার জন্য বাড়িতে একজন মাস্টারও রেখে দিল। তবুও বাবা সুবলকে সামলাতে গিয়ে ছেলে সুশীল হিমশিম খায়।

পুরোনো অভ্যাসের কারণে দুজনের মাঝে মাঝেই আবার ভুল হয়ে যায়। সুশীল চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখে মাথায় চুলই নেই। হঠাৎ করে লাফ দিতে গিয়ে হাড়গোড় টনটন করে ওঠে। আগের অভ্যাসমতো পাড়ার আন্দিপিসির মাটির কলসে ঠন করে ঢিল ছুড়ে মেরে পাড়ার লোকের তাড়া খায়। এদিকে সুবল বড়দের তাস-পাশার আড্ডায় বসতে গিয়ে ধমক খেয়ে ফিরে আসে। ভুল করে মাস্টারের কাছে তামাকটা চেয়ে মার খায়। নাপিতকে বলে, কদিন আমার দাড়ি কামাতে আসিসনি যে! বুড়োর ছেলে মানুষি আর ছোট ছেলের পাকামি দেখে লোকজন খুব বিরক্ত হয়।

আগে সুশীল কোথাও যাত্রাগান হওয়ার খবর পেলে ঠান্ডা-বৃষ্টি যা-ই থাক, বাড়ি থেকে পালিয়ে সেখানে হাজির হতো। এখন সেই কাজ করতে গিয়ে জ্বর-সর্দি-কাশি বাধিয়ে তিন সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে থাকল। চিরকালের অভ্যাসমতো পুকুরে স্নান করতে গিয়ে এমন অসুখ বাধাল যে ছয় মাস চিকিৎসা করতে হলো। তারপর সে আর সুবলকেও পুকুরে নামতে দেয় না।

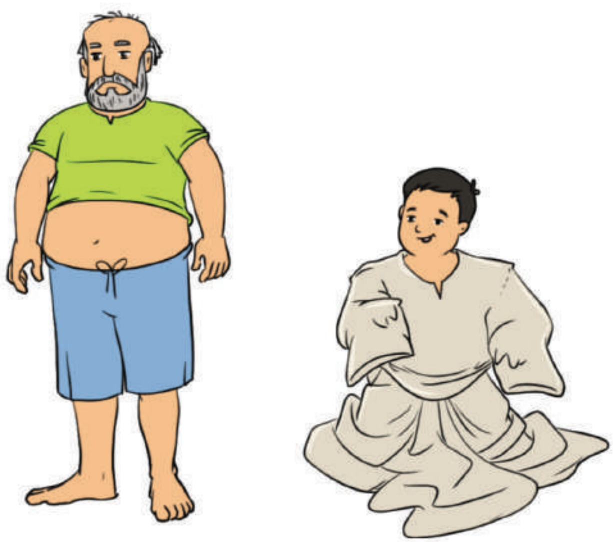

সুবল-সুশীলের আর ভালো লাগছিল না। তারা কোনোমতে আগের মতো হতে পারলে বেঁচে যায়। ইচ্ছা ঠাকরুণ ওদের ইচ্ছার কথা জেনে আবার দুজনকে আগের মতো করে দিলেন। সুবল আবার বাবা হয়েই গম্ভীর হয়ে সুশীলকে বলল, ব্যাকরণ মুখস্ত করবে না? সুশীল আগের মতোই জবাব দিল, বই হারিয়ে গিয়েছে। গল্পটা বলার পর খুশি আপা বললেন, আমাদের সুমন যেমন গোঁফ লাগিয়ে বড় মানুষ সেজেছে, 'ইচ্ছা পূরণ' গল্পে এ রকম ঘটনা কার ক্ষেত্রে ঘটেছে? আয়েশা হেসে বলল, সুশীলচন্দ্র আমাদের সুমনের

মতো ছেলে থেকে বাবা হয়েছে। মামুন বলল, সুবলচন্দ্রের ক্ষেত্রে আবার উল্টো ঘটনা ঘটেছে, সে বাবা থেকে ছেলে হয়ে গিয়েছে। খুশি আপা বললেন, ঠিক তাই। চলো, আমরা একটা ছক পূরণ করে বুঝে নিই, ছেলে হিসেবে সুশীল-সুবল কেমন ছিল আর বাবা হিসেবে তারা কেমন হয়েছিল। ওরা আলোচনার মাধ্যমে বোর্ডে নিচের ছকটি পূরণ করল:

অদল-বদল	
সুশীলচন্দ্র যখন ছেলে	সুশীলচন্দ্র যখন বাবা
পড়াশোনায় ফাঁকি দেয় বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে, গাছে চড়তে ভালো লাগে	ছেলেকে পড়তে বসায় ছেলেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে
সুবলচন্দ্র যখন ছেলে	সুবলচন্দ্র যখন বাবা
পড়াশোনায় ফাঁকি দেয় বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে, গাছে চড়তে ভালো লাগে	ছেলেকে পড়তে বসায় ছেলেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে

আমরাও ওদের মতো আলোচনা করে ওপরের ছকটি পূরণ করি।

ছক পূরণ শেষে ওরা নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করল

সুবলচন্দ্র আর সুশীলচন্দ্রের কী রকম বদল হয়েছিল?

যখন তারা বাবা তখন তাদের কাজ, আচরণ কেমন ছিল?

যখন তারা ছেলে তখন তারা কেমন?

লোকজন ওদের ওপর বিরক্ত হয়েছিল কেন?

আলোচনা শেষে ওরা বুঝতে পারল, সুবলচন্দ্র ও সুশীলচন্দ্রের অবস্থান বদল হওয়ার পর তাদের ভূমিকারও বদল হয়েছে। বাবা হিসেবে সুবলচন্দ্র যা করতে পারে, ছেলে হিসেবে তা পারে না। যেমন গোলরক্ষকের অবস্থানে থেকে সেন্টার ফরোয়ার্ডের ভূমিকা পালন করা যায় না। আবার সুশীলচন্দ্রের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্যি। বাবা ও ছেলের অবস্থান অনুযায়ী ভূমিকা পালনের কিছু সামাজিক রীতিনীতি আছে। সেগুলো মেনে না চললে সমাজের লোকজন বিরক্ত হয়, এমনকি সমালোচনাও করে। ফুটবলের মাঠেও নিয়ম নীতি মেনে না খেললে এ রকম কাণ্ড ঘটে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকার বদল হয়

খুশি আপা বললেন, আমরা তো গল্পে দেখলাম বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবস্থান বদলায় আর অবস্থান বদলালে ভূমিকাও বদলায়। কিন্তু বাস্তবেও এ রকম হয় কি না, আমরা একটা অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে পারি, ছোটবেলায় আর পরিণত বয়সে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা কেমন হয়। তথ্য

সংগ্রহের জন্য নিজেদের পরিবারের লোকজনসহ আশপাশের পাঁচজন বড় মানুষের সাক্ষাৎকার নিতে পারি। আমরা বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার মানুষের সঙ্গে কথা বলব। যত ভিন্ন ভিন্ন রকমের মানুষের সাক্ষাৎকার নিতে পারব, তত ভালোভাবে বিষয়টা বুঝতে পারব। সমাজের সব রকমের মানুষের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা সত্যি কি না, জানা যাবে।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য ওরা আলোচনার মাধ্যমে এ রকম একটা ছক তৈরি করল। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আমরা তথ্যদাতা/উত্তরদাতার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিব। প্রয়োজনে সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে প্রথম অধ্যায়-'যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কীভাবে' এ দেওয়া অনুমতি নেওয়ার নিয়মগুলো পড়ে নিতে পারি।

বিভিন্ন বয়সে আমার অবস্থান ও ভূমিকা নাম: বয়স:	পেশা: লিঙ্গ:
স্কুলে পড়ার বয়সে আমি যা করতাম	এখন আমি যা করি

ওরা দল তৈরি করে অনুসন্ধানী কাজটি করল। তারপর বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ফলাফল উপস্থাপন করল।

> আমরাও ওদের মতো অনুসন্ধানী কাজটি করি।

উপস্থাপন শেষে ফ্রান্সিস বলল, আমরা যে ভাবছিলাম, বড় হলে খেলা দেখতে যেতে কারোর অনুমতি লাগবে না। কত স্বাধীনতা! কিন্তু আসলে বড়দের অবস্থানে যে ভূমিকা পালন করতে হয়, তাতে দায়িত্বও বেশি থাকে। নীলা বলল, বাড়িতে, অফিসে, ক্লাবে, বাজারে নানা জায়গায় তাদের অনেকগুলো অবস্থানে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হয়। শিহান বলল, ছোটদের ক্ষেত্রেও সে কথা সত্যি। খুশি আপা বললেন, কথাটা আর একটু বুঝিয়ে বলবে? "বাড়িতে আমরা ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন ইত্যাদি অবস্থানে একাধিক ভূমিকায় থাকি, আবার স্কুলে এসে ছাত্র, বন্ধু— এসব অবস্থানে ভূমিকা পালন করি।" শিহান জবাব দিল। খুশি আপা আনন্দিত হয়ে বললেন, দারূণ বলেছ তো! আরও বললেন,

> এই যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় মানুষের সঙ্গে মেলামেশা বা যোগাযোগ করি, যে পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সেটা করি তাকে 'সামাজিক প্রেক্ষাপট' বলে।

আয়েশা বলল, আমরা বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজের আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি, অবস্থান অনুযায়ী ভূমিকার কী রকম বদল হচ্ছে। সিয়াম বলল, আমরা কমিক স্ট্রিপ বানিয়ে বিষয়টা সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারি।

বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমার অবস্থান ও ভূমিকা

এরপর ওরা শিরোনাম আর কথার বেলুন দিয়ে কার্টুন একে নিজেদের অভিজ্ঞতাগুলো ক্লাসে উপস্থাপন করল।

বাড়িতে আমি	শ্রেণিকক্ষে আমি
(ঘর গোছানো, ঘুমানো, ছোট ভাই/বোনের সঙ্গে খেলার ছবি, স্পিচ বাবলে লেখা) ছোট বোনকে গল্প শোনাই	(হাত তুলে কথা বলা, বন্ধুদের সঙ্গে কাগজ পেন্সিল রং কাঁচি দিয়ে প্রজেক্ট ওয়ার্ক করার ছবি, স্পিচ বাবলে লেখা) বন্ধুদের সঙ্গে কাজ করি
খেলার মাঠে আমি	বন্ধুদের আড্ডায় আমি

আমরাও ওদের মতন কার্টুন একে 'বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজের অবস্থান ও ভূমিকা' প্রকাশ করি।

ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকা

সাবা বলল, আমাদের যেমন আলাদা আলাদা সামাজিক প্রেক্ষাপটে আলাদা আলাদা অবস্থান ও ভূমিকা আছে, তেমনি যেসব পরিবার আর আশপাশের মানুষের সাক্ষাৎকার নিলাম, তাদেরও ছোটবেলায় এ রকম সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন অবস্থান আর বিভিন্ন ভূমিকা ছিল। আয়েশা বলল, বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের অবস্থান বদলেছে, অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায় ভূমিকারও বদল ঘটেছে। "বড় হয়ে কি তাদের সবার অবস্থান আর ভূমিকা একরকম হয়েছে?" খুশি আপা প্রশ্ন করলেন। গণেশ বলল, ব্যক্তির যেমন বয়সভেদে আলাদা অবস্থান ও ভূমিকা থাকে, তেমনি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও অবস্থান আর ভূমিকার তফাত আছে। সালমা বলল, বড়দের সবার অবস্থান আর ভূমিকা একরকম নয়। মা যা করে বাবা সেটা করেন না। মাহবুব বলল, আমাদের এলাকার জনপ্রতিনিধি যা যা করেন, দোকানদার সেটা করেন না। একজন অভিনেতা যা করতে পারেন, ধর্মীয় নেতা তা করতে পারেন না; সমাজের মানুষও সেটা মেনে নেবে না।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

মানুষের সঙ্গে মানুষের কথাবার্তা, কাজ, ভাবের বিনিময় ইত্যাদি যোগাযোগ বা মিথস্ক্রিয়ার ফলে প্রতিষ্ঠান (পরিবার, বিদ্যালয়, আমলাতন্ত্র, ধর্ম, রাজনৈতিক দল) এবং গোষ্ঠী (খেলার সঙ্গী, ফুটবল টিম, প্রতিবেশী) তৈরি হয়। এই প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীতে ব্যক্তি অবস্থান (status) করে ও ভূমিকা (role) পালন করে।

ব্যক্তির অবস্থান দুই রকমের হতে পারে:

- অর্জিত যা ব্যক্তি সক্ষমতা ও চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ত করে। যেমন বিচারপতির পদ, প্রধানমন্ত্রীত্ব, খেলোয়াড় ইত্যাদি।
- অর্পিত জন্মসূত্রে বা প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত বিষয়। যেমন নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, হরিজন-ব্রাহ্মণ ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি।

অবস্থান অনুযায়ী ব্যক্তির যে অধিকার ও দায়িত্ব থাকে তাকে আমরা ভূমিকা বলি। অন্যভাবে বলা যায়, একজন মানুষের অবস্থান অনুযায়ী সমাজ তার কাছে যে আচরণ প্রত্যাশা করে সেটিই তার ভূমিকা। তাই সুবল যখন ছেলে হয়েছিল, তখন মাস্টারের কাছে তামাক চেয়ে মার খেয়েছিল। প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা থাকে সমকালীন প্রেক্ষাপট। তার জীবনের বিভিন্ন সময় পারিবারিক, পেশাগত ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেকগুলো অবস্থান ও ভূমিকা থাকে।

একই সমাজের সকল মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা এক নয়। একজন মানুষের অবস্থান নির্ধারিত হয় তার পরিচিতি, সুনাম, পদ, ক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক মর্যাদা, বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদির ভিত্তিতে। একজন মানুষকে সমাজের অন্যান্য মানুষ কীভাবে মূল্যায়ন করবে, কতটা সম্মান ও গুরুত্ব দেবে তা তার সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে।

আলোচনা শেষে আদনান বলল, আমাদেরও তাহলে বড় হয়ে অবস্থান এবং ভূমিকা বদলাবে। আয়েশা বলল, আপনা আপনি সব বদলাবে তেমনটা নয়, আমাদের নিজেদেরও পছন্দের অবস্থান অর্জন করতে হবে। রনি বলল, আমরা তো সুশীলচন্দ্রের মতো এক রাতে বড় হবো না, ধীরে ধীরে বাড়ব, ধীরে ধীরে পছন্দের অবস্থান তৈরি করব। সাবা হেসে বলল, সে-ই ভালো। তাহলে আর হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে হাড়গোড় ভাঙবে না। সবাই হেসে উঠল।

সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল হলে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা বদলায়

খুশি আপা জানতে চাইলেন, সামাজিক প্রেক্ষাপট কি সবসময় একই রকম থাকে? ওরা বলল, প্রাচীনকালের সামাজিক প্রেক্ষাপট আর আজকের প্রেক্ষাপট একরকম নয়। হাস্না বলল, সব কালের সমাজে বয়স অনুযায়ী মানুষের অবস্থান এবং ভূমিকার বদল হয়। কিন্তু সামাজিক অবস্থানের শ্রেণিভেদ সবসময় ছিল না। আপা বললেন, সমাজের কোনো একটি শ্রেণির আজকের যে অবস্থান এবং ভূমিকা, আগেও কি তেমন ছিল, ভবিষ্যতেও কি তেমন থাকবে? ওরা 'হ্যাঁ' 'না' দুটোই বলল, কিন্তু একমত হতে পারল না।

খুশি আপা বললেন, এবার আমরা এই সময়ের নারীদের ওপরে একটা তথ্যচিত্র দেখব এবং রিপোর্ট পড়ব।

কলসিন্দুর থেকে হিমালয়ে

সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২ এ বিজয়ী বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল

সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২২ সালের আসরে স্বাগতিক নেপালকে ৩-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা। সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের এই আসরে বাংলাদেশের মেয়েরা গোল করেছে মোট তেইশটি, হজম করেছে মাত্র একটি। সাফের ষষ্ঠ আসরের সবগুলো পুরস্কারই বাংলাদেশের ঝুলিতে।

এই দলের আটজন খেলোয়াড় এসেছে ময়মনসিংহের কলসিন্দুর নামের এক সাধারণ গ্রাম থেকে। ফুটবলকন্যাদের দৌলতে কলসিন্দুর এখন সারা দেশের এক পরিচিত নাম। গ্রামীণ বালিকা থেকে তারকা হয়ে ওঠা এই মেয়েরা নিজেদের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপরিমণ্ডলে দেশের অবস্থানকেও নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়।কলসিন্দুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে ছোট্ট মেয়েগুলোর কাছে 'মেয়েরা ফুটবল খেলে' এই কথাই ছিল বিস্ময়ের, আজ ফুটবলের পঙ্খিরাজে চড়ে তারা নিজেরাই সবার কাছে বিস্ময়।

সাধারণ গ্রাম কলসিন্দুর থেকে হিমালয়কন্যা নেপালে গিয়ে সাফ জয়, কেমন ছিল পথটা— ২০১১ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ঘোষণা দেওয়া হয় 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট' আয়োজনের। ময়মনসিংহ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী উপজেলা ধোবাউরার কলসিন্দুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মফিজউদ্দিন খবরটা জানতে পেরে নিজের স্কুলের জন্য দল গঠনে লেগে যান। একে একে দলে যোগ দেয় সানজিদা, মারিয়া মান্দা, শিউলি আজিম, মার্জিয়া আক্তার, শামসুন্নাহার, তহুরা সাজেদা, শামসুন্নাহার জুনিয়র। মফিজউদ্দিন নিজেই ছিলেন প্রশিক্ষক।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিনতি রানি শীল দেখভালের দায়িত্ব নেন। ২০১২ সালে জেলায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট শুরু হলে কলসিন্দুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সেখানে অংশ নেয়। জাতীয় পর্যায়ে রানার্স আপ হয় তারা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য শুরু করে নতুন করে প্রস্তুতি। মফিজউদ্দিন জানান, শুরুটা অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল। গ্রামের অভিভাবকরা রক্ষণশীল। মেয়েদের ফুটবল খেলতে দেওয়ার কথা ভাবতেও পারত না। অভিভাবকদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করাতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। এরপর মেয়েদের নিয়ে যখন মাঠে নেমেছেন, অনেকেই ঠাট্টা-মশকারা করেছে।

মেয়েদের নিয়ে অনেক সমালোচনা, আজেবাজে মন্তব্য করেছে। প্র্যাকটিসের সময় মাঠের আশপাশে থাকত উৎসুক মানুষের ভিড়। অনেকেই তাঁকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করত। তবে সাহায্য করতেও এগিয়ে এসেছেন অনেকে। লোকের তির্যক মন্তব্যের জবাব মুখে নয়, মাঠে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। মেয়েরা পড়াশোনার পাশাপাশি স্কুল ছুটির পরে ও বন্ধের দিনে মাঠে প্রাকটিস করতে থাকে। শিক্ষক মফিজউদ্দিনের পরিশ্রম বৃথা যায়নি। ২০১৩ সালে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় কলসিন্দুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এরপরও একধিকবার তারা এই পদক জিতেছে। এই সময় স্থানীয় প্রশাসক ও ক্রীড়ামোদী ব্যক্তিদের নজরে আসে সানজিদা, মারিয়ারা। অল্প করে হলেও মিলতে থাকে সুযোগ-সুবিধা।

২০১৪ সালে এএফসি অনূর্ধ্ব ১৪ আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে মারিয়া মান্দা, শামসুন্নাহার জুনিয়র। কলসিন্দুর স্কুলের মেয়েদের এমন সাফল্য দেখে অন্য মেয়ে শিক্ষার্থীরাও ফুটবলে আগ্রহী হয়। দিন দিন বাড়তে থাকে কলসিন্দুর স্কুল টিমের সদস্য সংখ্যা। কলসিন্দুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিনতি রানি শীল জানান, শুরুতে প্রধান সমস্যা ছিল পোশাক নিয়ে সংকোচ। মেয়েরা প্রথমে সালোয়ার-কামিজ পরে খেলত।

লোকলজ্জার ভয় দূর করে খেলার পোশাকে মেয়েদের মাঠে নামাতে অনেক সময় লেগেছে। সানজিদার বাবা লিয়াকত আলী জানান, মেয়ের আগ্রহ ও শিক্ষকদের কথার কারণে মেয়েকে ফুটবল খেলতে দিয়েছেন। গ্রামের লোকজন প্রথমে বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি। খেলোয়াড়দের নানা হুমকি-ধামকি দেওয়া হয়েছে। এমনকি নির্যাতনও করা হয়েছে। পরে যখন নারীদের ফুটবলে এগিয়ে যাওয়ার কারণে কলসিন্দুর গ্রামের নামডাক ছড়িয়ে পড়ে দেশ-বিদেশে, তখন সমস্যা অনেক কমেছে, সম্মান-স্বীকৃতিও মিলেছে। অজপাড়াগাঁয়ের কয়েকটা মেয়ে গ্রামের চেহারাই বদলে দিয়েছে।

তাদের খ্যাতির কারণে সেখানে বিদ্যুৎ এসেছে, পাকা হয়েছে রাস্তাঘাট। তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাকা ভবন হয়েছে, ফুটবলকন্যাদের দৌলতে সরকারিকরণ হয়েছে কলসিন্দুর স্কুল এন্ড কলেজ। সেখানেও উঠেছে পাকা ভবন। দরিদ্র পরিবারের মেয়েগুলো নিজেদের সংসারে এনেছে স্বচ্ছলতা। তাদের কারণে আলোকিত হয়েছে এই জনপদ; মাথা উঁচু হয়েছে পুরো জাতির। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই মেয়েদের সংবর্ধনাসহ আর্থিক অনুদানও দিয়েছেন। এই কিশোরীদের গল্প উচ্চ মাধ্যমিক শাখার একাদশ শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ‘দ্য আনবিটেন গার্লস’ বা ‘অপরাজিত মেয়েরা’ শিরোনামে পাঠ্যবইয়ে একটি বিশেষ পাঠ রাখা হয়েছে। গারো পাহাড়ের পাদদেশের দরিদ্র পরিবারগুলো থেকে উঠে আসা ফুটবলার মেয়েদের সফলতার গল্প লেখা হয়েছে এই পাঠে। চলো এই অদম্য মেয়েদের আরও কিছু ছবি দেখে নিই।

সরকার পরিচালনায় নারী

আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার যে, ১০০ বছর আগেও আমাদের দেশের অধিকাংশ নারীর অবস্থান ছিল শুধু অন্তঃপুরে সেখানে আজ বাংলাদেশের সরকার পরিচালনাতেও নারীরা যোগ্যতার সাথে ভূমিকা রাখছেন। যদিও এখনো বাংলাদেশের অনেক নারীই তাদের অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তবুও সময়ের সাথে নারীর অবস্থার পরিবর্তনের এই ধারায় তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ আমরা এরকমই কয়েকজন নারীর নেতৃত্বের কথা আলোচনা করবো যারা দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

শেখ হাসিনা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন শেখ হাসিনা। ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মতো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। তিনি একজন মহীয়সী নারী। বাংলাদেশকে দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের করে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত। তিনি জনকল্যাণমুখী ও মানবতাবাদী কাজের জন্য বহু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এম.পি.
মাননীয় স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এম.পি., বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ স্পিকার। ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতি চর্চায় যুক্ত ছিলেন। এছাড়া পড়ালেখাসহ, সর্বত্রই তিনি অত্যন্ত মেধার ছাপ রেখেছেন।

খুশি আপা বললেন, চলো আমরা দলে ভাগ হয়ে যাই। ১০০ বছর আগের নারীর অবস্থান ও ভূমিকা এবং বর্তমান সময়ের নারীর অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে আমরা তথ্য সংগ্রহ করি। এজন্য আমরা পরিবার বা এলাকার বয়স্ক ব্যক্তির কাছে প্রশ্ন করে বা বিভিন্ন বই/উপন্যাস/পত্রিকা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। এরপর দলে আলোচনা করে ছকটি পূরণ করি।

প্রায় ১০০ বছর আগেকার নারী	এখনকার সময়ের নারী

ওরা দলে কাজটি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করল।

চলো, আমরাও ওদের মতো ধারাবাহিকভাবে কাজগুলো করি।

টেকসই উন্নয়ন ও আমাদের ভূমিকা

প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব

আজ মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। রনি, মিলি ও ক্লাসের অনেক বন্ধু স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মজা করে কাগজের নৌকা বানিয়ে বৃষ্টির পানিতে ভাসাচ্ছে।

খুশি আপা সেটি দেখে ওদের সাথে নৌকা ভাসানোর খেলায় যোগ দিলেন।

নৌকা ভাসানো শেষে ওরা সবাই ক্লাসে ফিরে এলো। খুশি আপা সবাইকে বৃষ্টিভেজা দিনের শুভেচ্ছা জানালেন।

আনোয়ার বলল, আপা আজ খুব মজা হলো, অনেকদিন পর বৃষ্টির পানিতে নৌকা ভাসালাম।

খুশি আপা বললেন, আমারও খুব মজা লেগেছে, ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। একবার ভেবে দেখোতো প্রকৃতি কত রূপেই না আমাদের মন ভালো করে চলেছে অবিরাম!

শিহান বলল, হ্যাঁ আপা আর আমাদের সব কাজেই আমরা প্রকৃতি থেকে পাওয়া সম্পদকে ব্যবহার করে চলেছি।

রনি বলল, হ্যাঁ ঠিক বলেছ শিহান, যেমন আজ নৌকা ভাসানোতে বৃষ্টির পানিকে ব্যবহার করেছি।

আনুচিং মগিনি বলল, শুধু কি তাই! যে কাগজ ব্যবহার করেছি সেটাও তো গাছ থেকে তৈরি হয়। সেটাও প্রকৃতি থেকেই তো এসেছে।

খুশি আপা বললেন, চলো আমরা এখন কিছু প্রাকৃতিক সম্পদের এবং মানুষের উদ্যোগে প্রাকৃতিক সম্পদের রূপান্তরিত অবস্থার ছবি দেখি।

সমুদ্র (প্রাকৃতিক সম্পদ)

জ্বালানি (প্রাকৃতিক সম্পদ)

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বায়ু (প্রাকৃতিক সম্পদ)

আবাসস্থল (প্রাকৃতিক সম্পদের রূপান্তর)

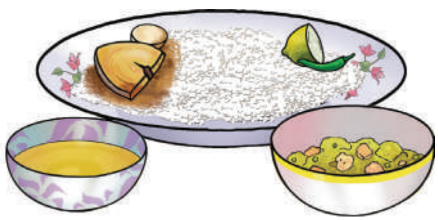

খাদ্য (প্রাকৃতিক সম্পদের রূপান্তর)

পানি (প্রাকৃতিক সম্পদের রূপান্তর)

চিত্র: প্রাকৃতিক সম্পদ

ছবিতে আমরা যে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলো সম্পর্কে আমরা কী কী জানি?

মিলি বলল, আপা, এখানে যে যে জিনিসের ছবি দেওয়া হয়েছে এগুলো সবই আমাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে লাগে।

শিহান বলল, আর এসব জিনিস আমরা প্রকৃতি থেকেই পাচ্ছি। তাই এগুলো সবই প্রাকৃতিক সম্পদ।

প্রাচীন ও বর্তমান মানুষের সম্পদের ব্যবহার অনুসন্ধান

সালমা বলল, আচ্ছা আপা, এসব সম্পদের ব্যবহার তো মানবসভ্যতার শুরু থেকেই হয়ে আসছে, তাই না! তখনও কি মানুষ আমাদের মতো করেই প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছে?

খুশি আপা বললেন, খুব ভালো প্রশ্ন সালমা, চলো তাহলে আমরা খুঁজে বের করি প্রাচীন সভ্যতার মানুষ কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করেছে।

রনি বলল, এছাড়া আমরা এই কাজটি করার জন্য আমাদের বইয়ের ইতিহাস অংশের এবং ইন্টারনেটের সাহায্যও নিতে পারি।

খুশি আপা বললেন, নিশ্চয়।

তখন ওরা দলে ভাগ হয়ে প্রত্যেক দল একটি করে প্রাচীন সভ্যতা বেছে নিল এবং সেই সভ্যতার মানুষ কী কী এবং কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করেছে সেটি অনুসন্ধান করে বের করল।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আমাদের জীবনে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার

কাজটি শেষ হলে খুশি আপা বললেন, আমরা তো দেখলাম প্রাচীন মানুষরা তাদের প্রয়োজনে কীভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছে। আমরাও তো প্রতিনিয়ত আমাদের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে চলেছি তাই না?

রনি বলল, হ্যাঁ আপা, কিন্তু কতটুকু ব্যবহার করছি তা বুঝতে পারছি না।

তখন খুশি আপা বললেন, বেশ তাহলে চলো এটা বের করার জন্য আমরা একটা মজার কাজ করি।

আমরা আমাদের একটি দিনকে ৩টি ভাগে ভাগ করি। যেখানে সকাল দুপুর ও রাতে আমরা প্রয়োজনে কীভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করছি তা লিখে ফেলি।

মামুন বলল, যেমন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা পানি খাই, পানি একটি প্রাকৃতিক সম্পদ।

রনি বলল, শুধু কি তাই, আমরা যে খাটে ঘুমাই সেটাও তৈরি হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ গাছ ব্যবহার করে অথবা লোহা ব্যবহার করে তাই না!

খুশি আপা বললেন, একদম ঠিক ধরেছ তোমরা। চলো তাহলে কাজটি করে ফেলি।

দিনের বিভিন্ন সময়	প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার
সকাল	
দুপুর	
রাত	

সময়ের সাথে মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের পরিবর্তন ও পরিবেশ

কাজটি শেষ হওয়ার পর সুমন বলল, আপা সেই মানব সভ্যতা শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে চলেছি।

রনি বলল, পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে, সেই সাথে তো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাত্রা ও বাড়ছে তাই না!

মিলি বলল, আর এটার প্রভাব আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশেও তো পড়ছে।

খুশি আপা বললেন, তাহলে চলো সময়ের সাথে মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের যে পরিবর্তন তা আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর কী কী প্রভাব ফেলছে তা দলে আলোচনা করে খুঁজে বের করি।

তখন ওরা দলে ভাগ হয়ে মানুষের সম্পদের ব্যবহারের মাত্রার সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আলোচনা করে খুঁজে বের করল এবং ক্লাসে সবার সামনে তা উপস্থাপন করল।

> চলো আমরাও দলে ভাগ হয়ে সময়ের সাথে মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ধরন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর তার প্রভাব খুঁজে বের করি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সামাজিক জীবনে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবর্তনের প্রভাব

অনুসন্ধানের কাজ শেষে মিলি বলল, আপা দিন দিন প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার যে হারে বাড়ছে তাতে এসব সম্পদ কি এক দিন শেষ হয়ে যাবে না?

খুশি আপা বললেন, তা তো যেতেই পারে।

আনুচিং বলল, কিন্তু আপা আমরা যদি কোনো সম্পদ যে পরিমাণ ব্যবহার করব ঠিক সেই পরিমাণ আবার পূরণ করতে পারি, তাহলে তো আর শেষ হওয়ার সম্ভবনা নেই! তাই না?

খুশি আপা বললেন, ঠিকই বলেছ আনুচিং, কিন্তু কিছু সম্পদ আছে যা একবার ব্যবহার করে ফেললে তা পূরণ হতে কয়েক মিলিয়ন বছর লেগে যায়। যেমন জীবাশ্ম জ্বালানি।

ভূপৃষ্ঠের সুপেয় পানি সম্পদ

সালমা বলল, আপা আমাদের বেঁচে থাকতে যেসব উপাদান লাগে সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে পানি। পৃথিবীতে তো অনেক পানি, তাহলে তো আমরা পানির সমস্যায় কখনো পড়ব না!
মিলি বলল, হ্যাঁ পানি আছে তবে সুপেয় পানি খুব বেশি নেই।
খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ তোমরা। চলো এখন আমরা একটা কাজ করি। প্রথমে আমরা মানচিত্র দেখে পৃথিবীর মহাদেশগুলোর মধ্যে কোন কোন দেশে সুপেয় পানির প্রাচুর্য আছে এবং কোথায় কোথায় স্বল্পতা আছে তা খুঁজে বের করব এবং পরে নিচের ছকে গ্লোবের সাহায্যে মহাদেশ অনুযায়ী দেশগুলোর নাম লিখে ছকটি পূরণ করব।

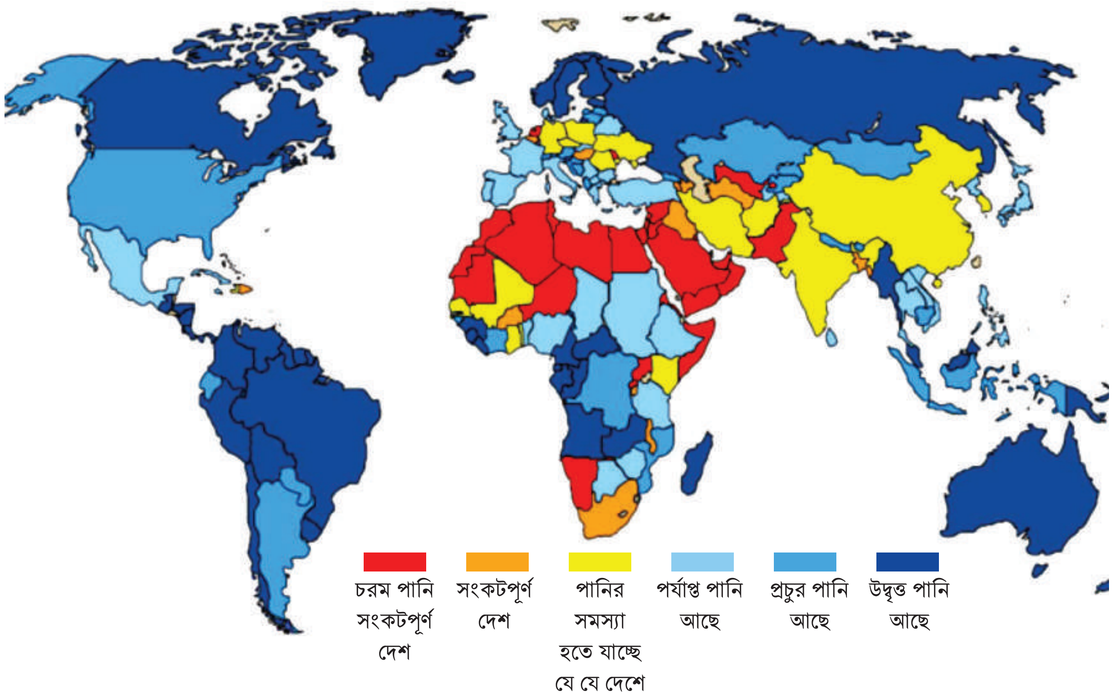

চরম পানি সংকটপূর্ণ দেশ	সংকটপূর্ণ দেশ	পানির সমস্যা হতে যাচ্ছে যে যে দেশে	পর্যাপ্ত পানি আছে	প্রচুর পানি আছে	উদ্বৃত্ত পানি আছে

চলো ওদের মতো করে আমরা ছকটি পূরণ করে ফেলি।

বদ্বীপের গড়ে ওঠা

কাজটি শেষ করার পর শিহান বলল, কি সর্বনাশ, বাংলাদেশে তো পানিসম্পদের অবস্থা খুবই খারাপের দিকে চলেছে।

খুশি আপা বললেন, ঠিকই বলেছ শিহান। আমরা সতিই খুব বিপদের মাঝেই আছি।

মিলি বলল, কিন্তু আপা আমাদের দেশ তো নদীমাতৃক দেশ। তাছাড়া সারাদেশে সারা বছর বৃষ্টিও হয় প্রচুর। তাহলে আমরা কেন পানির অভাবে আছি?

আনুচিং বলল, আপা আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে জেনেছিলাম বাংলাদেশ হলো বঙ্গীয় বদ্বীপের প্রধান অংশ যা গঠিত হয় নদীর দ্বারা, তাহলে তো আমাদের পানির প্রাচুর্য থাকার কথা ছিল, কিন্তু তা না হয়ে সংকটপূর্ণ হয়ে গেল কেন?

খুশি আপা বললেন, তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের আগে জানতে হবে কীভাবে বদ্বীপ গঠিত হয়! চলো আমরা কিছু কাজের মাধ্যমে দেখে নিই কীভাবে বদ্বীপ গড়ে ওঠে এবং বাংলাদেশ নামক বদ্বীপ কী কী সমস্যায় পড়তে চলেছে।

প্রথমে আমরা একটি পরীক্ষণের মাধ্যমে বদ্বীপ কীভাবে গড়ে ওঠে সেটা দেখব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

উপকরণ

বালি, পানি, টেবিল/অ্যালুমিনিয়াম ট্রে

পদ্ধতি

একটি টেবিলে/অ্যালুমিনিয়াম ট্রে তে বালুর স্তূপ তৈরি করব এবং তা পানি দিয়ে ভিজিয়ে দেবো যেন বালুর দানাগুলি একসাথে লেগে থাকে। বালুর স্তরটি কোথাও উঁচু এবং কোথাও সমতলভাবে তৈরি করব। (এখানে বালি পলি মাটিকে নির্দেশ করে।)

এখন বালুর স্তূপের উপর থেকে এমনভাবে পানি ঢালব যেন পানি টেবিলের/অ্যালুমিনিয়াম ট্রের ওপর দিয়ে বয়ে যায়।

এখন স্তূপ থেকে পলি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া এবং স্তূপের সমতল প্রান্ত বরাবর পানি দ্বারা পলির পরিবহণ লক্ষ্য করব।

একইভাবে পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করব। কম পানি ঢেলে এবং বেশি পানি ঢেলে পরীক্ষা করতে থাকব এবং লক্ষ রাখব কীভাবে বালুর তৈরি ভূমিরূপটির পরিবর্তন হয়।

ট্রের পানি পড়ার শুরুর স্থান ও শেষ স্থানের বালুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করব।

এরপর বালুর সাথে কিছু নুড়িপাথর যুক্ত করে পানির প্রবাহ দিয়ে দেখব কী কী পরিবর্তন হয়।

এরপর পরীক্ষণের ফলাফল আমরা পরের পৃষ্ঠায় ছকে ছবি এঁকে পূরণ করব।

চলো ওদের মতো করে আমাদের বদ্বীপ তৈরি প্রক্রিয়ার পরীক্ষণ টি করে ফেলি।

তথ্য এবং পর্যবেক্ষণ

পানির প্রবাহ হার	পরীক্ষণ ট্রের অবস্থার চিত্র
বালুতে কম পানির প্রবাহ	
বালুতে বেশি পানির প্রবাহ	
নুড়িযুক্ত বালুতে পানির প্রবাহ	

মিলি বলল, এখন বুঝতে পারলাম আপা এভাবে নদীর দ্বারা পলি এসে জমে জমেই বদ্বীপের জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূ-খন্ড বদ্বীপের মধ্যে পড়েছে।

খুশি আপা বললেন, ঠিক তাই মিলি। তবে এটা তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া কিন্তু অনেক দিন ধরেই চলতে থাকে। চলো, এখন আমরা আমাদের বাংলাদেশ নামক বদ্বীপের একটি মানচিত্র দেখে এই বদ্বীপে প্রবেশ করা নদীগুলো খুঁজে বের করি এবং এই নদীগুলো কোন কোন দেশের মধ্য দিয়ে এসেছে তা খুঁজে বের করে লিখে ফেলি।

নদীর নাম	যে যে দেশ হয়ে বাংলাদেশে এসেছে

সবার কাজ শেষ হলে খুশি আপা সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, তোমরা সবাই খুব সুন্দর করে বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে আসা নদীগুলো খুঁজে বের করেছ।

শিহান বলল, আপা আমার ভাবতেই অবাক লাগছে একই নদীর পানি আমরা কতগুলো দেশের মানুষ ব্যবহার করছি।

খুশি আপা বললেন, ঠিক শিহান, এখন ভাবো তো যদি এই নদীগুলোর ওপর বাঁধ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কেমন হবে?

শফিক বলল, আপা তাহলে তো আমাদের অনেক রকম সমস্যা হতে পারে। কারণ আমাদের দেশের অবস্থান বদ্বীপের নিচের দিকে আর উজান বা ওপরের দিকে যদি বাঁধ দেওয়া হয়, তাহলে তো আমাদের দেশের নদীগুলো ঠিকমতো পানি পাবে না।

মিলি বলল, কিন্তু রনি কর্ণফুলী নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে তো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও তৈরি করা হয়েছে এবং জন্ম হয়েছে কাপ্তাই হ্রদ।

খুশি আপা বললেন, তোমাদের দুজনেরই কথা সঠিক। তাহলে চলো আমরা বাঁধ নিয়ে একটা অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পন্ন করি।

জেনে রাখ

বাঁধ বলতে এমন একটি প্রতিবন্ধক দেওয়ালকে বোঝানো হয় যেটি পানির প্রবাহকে বাধা দান করে। এটি মূলত কোনো স্থানে কৃত্রিম উপায়ে পানি ধরে রেখে এর নিকট বা দূরবর্তী এলাকায় সেচ বা পানীয় জলের কৃত্রিম উৎস এবংবিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে ব্যবহার করা হয়।

জামাল বলল, খুব ভালো হবে। তাহলে আমরা সবাই বুঝতে পারব বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর বা আশপাশের মানুষের জীবনে এটি কী ধরনের প্রভাব ফেলছে।

বাংলাদেশের মানচিত্রের কাপ্তাই বাঁধের অবস্থান

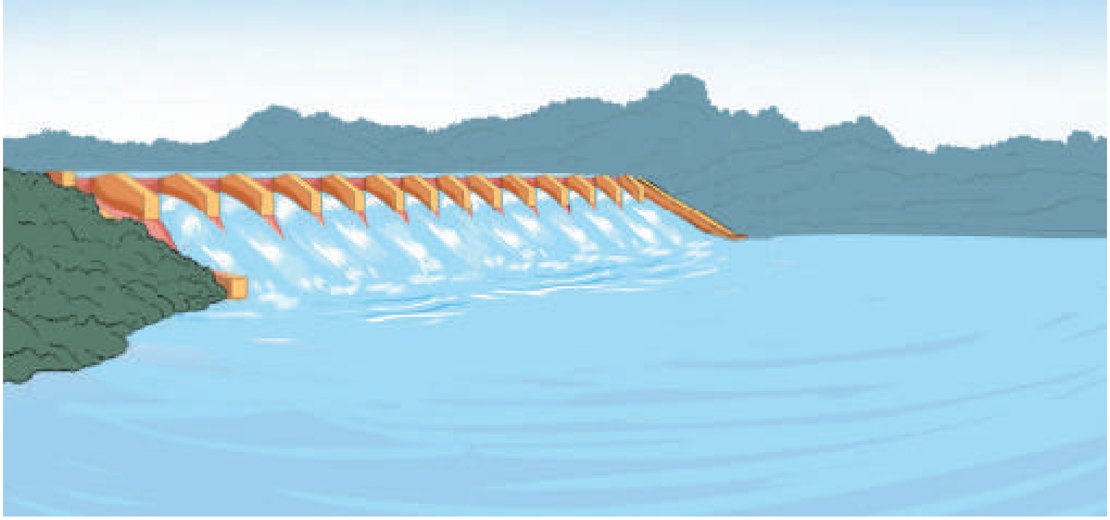

বাঁধ

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ জামাল।

মিলি বলল, আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে অনুসন্ধানমূলক কাজ করেছি। তাহলে আমাদের সবার প্রথমে সমস্যা/প্রশ্ন তৈরি করতে হবে, যার সমাধান বা উত্তর আমরা খুঁজতে চাই। খুশি আপা বললেন, একদম ঠিক বলেছ মিলি। চলো তাহলে আমরা অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ধাপ অনুসরণ করে অনুসন্ধানের কাজ শুরু করি।

চলো আমরাও বন্ধুরা মিলে জলবিদ্যুৎ বাঁধ এবং প্রকল্পগুলো কীভাবে বদ্বীপকে প্রভাবিত করতে পারে সেই সম্পর্কিত একটি অনুসন্ধানমূলক কাজ করি। কাজটি করার জন্যে আমরা কাছাকাছি কোনো জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা (যদি থাকে) অথবা কোনো বাঁধ এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করব। প্রশ্নমালা তৈরি করে এলাকার মানুষের সাথে কথা বলব এবং প্রকল্প/বাঁধের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব অনুসন্ধান করব।

এরপর ওরা সবাই যা জানতে চায় সেই বিষয়ে প্রশ্ন তৈরি করে খুশি আপার সহযোগিতায় এলাকার কাছাকাছি একটি বাঁধ দেওয়া জায়গা পরিদর্শন করল এবং বাঁধের প্রভাব নিয়ে এলাকার বয়স্ক মানুষের সাথে কথা বলল। এরপর আরও কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য তারা ইন্টারনেট ও বিভিন্ন বাঁধ নিয়ে লেখা কিছু বই পড়ে সংগ্রহ করল এবং সবশেষে তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল তৈরি করল।

অনুসন্ধান কাজের শেষে রনি বলল, আপা আমরা যদি আমাদের অনুসন্ধানের ফলাফল একটি বিতর্ক আকারে উপস্থাপন করি তাহলে কেমন হবে? খুশি আপা বললেন, এতো খুবই ভালো প্রস্তাব।

আমাদের সমুদ্রসম্পদ: ব্লু ইকোনমি

খুশি আপা বললেন, আমরা তো অনেক ধরনের কাজের মাধ্যমে দেখলাম প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে সুপেয় পানি আমাদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সুপেয় পানির বাইরে আমাদের আছে এক বিশাল সমুদ্র।

রনি বলল, হ্যাঁ আপা সমুদ্রেও তো অনেক ধরনের সম্পদ আছে।

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ রনি। তোমরা জেনে অবাক হবে যে ২০৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯০০ কোটি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর খাবার যোগান দিতে গিয়ে আমাদের সমুদ্র সম্পদের আহরন বৃদ্ধি করতে হবে। সম্প্রতি আমাদের জন্য একটা বিশেষ খুশির কারণ হয়ে উঠেছে এই সমুদ্র। বঙ্গোপসাগরে আন্তর্জাতিক

আইন অনুযায়ী আমাদের অংশের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আর এই সমুদ্রসম্পদ নির্ভর অর্থনীতিই হচ্ছে ব্লু-ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতি । সর্ব প্রথম ১৯৯৪ সালে বেলজিয়ামের অধ্যাপক গুন্টার পাউলি কোনো দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য একটি টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব মডেল হিসেবে সুনীল অর্থনীতির ধারণা দেন।

সবাই আগ্রহ ভরে জানতে চাইল- সেটা কী আপা

খুশি আপা বললেন, তাহলে চল আমরা বাংলাদেশের সমুদ্র জয় এবং সুনীল অর্থনীতি সম্পর্ক জেনে নিই।

বাংলাদেশের সমুদ্রজয় এবং সুনীল অর্থনীতির দিগন্ত উন্মোচন

১৯৮২ সালে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) প্রণীত হয়। এর ৮ বছর আগেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গোপসাগরের অপার সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে স্বাধীনতার মাত্র ৩ বছরের মধ্যে 'The Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974' প্রণয়ন করেন। সে আইনে বাংলাদেশের উপকূলের বেজলাইন (Baseline) থেকে দক্ষিণে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অঞ্চলকে টেরিটোরিয়াল ওয়াটার এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অঞ্চলকে বাংলাদেশের সামুদ্রিক অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে দাবি করা হয়।

কিন্তু বাংলাদেশের এ দাবির বিরুদ্ধে ভারত ও মিয়ানমার আপত্তি জানায়। ফলে ৩৮ বছর যাবৎ পার্শ্ববর্তী দুই দেশের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা অমীমাংসিত রয়ে যায়। পরে ২০০৯ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যকার সমুদ্রসীমা বিরোধ মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

এর ফলে ২০১২ সালের ১৪ মার্চ International Tribunal for the Law of the Sea-এর রায়ে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি হয়। এরপর ২০১৪ সালের ৭ জুলাই Arbitral Tribunal-এর রায়ে ভারতের সাথেও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিরোধ মীমাংসা হয়। এ রায়সমূহের ফলে ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকার প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদের উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিশাল সমুদ্র জয়ের ফলে বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক আদালতে মামলাসমূহ পরিচালনায় বাংলাদেশের পক্ষে তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডা. দীপু মনি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট এর সচিব রিয়ার অ্যাডমিরাল (অবঃ) খুরশেদ আলম বাংলাদেশের পক্ষে যথাক্রমে এজেন্ট ও ডেপুটি এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ অর্জনে সাচিবিক দায়িত্ব পালনসহ সবরকম কাজে সহযোগিতা করেছেন আন্তর্জাতিক আইনজীবীদের দল, নৌবাহিনী,পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী।

সন্নিহিত অঞ্চলে বাংলাদেশ আর্থিক, অভিবাসন, দূষণ, শুল্ক ও কর সংক্রান্ত বিধিবিধান প্রয়োগের অধিকার লাভ করে। বেজলাইন থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অঞ্চলকে "একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল" (Exclusive Economic Zone) বলা হয়। এ অঞ্চলে বাংলাদেশ সকল প্রকার প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদ আহরণ করার অধিকার রাখে। বাংলাদেশের পর্যটন, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের খোঁজ, বাণিজ্য এবং জ্বালানি সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থলসীমার মোট ক্ষেত্রফল ১ লাখ ৪৮ হাজার ৪৬০ বর্গকিলোমিটার। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে বাংলাদেশের অর্জিত সমুদ্রসীমার ক্ষেত্রফল বিদ্যমান স্থলসীমার প্রায় সমান।

এসব তথ্য জেনে ক্লাসের সবাই আনন্দিত হয়ে হাততালি দিয়ে উঠল। মিলি বললো আপা তাহলে তো বাংলাদেশের মানচিত্রেও কিছু পরিবর্তন আসবে তাই না!

খুশি আপা বললেন, চলো তাহলে দেখি কেমন হয়েছে নতুন সমুদ্রসীমাসহ কেমন হবে বাংলাদেশের মানচিত্র, সেই সাথে চলো ছকে আমাদের সমুদ্রের কোন কোন অঞ্চলে কি কি অধিকার পেলাম তার একটি তালিকা তৈরি করি।

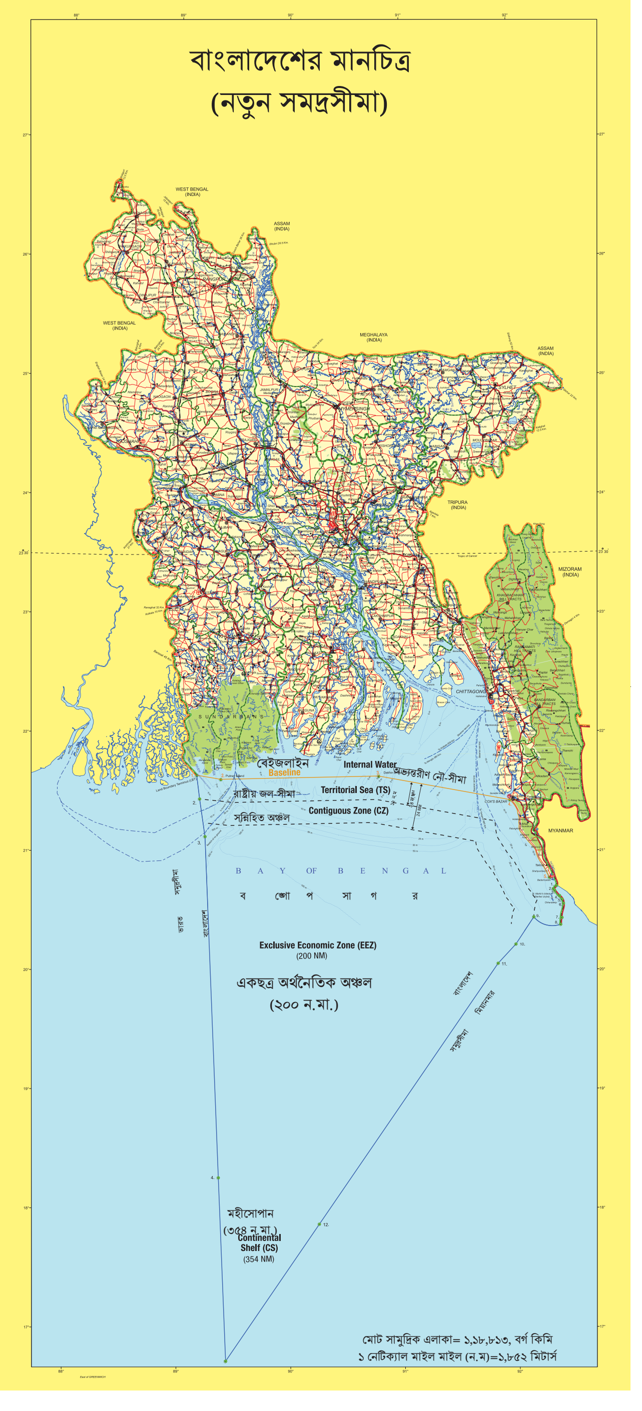

অঞ্চল	কি কি অধিকার পেলাম

খুশি আপা বললেন, চলো এই আনন্দে এখন আমরা একটা মজার কাজ করি। একটি পানির ফোঁটাকে বাঁধের কাছে পৌঁছে দিই যেন সে বাঁধ অতিক্রম করে ওপারে চলে যেতে পারে।

মজার খেলা

Amazing Fun

Help the water get to the dam.

পানির বিন্দুটিকে বাঁধের কাছে নিবে

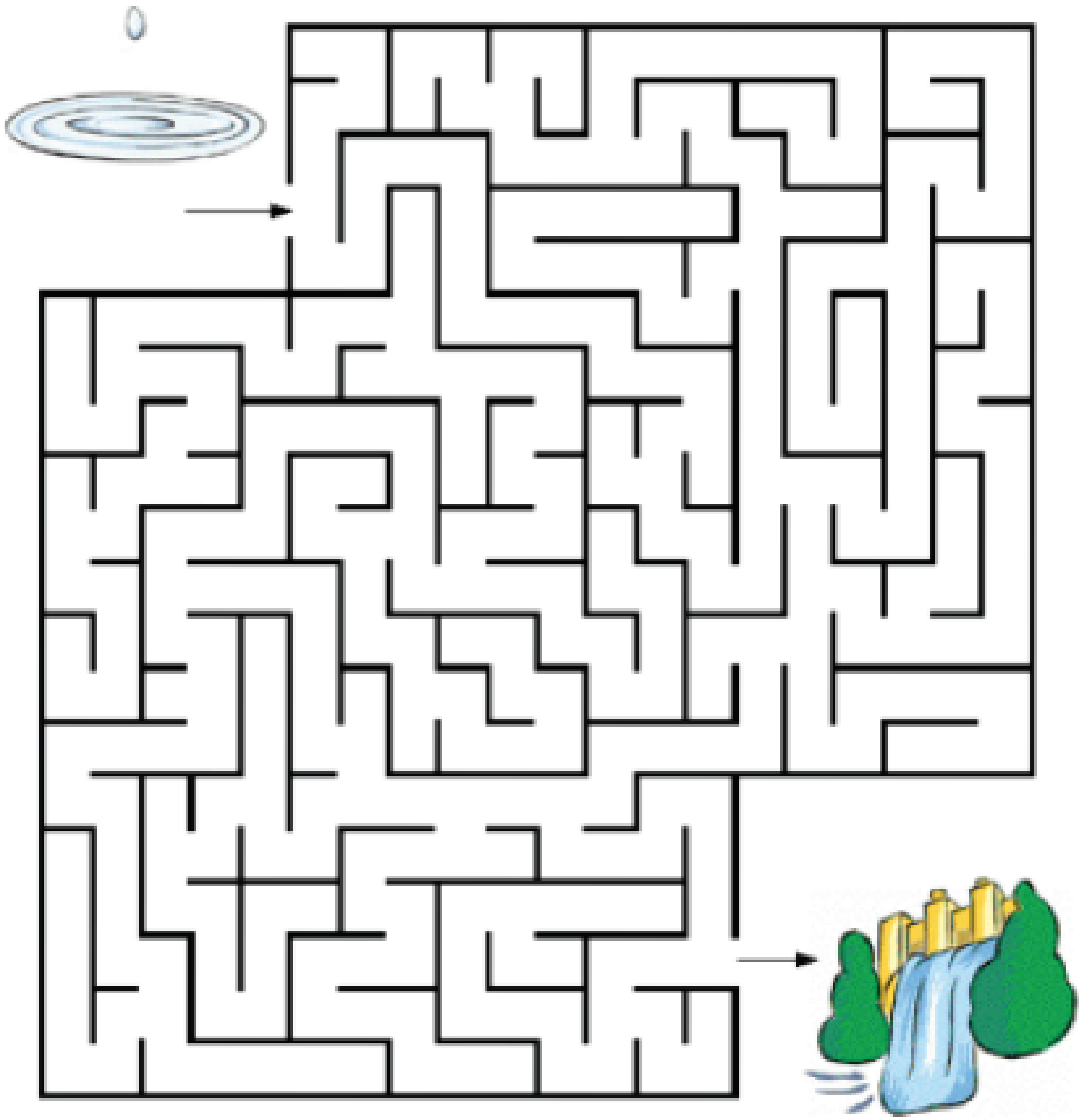

ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার

পরের দিন ক্লাসে খুশি আপা এসে সবাইকে শুভেচ্ছা জানালেন।

তখন রনি বলল, আপা আমরা পৃথিবীর উপরি ভাগের পানির উৎসগুলো দেখলাম, কিন্তু আমরা যে পানি পান করি তার অধিকাংশই তো আসে মাটির নিচ থেকে। তাহলে মাটির নিচের পানির জন্যেও কি কোনো সমস্যা তৈরি হচ্ছে?

মিলি বলল, রনি আমরা যদি কোনো সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করি তাহলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়, তাই না আপা?

খুশি আপা বললেন, ঠিক তাই মিলি, যেকোনো সম্পদের পরিমিত ব্যবহারই সেই সম্পদের স্থায়িত্ব বাড়াতে পারে।

চলো আমরা কিছু ছবি দেখি

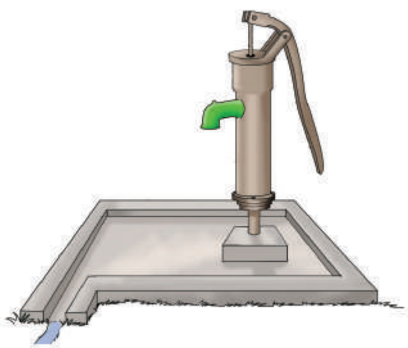

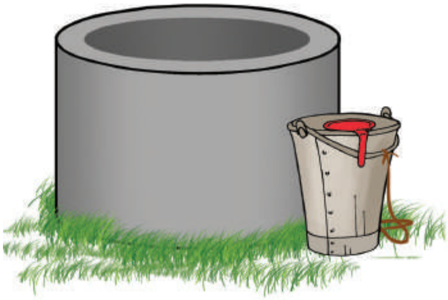

প্রশ্ন:

উপরে দেখানো ছবিতে পানির উৎসগুলো কোথায়?

এই পানি সাধারণত আমরা কোন কোন কাজে ব্যবহার করি?

মেহবুব বলল, আপা এগুলো তো সবই মাটির নিচের পানি যা আমরা সাধারণত পানীয় হিসেবে বা কৃষিকাজে ব্যবহার করে থাকি। তাই এগুলো তো কোনোভাবে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখা সম্ভব নয়।

মিলি বলল, তা হয়তো নয় কিন্তু বেশি বেশি তুলে নিলে আর নাও পেতে পারি।

আনুচিং বলল, আপা আমাদের গ্রামের বাড়ি বান্দরবানে খাবার পানির খুব সংকট, অনেক দূরের ছড়া বা ঝর্না থেকে আনতে হয়, কিন্তু যখন বৃষ্টি কম হয় তখন ছড়াগুলো শুকিয়ে যায়, আমাদের তখন অনেক কষ্ট হয়।

খুশি আপা বললেন, আসলে আনুচিং তোমরা যেখানে থাকো সেটা পাহাড়ি এলাকা, ওখানে মাটির নিচে পানির স্তর অনেক নিচে থাকে যার কারণে বৃষ্টি কম হলে বা শুষ্ক মৌসুমে ওখানে পানির কষ্ট বেশি হয়।

রনি বলল, কিন্তু আপা আমার মামার বাড়ি তো সাতক্ষীরাতে, ওখানে তো পাহাড় নেই তবুও খাবার পানির অনেক কষ্ট। আর নলকূপের পানি এত লবণাক্ত যে খাওয়াই যায় না।

মিলি বলল, আমার মনে হয় রনি সাতক্ষীরা তো সমুদ্রের অনেক কাছাকাছি আর আমরা আগেই জেনেছি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। তাই হয়তো মাটির নিচের পানির সাথে সমুদ্রের পানি মিশে যাচ্ছে আর নলকূপ দিয়ে লবণাক্ত পানি আসছে।

খুশি আপা বললেন, তোমাদের ধারণা অনেকটাই সঠিক।

শিহান বলল, আপা দিনদিন পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, আর এই বেশি মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য গড়ে উঠছে বেশি বেশি কলকারখানা।

আনুচিং বলল, হ্যাঁ আর কলকারখানায় তো অনেক পানি লাগে। যার ফলে বেশি পানি তোলার প্রয়োজন হবে এবং পানির স্তর ক্রমাগত নেমে যাবে এবং পানি তোলার ব্যয় ও বেড়ে যেতে পারে।

রনি বলল, পানির প্রাপ্যতা কমে যেতে পারে এমনকি ভূগর্ভস্থ পানিতে দূষণের ঝুঁকিও দেখা দিতে পারে।

মিলি বলল, মাটির নিচ থেকে অতিরিক্ত পানি তোলা চলতে থাকলে ভূমিধ্বসের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

খুশি আপা বললেন, চমৎকার তোমরা সবাই যদি এভাবেই সমস্যা চিহ্নিত করতে পার তাহলে নিশ্চয় আমাদের দায়িত্ব কী কী হবে সেগুলোও তোমরা খুঁজে বের করতে পারবে তাই না?

ওরা সবাই একসাথে বলে উঠল অবশ্যই আপা।

তখন ওরা দলে ভাগ হয়ে ওদের এলাকার ভূগর্ভস্থ পানি টেকসই করার জন্য কী কী কর্মসূচি নেওয়া যায় তা ঠিক করল এবং কাজটি শেষ হলে কেউ কেউ লিখে আবার কেউ কেউ ছবি এঁকে তা উপস্থাপন করল।

মিলি ও তার বন্ধুদের তৈরি ভূগর্ভস্থ পানি রক্ষার উপায় সম্পর্কিত পোস্টার

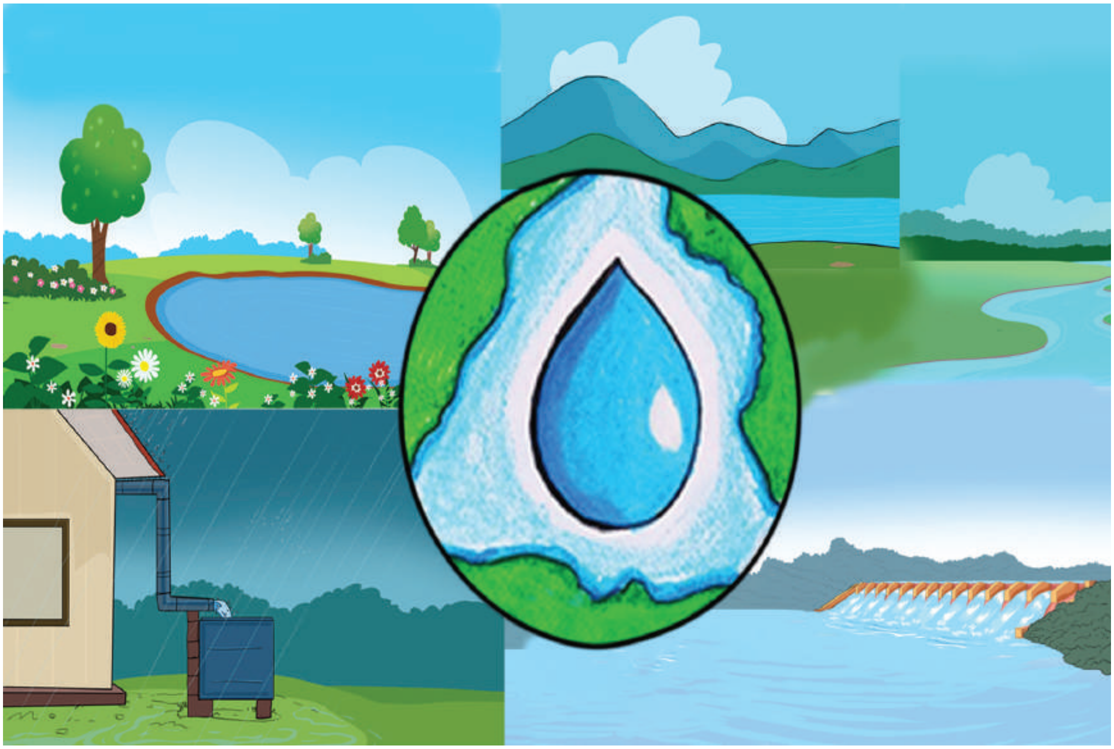

চলো আমরাও আমাদের এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি রক্ষায় কী কী কর্মসূচি নেওয়া যেতে পারে তা বন্ধুরা মিলে ঠিক করি এবং প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের সহযোগিতায় তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি।

খনিজ সম্পদ জীবাশ্ম জ্বালানি

সালমা ক্লাসে এসে বলল, বাসায় সিলিন্ডারের গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়ায় নতুন সিলিন্ডার লাগাতে হয়েছে। তাতে রান্নার একটু দেরি হওয়ায় স্কুলে আসতে সামান্য দেরি হয়ে গেছে।

রনি বলল, তাদের বাসায় লাইনের গ্যাস থাকায় এরকম সমস্যা হয় নাই।

আনুচিং বলল, এই যে আমরা রান্না বা কলকারখানায় গ্যাস ব্যবহার করি বা গাড়িতে যে গ্যাস ব্যবহার করা হয় এত এত গ্যাস কোন জায়গা থেকে আসে?

মিলি বলল, কেন আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে তো জেনেছিলাম প্রাকৃতিক গ্যাস একটি সম্পদ।

শিহান বলল, হ্যাঁ আর এটি একটি নবায়নযোগ্য সম্পদ নয়।

রনি বলল, ও হ্যাঁ কিন্তু যেহেতু এটা নবায়নযোগ্য নয় তাহলে তো এটা ফুরিয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না!

মিলি বলল, তাহলে তো খুব বিপদ হবে।

এই সময় খুশি আপা ক্লাসে প্রবেশ করে সবাইকে শুভেচ্ছা জানালেন এবং জানতে চাইলেন ওরা কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছে।

মিলি বলল, আপা আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ে কথা বলছিলাম এবং আমাদের খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে যদি প্রাকৃতিক গ্যাস একসময় শেষ হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের খুব সমস্যায় পড়তে হবে।

খুশি আপা বললেন, এটা আসলেই চিন্তার বিষয়, তবে যেকোনো সমস্যারই তো কোনো না কোনো সমাধান থাকে। তাই না!

রবিন বলল, ঠিক তাই আপা এবং আমাদের উচিত দুশ্চিন্তা না করে সেই সমাধানের পথ খুঁজে বের করা।

খুশি আপা বললেন, চমৎকার প্রস্তাব চলো তাহলে আমরা আগে একটি ফ্লো-ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখে নিই প্রাকৃতিক গ্যাস বা এ ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানি কীভাবে তৈরি হয়।

কীভাবে কয়লা তৈরি হয়

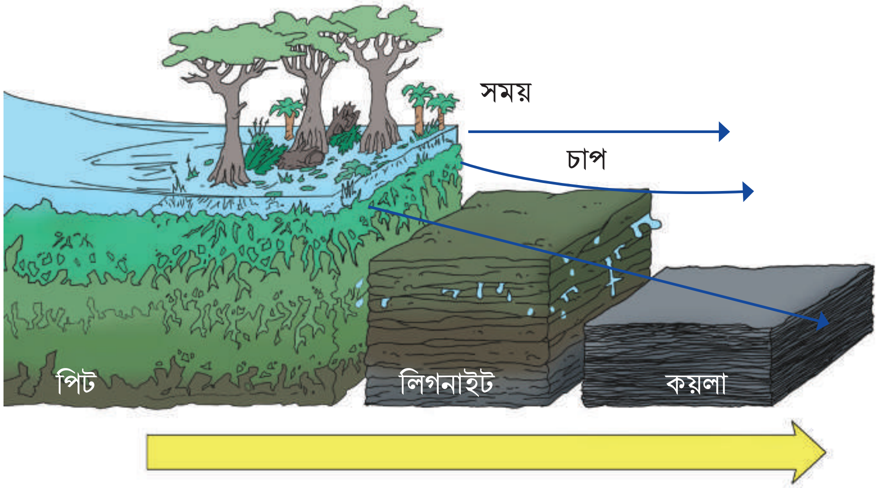

১. কোটি কোটি বছর আগে, পৃথিবীর বড় একটা অংশ জলাভূমিতে আচ্ছাদিত ছিল। যখন জলাভূমির উদ্ভিদগুলো প্রাকৃতিক/অন্য কোনো অজানা কারণে মারা গেল তখন সেগুলো নিচে ডুবে গেল।

২. ক্ষয়প্রাপ্ত উদ্ভিদ একটি নরম স্তর তৈরি করল যাকে পিট বলে। সময়ের সাথে সাথে এই পিট কাদা এবং বালুর নিচে চাপা পড়ে গেল।

৩. সময়ের সাথে ধীরে ধীরে এই কাদা ও বালু পাথরে পরিণত হলো এবং পিট কয়লায় পরিবর্তিত হয়ে গেল।

জেনে রাখো

জীবাশ্ম জ্বালানি হলো এক প্রকার জ্বালানি। হাজার হাজার বছর ধরে মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর পচন প্রক্রিয়ায় বায়ুহীন পরিবেশে উচ্চ তাপ ও চাপে যা মাটির নিচে তৈরি হয়। জীবাশ্ম জ্বালানির উদাহরণ: কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল।

ডায়াগ্রাম দেখা শেষ হলে রনি বলল, আপা তাহলে তো যেকোনো জীবাশ্ম জ্বালানি তৈরি হতে অনেক অনেক বছর সময় লাগে!

খুশি আপা বললেন, হ্যাঁ রনি ঠিক বলেছ।

আনুচিং বলল, আপা আমরা তো জানি যে জীবাশ্ম জ্বালানি একপ্রকার খনিজ সম্পদ। আমাদের দেশেও যেমন নানা ধরনের খনিজ সম্পদ আছে তেমন পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতেও তো আছে।

খুশি আপা বললেন, আমরা সেগুলো কোথায় আছে তা কিসের সাহায্যে বের করতে পারি?

সবাই একসাথে বলে উঠল মানচিত্র...

তখন খুশি আপা বললেন, চলো তাহলে পৃথিবী এবং বাংলাদেশের মানচিত্রের সাহায্যে খুঁজে বের করি পৃথিবী ও বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদের অবস্থান এবং তা ছকে পূরণ করে ফেলি।

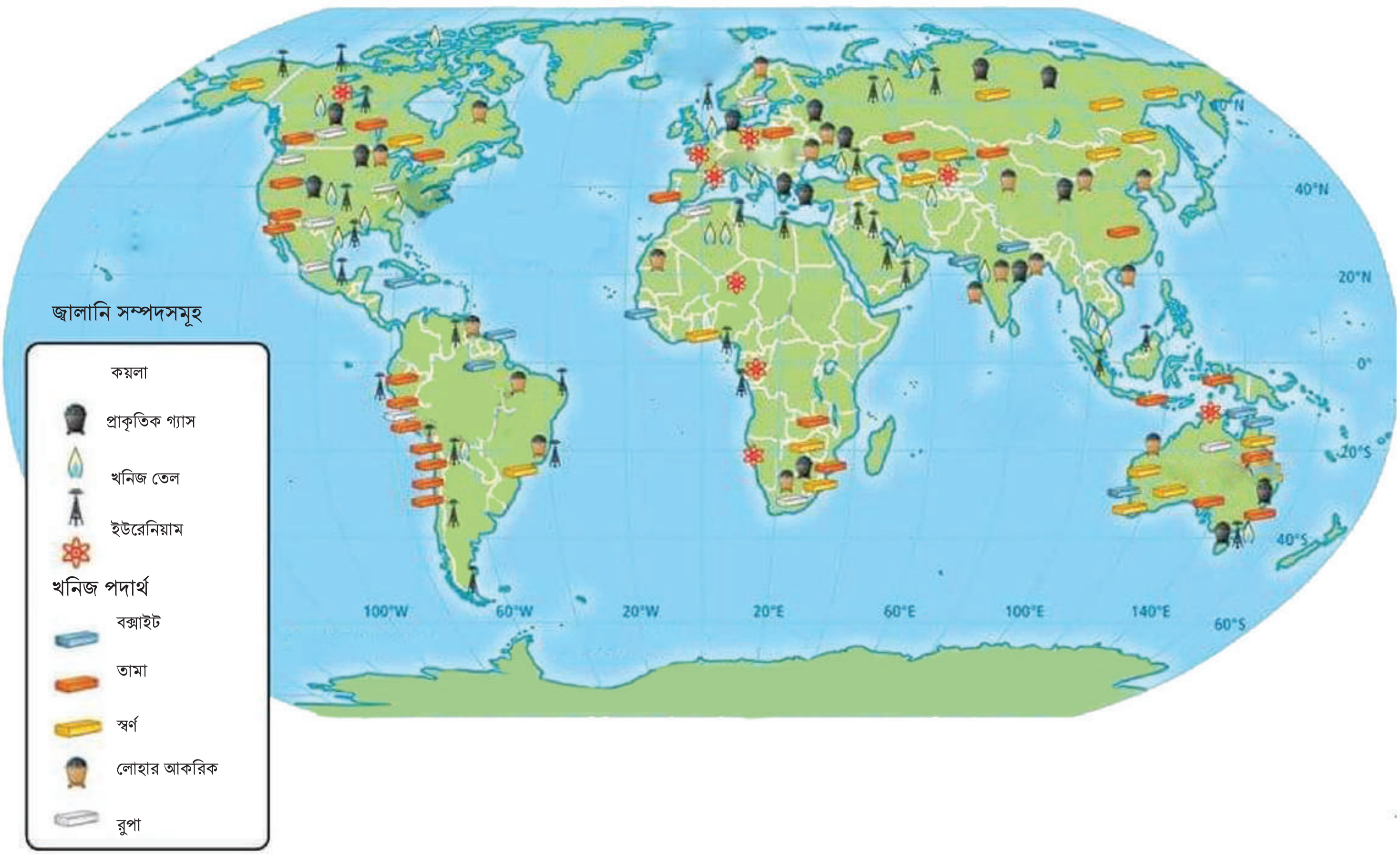
জ্বালানি সম্পদসমূহ
কয়লা
প্রাকৃতিক গ্যাস
খনিজ তেল
ইউরেনিয়াম
খনিজ পদার্থ
বক্সাইট
তামা
স্বর্ণ
লোহার আকরিক
রুপা
100°W
60°W
20°W
20°E
60°E
100°E
140°E
60°S
40°S
20°S
0°
20°N
40°N

বাংলাদেশ
খনিজ সম্পদ
৫০ ০ ৫০
কিলোমিটার
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
আসাম (ভারত)
মেঘালয় (ভারত)
আসাম (ভারত)
ত্রিপুরা (ভারত)
মিজোরাম (ভারত)
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
আরাকান (মিয়ানমার)
বঙ্গোপসাগর
প্রাকৃতিক গ্যাস
খনিজ তৈল
কয়লা
পিট
চুনাপাথর
কঠিন শিলা
ভারী খনিজ
চীনামাটি
কাঁচবালি

পৃথিবীর মানচিত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য পূরণের ছক

খনিজ সম্পদের নাম	বিদ্যমান মহাদেশের নাম

বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য পূরণের ছক

খনিজ সম্পদের নাম	বিদ্যমান স্থানের নাম

ছক পূরণের কাজটি শেষ হলে সালমা বলল, আপা আমরা সারা বিশ্বে অনেক ধরনের খনিজ সম্পদ দেখলাম, আবার আমাদের বাংলাদেশেও অনেক ধরনের খনিজ সম্পদ আছে। এখন যদি আমরা একটি প্রকল্পভিত্তিক কাজের মাধ্যমে এসব সম্পদ কী অবস্থায় আছে, কোন সম্পদ কী কী কাজে লাগে অথবা এসব সম্পদ উত্তোলনের সময় কী কী পরিবেশগত সমস্যা হতে পারে এবং এসব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপায় কী, এসব বিষয় বের করে আনতে পারি তাহলে ভালো হয়।

খুশি আপা বললেন, খুব ভালো প্রস্তাব, তোমরা প্রকল্পভিত্তিক কাজ ষষ্ঠ শ্রেণিতে করেছ। তাহলে সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কাজ শুরু করে দাও।

তখন ওরা প্রথমে দলে ভাগ হয়ে প্রত্যেক দল একটি করে খনিজ সম্পদ বেছে নিল। তারপর তারা যা যা জানতে চায় সেসব বিষয়ের ওপর প্রশ্ন তৈরি করল।

প্রশ্ন:

প্রশ্ন তৈরি করা হলে সাফিন ওর বন্ধুদের বলল, এখন তথ্য সংগ্রহ করার কাজটি আমরা কীভাবে করতে পারি?

রনি বলল, সব থেকে ভালো উপায় হবে আমরা যদি সরাসরি একটি খনি এলাকা দেখতে যাই, আর আমাদের দেশে তো অনেক বড় বড় কয়লাখনি আছেই।

রবিন বলল, খুব ভালো প্রস্তাব।

শিহান বলল, আমরা এমন কারো সাহায্য নিতে পারি যিনি বড়পুকুরিয়া কয়লাখনিতে কাজ করেন।

মিলি বলল, এতো অনেক ভালো প্রস্তাব, এছাড়া আমরা ইন্টারনেট থেকে ভিডিও, তথ্য অথবা এই বিষয়ের ওপর লেখা বইয়ের সাহায্য নিতে পারি।

রনি বলল, অবশ্যই তা করতে হবে। কারণ এটি প্রকল্পভিত্তিক কাজ আর এ কাজে বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা একটি ধাপ আছে।

শিহান বলল, ঠিক বলেছ রনি, আর এবার আমাদের প্রকল্পের ফলাফল আমরা ইলেকট্রনিক পত্রিকা বা হাতে তৈরি পত্রিকা তৈরি করে প্রকাশ করলে কেমন হবে?

মিলি বলল, এটা অনেক ভালো প্রস্তাব, কারণ আমরা ডিজিটাল প্রযুক্তি ক্লাসে তো ইলেকট্রনিক পত্রিকা তৈরি করা শিখেছি। আর ই-পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের বিদ্যালয়ের বাইরেও অনেককে খুব সহজেই কাজ সম্পর্কে জানাতে পারব।

এরপর ওরা সবাই খুশি আপার সহযোগিতায় ওদের এলাকার কাছাকাছি একটি কয়লাখনিতে ভ্রমণের নিয়মাবলি মেনে পরিদর্শন করল। পরে প্রকল্পের কাজটি শেষ করে ওদের প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে একটি ইলেকট্রনিক পত্রিকা তৈরি করল।

পত্রিকার কাজ শেষ হলে খুশি আপা বললেন, তোমরা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদকে কীভাবে সুষ্ঠু ব্যবহারের

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

মাধ্যমে টিকিয়ে রাখতে পারি তা দেখিয়েছ। কাজটি সুন্দর হয়েছে।

সম্পদের ব্যবহার ও টেকসই উন্নয়ন

কাজটি শেষ হলে আনুচিং বলল, আপা আমরা তো দেখলাম পৃথিবী এবং বাংলাদেশে কী কী ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ আছে আর মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে কীভাবে এসব সম্পদ দিন দিন ব্যবহারের হার বাড়িয়ে দিচ্ছে। এসব দেখে আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

খুশি আপা বললেন, কী ধরনের দুশ্চিন্তা আনুচিং?

আনুচিং বলল, আপা দিন দিন তো মানুষের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু এসব সম্পদের পরিমাণ তো দিন দিন কমছে, আর একবার শেষ হয়ে গেলে তো এগুলো সহজে পাওয়া যাবে না! তাহলে আমাদের কি এসব সম্পদ ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া উচিত?

মিলি বলল, কিন্তু ব্যবহার বন্ধ করে দিলে তো আমাদেরও অনেক অসুবিধায় পড়তে হবে! পানি ছাড়া বেঁচে থাকব কি করে! এক দিন বাসায় গ্যাস না থাকায় খাবারের কত কষ্ট পেলাম!

রনি বলল, তাহলে উপায়!

শিহান বলল, আমরা যদি এসব সম্পদের ব্যবহারে যত্নবান হই অর্থাৎ অপচয় না করি তাহলে নিশ্চয় কিছুটা খরচ কম হবে।

রনি বলল, যদি এমন কোনো উৎস খুঁজে পাই! যেমন সৌরশক্তি, এটা কাজে লাগানো যেতে পারে, এটা তো সহজে শেষ হবে না, তাই না?

মিলি বলল, বাতাসের শক্তিকে কিংবা বৃষ্টির পানিকেও কাজে লাগাতে পারি।

খুশি আপা বললেন, অর্থাৎ তোমরা বলতে চাইছ আমরা যদি সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার করতে পারি তাহলে কিছুটা সমস্যা কম হতে পারে, তাই তো?

সবাই একসাথে বলল, ঠিক তাই আপা।

খুশি আপা বললেন, আমরা এতক্ষণ যেসব সম্পদ ব্যবস্থাপনার কথা বলেছি তাকে বলে টেকসই ব্যবস্থাপনা। আর কোনো কিছুর ব্যবস্থাপনা টেকসই করতে গেলে প্রথমে সেটি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে।

জেনে রাখো

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের যেসব বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণ বা ঘাটতি অথবা বাঁধার সৃষ্টি হয়ে না দাঁড়ায়, সেই ধরণের পরিকল্পিত উন্নয়নই হলো টেকসই উন্নয়ন বা Sustainable Development।

রনি বলল, আপা এই পৃথিবী আমাদের বেঁচে থাকার সবকিছুই দিয়েছে। এখন আমাদের এমনভাবে পৃথিবীর সকল সম্পদ ব্যবহার করতে হবে যেন আমাদের পরেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মও তা ব্যবহার করে বেঁচে থাকতে পারে।

মিলি বলল, ঠিক তাই নাহলে তো এই পৃথিবীতে মানবসভ্যতা আর টিকে থাকতে পারেনা।

খুশি আপা বললেন, তোমাদের কথা একদম ঠিক। তাহলে এখন আমাদের করণীয় কী হতে পারে?

মিলি বলল, আপা আমরা যদি আমাদের প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাব ও সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে এমন কিছু কাজের তালিকা তৈরি করে বাস্তবায়নের চেষ্টা করি, যা এসব সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করবে, তাহলে কেমন হবে?

রনি বলল, খুবই ভালো প্রস্তাব।

চলো তাহলে আমরা কীভাবে সম্পদের ব্যবহার টেকসই করা যায় এবং আমাদের সবার পরিবারে, আমাদের বিদ্যালয়ে অথবা আমাদের এলাকায় সেসব কাজ বাস্তবায়নের উপায় কী হতে পারে তা আলোচনা করে বের করি।

তখন ওরা দলে ভাগ হয়ে পরিবার, বিদ্যালয় ও নিজেদের এলাকায় সম্পদের টেকসই ব্যবহারে ভূমিকা রাখে এমন কিছু কাজের তালিকা তৈরি করল যা তারা বছরব্যাপী নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

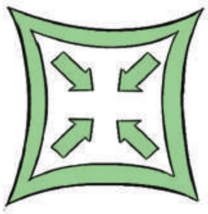
কমানো

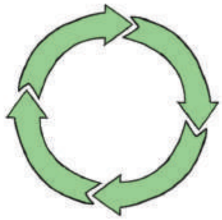
পুনরায় ব্যবহার

পুনর্ব্যবহার

পরিবারে সম্পদের টেকসই ব্যবহারমূলক কাজ

১. ব্যবহারের সময় ছাড়া পানির কল বন্ধ রাখা

২. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বিদ্যুতের সুইচ বন্ধ করা

৩. বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা।

৪. ....

৫. ....

৬. ....

বিদ্যালয়ে সম্পদের টেকসই ব্যবহারমূলক কাজ

১. বিদ্যালয়ে যেখানে বর্জ্য ফেলা হয় তা পর্যবেক্ষণ করা এবং যেখানে পুনর্ব্যবহার হতে পারে তা নোট করা।

২. শ্রেণিকক্ষসহ বিদ্যালয়ের লাইট বা ফ্যান ও অন্যান্য বৈদুযতিক যন্ত্রাংশ (যেমন কম্পিউটার) যখন ব্যবহার করা না হয় তখন সেগুলো বন্ধ করে রাখা।

৩. কম্পিউটারগুলোকে যখন ব্যবহার না করা হয়, তখন শক্তি সংরক্ষণের জন্য স্লিপ মোডে রাখতে সবাইকে অনুরোধ করা।

৪. ....

৫. ....

৬. ....

সমাজে সম্পদের টেকসই ব্যবহারমূলক কাজ

১. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পচনশীল ও অপচনশীল এই দুই ধরনের বর্জ্য আলাদা করে সংগ্রহ করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভায় অনুরোধপত্র প্রেরণ।

২. এলাকায় যেসব পুকুর, খাল বা অন্যান্য পানির উৎস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে তোলার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভায় অনুরোধপত্র প্রেরণ।

৩. এলাকায় পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎসহ সব ধরনের প্রাকৃতিকসম্পদ ব্যবহারে সচেতনতামূলক পোস্টার বিলি করা।

৪. ....

৫. ....

৬. ....

শেষে ওরা পরিবার ও বিদ্যালয়ের যে যে কাজের তালিকা করেছিল সেগুলো বাস্তবায়ন শুরু করল আর এলাকার টেকসই উন্নয়নমূলক কাজগুলো এলাকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও বয়স্ক ব্যক্তিদের সহযোগিতায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করল।

খুশি আপা ওদের কাজ দেখে খুব খুশি হয়ে বললেন, তোমরাই পারবে একদিন এই পৃথিবীটাকে বদলে দিতে।

সম্পদের কথা

সুপ্তি আর জাহিদ খেলার মাঠে খেলছে। এই সময় তমা এসে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, তার স্কুলের জামাটি খেলতে গিয়ে এক জায়গায় সামান্য ছিঁড়ে গেছে। জাহিদ তমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'কেঁদোনা আমার বাবা খুব ভালো সেলাই করেন। তোমার জামাটা সেলাই করে দেবেন। আমিও সেলাই কাজ পারি'। সুপ্তি বলল, 'আচ্ছা জামার কাপড় তো সুতা দিয়ে তৈরি হয়। তাহলে আমরা সুতা না কিনে জামার কাপড় কিনি কেন?' জাহিদ বলল, বাবা তো সুতা কেনেন জামা সেলাই করার জন্য। কিন্তু জামার কাপড়ের যে সুতা সেটা তাহলে কে কেনে? সুপ্তি বললো, পরের ক্লাসে আমরা তাহলে খুশি আপার কাছ থেকে জেনে নেবো।

খুশি আপা ক্লাসে আসার পর সুপ্তি বলল, আপা, জামা বানানো হয় কাপড় দিয়ে, কাপড় বানানো হয় সুতা দিয়ে, আমরা সুতা না কিনে জামা কিনি কেন? খুশি আপা বলল, কারণ সুতা দিয়ে যে কাপড় তৈরি করা হয় সেটার যন্ত্র আমাদের সবার কাছে নেই। সেই সাথে বানানোর কৌশলও আমরা সবাই জানিনা। সাধারণত তাঁত যন্ত্র দিয়ে কারখানায় কাপড় তৈরি হয়। খুশি আপা জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি জানো সুতা কোথা থেকে তৈরি করা হয়? জাহিদ বলল, বাবার কাছে শুনেছি সুতা তৈরি হয় তুলা থেকে। খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছো জাহিদ। এখন তাহলে চলো আমরা সবাই কয়েকটি ছবি দেখি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

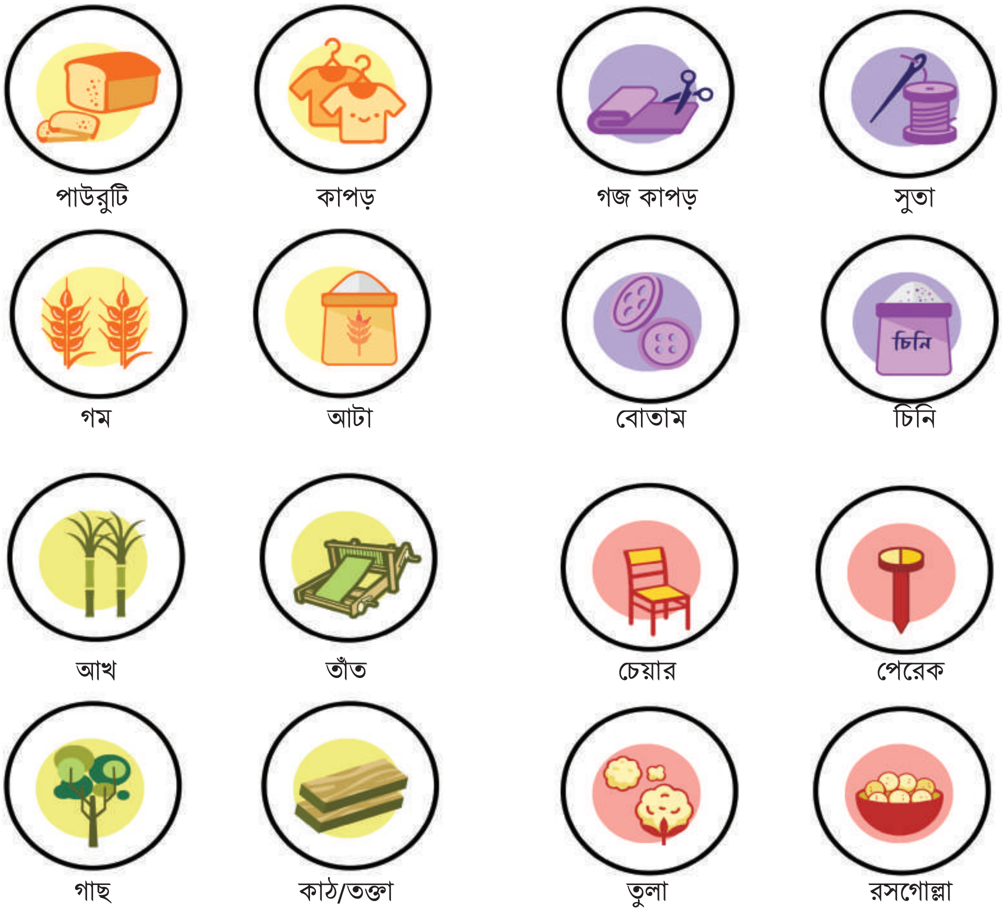

চিত্র: বিভিন্ন ধরণের পণ্য সামগ্রী

নীরা বলল, 'আপা, জিনিসগুলো আমরা প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করে থাকি। এগুলোকে আমরা বিভিন্ন দ্রব্য বা পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে থাকি। তাই না আপা? খুশি আপা বললেন, 'একদম ঠিক বলেছ। এই দ্রব্যগুলোর কিছু আমরা সরাসরি ব্যবহার করি। কিছু কিছু আমরা সরাসরি ব্যবহার করি না। চলো উপরের ছবিগুলোর কোনটি আমরা সরাসরি ব্যবহার করি আর কোনটি সরাসরি ব্যবহার করি না তার একটি ছক পূরণ করি।'

ক্রম	সরাসরি ব্যবহার করি	সরাসরি ব্যবহার করি না

সুপ্তি বললো, আপা আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে জেনেছি, যে জিনিস বিক্রি করার জন্য তৈরি হয় অর্থাৎ যে জিনিসের বিনিময় মূল্য রয়েছে, সেটি পণ্য হিসেবে আখ্যায়িত হয়। আর যে জিনিস আমরা সরাসরি ব্যবহার করি সেটি দ্রব্য। খুশি আপা বললেন, "ঠিক তাই। তবে দ্রব্য আর পণ্য- এ দুটি শব্দ আমরা উভয় ক্ষেত্রেও ব্যবহার করে থাকি। এই দ্রব্য বা পণ্যগুলোর মধ্যে যেগুলো আমরা সরাসরি ব্যবহার করি তাদের বলা হয় চূড়ান্ত দ্রব্য বা পণ্য। যেগুলো সরাসরি ব্যবহার না করে চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করে থাকি সেগুলোকে আমরা মধ্যবর্তী দ্রব্য বা পণ্য বলে থাকি। কিছু কিছু দ্রব্য ব্যবহৃত হয় মাধ্যমিক দ্রব্য উৎপাদনের কাজে, যাদের আমরা প্রাথমিক দ্রব্য বা পণ্য বলে থাকি। তাহলে এখন আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কিছু দ্রব্য বা পণ্যের তালিকা করে কোনটি চূড়ান্ত, মধ্যবর্তী ও প্রাথমিক দ্রব্য বা পণ্য তা লিখে ফেলি।'

ক্রম	প্রাথমিক দ্রব্য	মধ্যবর্তী দ্রব্য	চূড়ান্ত দ্রব্য
১.	তুলা	সুতা	কাপড়
২.			
৩.			
৪.			

খুশি আপা বললেন, তোমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করেছ কী? প্রাথমিক দ্রব্য/পণ্য যতগুলো রয়েছে তা আমরা প্রকৃতি থেকে পেয়ে থাকি। মধ্যবর্তী দ্রব্যগুলো আমরা প্রাথমিক দ্রব্যকে রূপান্তরের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। মধ্যবর্তী দ্রব্যকে রূপান্তরিত দ্রব্য হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়।

এরপর খুশি আপা ক্লাসের সবাইকে বললেন চলো আমরা নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজি

প্রশ্ন	উত্তর
শীতকালে আমরা কী ধরনের পোশাক পরিধান করি?	
শীতকালে আমরা এরকম পোশাক কেন পরিধান করি?	
বাজারে গ্রীষ্মকালে শীতের কাপড় কেন পাওয়া যায় না বা কম পরিমাণে পাওয়া যায়।	

খুশি আপা বললেন, যেকোনো জিনিসের উৎপাদন তখনই হয় যখন এটি উপযোগ বা সন্তুষ্টি তৈরি করতে পারে।

অর্থনীতিতে তাই কোনো পণ্য বা দ্রব্য উপযোগ বা সন্তুষ্টি সাধনে সক্ষম হলে তাকে উৎপাদন হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাই শীতকালে সোয়েটারের উৎপাদন বেশি হয় কারণ এটির উপযোগ তখন বেশি। রূপা বলল, গরমকালে আইসক্রিমের উৎপাদন বেশি কারণ তখন এটার উপযোগ বেশি। খুশি আপা বললেন, ঠিক তাই।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এরপর খুশি আপা বললেন, চলো এবার আমরা ৩ বা চারটি দলে ভাগ হয়ে যাই। তারপর কয়েকটি দ্রব্যের/পণ্যের তালিকা তৈরি করে কোনটার উপযোগিতা কখন বেশি সেটি বের করি। তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য একটি করে উদাহরণ দেওয়া হলো

ক্রম	পণ্য	কখন উপযোগ বেশি
১.	ছাতা	গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে
২.		
৩.		
৪.		

খুশি আপা ক্লাসে এসে বললেন, 'তোমরা গত কয়েকটি ক্লাসে উৎপাদন, পণ্য ও দ্রব্য নিয়ে জেনেছ। তোমরা কি জানো গার্মেন্টেসে কীভাবে পোশাক তৈরি করা হয়? লাবণ্য বলল, জ্বি আপা, আমার বাসার পাশেই একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। আমি দেখেছি সেখানে অনেক গার্মেন্টস কর্মী পোশাক তৈরির কাজ করে। অনেক অনেক পোশাক তৈরি হয় সেখানে। খুশি আপা বললেন, দেখতো লাবণ্য এই ছবিটার সাথে তোমার দেখা পোশাক তৈরির কারখানার মিল খুঁজে পাও কিনা? চলো আমরা সবাই ছবিটা দেখি।

পোশাকশিল্পে কর্মরত পোশাক শ্রমিক

লাবণ্য ছবি দেখে বলল, অনেকটাই মিলে গেছে। খুশি আপা সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'চলো আমরা ৩/৪টি দলে ভাগ হয় যাই। তারপর চিত্রটি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজি।

প্রশ্ন	উত্তর
১. পোশাক উৎপাদনের জন্য কি কি লাগে?	
২. কারা পোশাকগুলো তৈরি করছে?	
৩. পোশাকগুলো কোথায় উৎপাদিত হচ্ছে?	
৪. পোশাক উৎপাদনের জন্য শ্রমিকদের বিনিময়ে কি দেওয়া হয়?	
৫. উৎপাদিত পোশাকটিকে কখন পণ্য বলা হবে?	
৬. পোশাক উৎপাদন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যিনি থাকেন তাকে কি বলা হয়?	

খুশি আপা বললেন, আমরা যে উত্তর খুঁজলাম সেখান থেকেই উৎপাদনের অনেক তথ্য পেয়ে গেছি। চলো এবার দেখি সব তথ্য আমাদের লেখায় এসেছে কিনা। মনে রেখো পণ্য উৎপাদনের জন্য কারখানা বা ভবন এবং টাকা লাগবে যাকে মূলধন বলে। ভবন স্থাপনের জন্য ভূমি বা জমি লাগবে। পণ্য উৎপাদনের জন্য শ্রমিক লাগবে। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, একজন মালিক বা সংগঠক লাগবে যিনি একটি সংগঠন গড়ে তুলবেন এবং ভূমি, মূলধন ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে পণ্য উৎপাদন করবেন। এইসব গুলোকেই উৎপাদনের উপকরণ বলে।'

স্নিগ্ধ বললো, আপা, একটা পাউরুটি উৎপাদন করতে কি কি উপকরণ ব্যবহার করা হয় তা যদি আমরা চিন্তা করি। তাহলে দেখবো পাউরুটি উৎপাদন করার একটি কারখানা থাকতে হবে। এই কারখানা বা ভবনকে আমরা মূলধন (Capital) বলতে পারি।

সাথী বললো, এরপর পাউরুটি তৈরির কাঁচামাল গম যা থেকে ময়দা পাওয়া যায়। এই গম প্রকৃতি থেকে বা ভূমি (Land) থেকে চাষাবাদের মাধ্যমে পাওয়া যায়। তাই না আপা?

খুশি আপা বললেন, একদম ঠিক। খুশি আপা বললেন, পাউরুটি তৈরি করতে শ্রমিকও প্রয়োজন। শ্রমিক থেকে আমরা শ্রম (Labour) পেয়ে থাকি। সেই সাথে প্রয়োজন সংগঠন (Organization)। সংগঠন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন একজন সংগঠক। সংগঠককে উৎপাদক বা মালিকও বলা যেতে পারে। পাউরুটি তৈরি করতে একজন উৎপাদক বা মালিক বা সংগঠক লাগে। তিনি উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ ভূমি, মূলধন এবং শ্রমকে কাজে লাগিয়ে পাউরুটি তৈরি করেন।

এরপর খুশি আপা বললেন, এখন আমরা উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান নির্ণয় করে এর নামগুলো চিত্রটির শুন্যস্থানে লিখি।

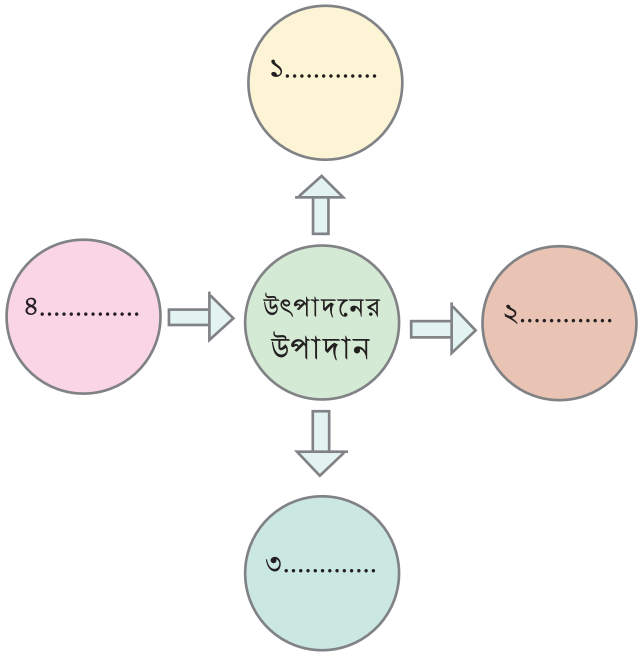

উৎপাদনের উপাদানের চিত্র

এবার খুশি আপা বললেন, চলো আমরা দলে ভাগ হয়ে পণ্য উৎপাদন করে এমন একটি সংগঠন নির্বাচন করি। সেই সংগঠনের ভূমি কোনটি, মূলধন ও শ্রম কী হতে পারে তা আলোচনা করি। দলের আলোচনা শেষে আমরা প্রতিটি দলের উপস্থাপনা থেকে প্রাপ্ত সংগঠন, ভূমি, মূলধন ও শ্রম বিষয়ক তথ্য ছকটিতে পূরণ করি।

সংগঠন (Organization)	ভূমি (Land)	মূলধন (Capital)	শ্রম (Labour)
১. বিস্কুট তৈরির কারখানা	এক একর জমি	টাকা, বিস্কুট তৈরির যন্ত্রপাতি, ময়দা, চিনি, ডিম ইত্যাদি	কারখানা কর্মী/শ্রমিক
২.			
৩.			
৪.			

খুশি আপা বললেন আমরা ইতোমধ্যে উৎপাদনের উপকরণ সম্পর্কে জেনেছি। এরপরে চলো উৎপাদনের উপকরণগুলো যারা যোগান দেয় এবং এর বিনিময়ে তারা কি কি পায় সে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজি। আমরা পরিচিত কোনো ব্যবসায়ী বা কারখানার মালিককে প্রশ্ন করে তথ্য বের করব।

উৎপাদনের উপাদান	যোগান দাতা কারা?	বিনিময়ে কি পান?
ভূমি		
শ্রম		
মূলধন		
সংগঠন		

পরদিন খুশি আপা ক্লাসের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, ‘তোমরা সবাই চমৎকার উত্তর লিখেছ। চলো তাহলে আমরা এখন জেনে নিই উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা যাদের হাতে থাকে তারা এর বিনিময়ে কি পান তা একটু অর্থনীতির ভাষায় জেনে নিই। যিনি ভূমি বা ভবন বা কারখানা ভাড়া দিয়ে থাকেন তিনি খাজনা (Rent) পেয়ে থাকেন। যিনি শ্রমিক তিনি কায়িক পরিশ্রম বা মানসিক শ্রম করে থাকেন তিনি পরিশ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ পান সেটি হচ্ছে মজুরি (Wage)। যিনি মূলধন যোগান দিয়ে থাকেন তিনি সুদ (Interest) পেয়ে থাকেন। আর যারা সংগঠক বা মালিক বা উদ্যোক্তা মুনাফা পেয়ে থাকেন।’

খুশি আপা বললেন, চলো তাহলে আমরা শূণ্যস্থানটি পূরণ করি। তোমাদের সুবিধার জন্য একটি করে দেওয়া হলো।

ভূমি	→ খাজনা	শ্রম	→ __________
মূলধন	→ __________	সংগঠন	→ __________

উৎপাদন উপাদানের আয়

খুশি আপা বললেন, শ্রমের বিনিময়ে সংগঠক বা মালিক শ্রমিককে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক প্রদান করেন সেটি মজুরি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সকল প্রকার পারিশ্রমিককে মজুরি বলা হয় না। শুধুমাত্র উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত কৃষি শ্রমিকদের বা শিল্প শ্রমিকদের কায়িক শ্রমের জন্য যে অর্থ দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে মজুরি। আর যেসকল কর্মকর্তা বা অফিস কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের কাজে সরাসরি নিয়োজিত না থেকে মানসিক বা বুদ্ধিভিত্তিক শ্রম দিয়ে থাকেন তাদেরকে শ্রমের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাকে বেতন বলে। যেমন অফিস সহকারী, হিসাব কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক তাদের মানসিক শ্রমের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাকে বেতন বলে।

খুশি আপা আরো বললেন, শ্রমিক অর্থের হিসেবে যে মজুরি পায় সেটি হচ্ছে আর্থিক মজুরি (Nominal wage)। আর যদি শ্রমিক আর্থিক মজুরি ছাড়াও সাথে সাথে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পায় যেমন: বাড়ি ভাড়া, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত বীমা খরচ, যানবহন খরচ ইত্যাদি প্রকৃত মজুরি (Real wage) হিসেবে বিবেচিত হয়।

খুশি আপা বলেন, সংগঠক বা মালিক ভূমি বা কলকারখানার ভবনের জন্য যে ভাড়া প্রদান করেন সেটি হচ্ছে খাজনা (rent) । এক কথায় ভূমির আয় হলো খাজনা। খুশি আপা আরো বলেন, মূলধনের মালিক অন্যকে তার সঞ্চিত অর্থ ধার দিয়ে তার বিনিময়ে যে আয় করেন সেটি (interest) হচ্ছে সুদ।

খুশি আপা বলেন, তাহলে আমরা বুঝতে পারছি একজন উদ্যোক্তা বা মালিক উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণগুলোকে একত্রিত করে ব্যবসা করেন অর্থাৎ কোনো একটি দ্রব্য বা পণ্য উৎপাদন করেন। সেই উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রি করে তার পরিবর্তে আয় করেন। সেই আয় থেকে মজুরি, খাজনা ও সুদ বাদ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তাকে মুনাফা হিসেবে গণ্য করা হয়। মুনাফা হচ্ছে উদ্যোক্তা বা মালিকের আয়।

এরপর খুশি আপা কৃষক করিম চাচার ছবিটি দেখিয়ে বললেন, করিম চাচা কৃষি জমি চাষাবাদ করে আয় করেন, কিন্তু আয়ের পুরোটাই তিনি নিয়ে নিতে পারেন না। কারণ এই আয় থেকেই তিনি প্রতিমাসে মজুরি, খাজনা ও সুদ পরিশোধ করেন। ফলে তার মোট আয় থেকে মজুরি, খাজনা ও সুদ বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেন সেটি বাদ দিলেই যে পরিমাণ অর্থ তার হাতে থাকে সেটি হচ্ছে তার মুনাফা। নিচে করিম চাচার আয় ও ব্যয়ের টাকার পরিমাণ দেওয়া হলো। চলো আমরা এবার দলে বসে করিম চাচার কৃষি জমি থেকে কি পরিমাণ মুনাফা পায় তা বের করি।

জমির খাজনা দেন মাসে ৩,০০০ টাকা

১জন দিনমজুর আছে যাকে প্রতি মাসে মজুরি বাবদ দেন ৩০০০ টাকা।

জমিতে চাষাবাদ করার জন্য একটি ব্যাংক থেকে প্রতিমাসে ৫% সুদে নেওয়া মূলধনের বিপরীতে মোট ৭৭৫০ টাকা পরিশোধ করেন

অন্যান্য উপকরনের ব্যয় ৪০০০ টাকা

উৎপাদিত কৃষি পণ্য বিক্রি করে করিম চাচার এই মাসে আয় হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। উনার মুনাফার পরিমাণ কত?

খুশি আপা বললেন, ‘চলো আমরা নিচের ছকটি পূরণ করি এবং করিম চাচার মুনাফার পরিমাণ বের করি।

মাসিক আয়	মাসিক ব্যয়	
৫০, ০০০ টাকা	খাজনা	
	মজুরি	
	সুদসহ পরিশোধ	
	অন্যান্য উপকরণের ব্যয়	
	মোট ব্যয়	১৭,৭৫০ টাকা

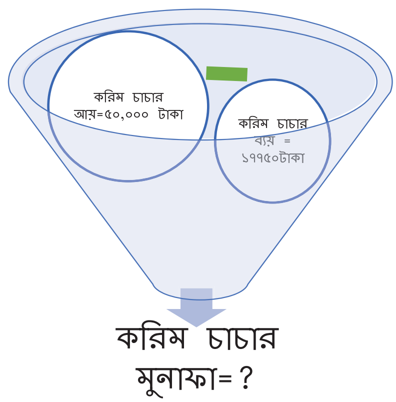

খুশি আপা ক্লাসে এসে দুটি চিত্র দেখিয়ে বললেন। এখানে ২ জন ব্যক্তির আয় ও ব্যয়ের বর্ণনা দেওয়া আছে। চলো আমরা এই দুজন ব্যক্তি সম্পর্কে জেনে নিই।

উদ্যোক্তা

বর্গা চাষি

আয়েশা সুলতানার একটি বিশাল জমি আছে সেখানে তিনি নিজের জমানো টাকা দিয়ে একটি পোশাক তৈরির কারখানা নির্মাণ করেছেন। এজন্য তিনি একটি ৫ তলা ভবন নির্মাণ করেছেন এবং কিছু যন্ত্রপাতি কিনেছেন, শ্রমিক নিয়োগ করেছেন, কারখানা ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি নিজে পরিশ্রম করেন এবং তাকে সহায়তা করার জন্য কয়েকজন কর্মী নিয়োগ করেছেন। সব মিলিয়ে তার ব্যয় ৫ কোটি টাকা। বাজারে তার কারখানায় তৈরি পোশাকের অনেক চাহিদা রয়েছে। তাই তিনি উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে মাসে আয় করেন ১০ লক্ষ টাকা।	রমজান মিয়ার জমি নেই, অন্যের জমিতে বর্গা খাটেন, কিন্তু অসুস্থতার জন্য প্রায়ই তিনি কাজ করতে পারেন না। তিনি ২ রুমের একটি টিন শেডের বাড়িতে ভাড়া থাকেন। তার মাসিক ব্যয় ৮,০০০ টাকা। মাসিক আয় ৭০০০ টাকা। আয় কম হওয়ায় তিনি প্রতিমাসে কারো না কারোর কাছ থেকে টাকা ধার নেন।

খুশি আপা বললেন, চলো তাহলে দলে বসে আমরা আয়েশা সুলতান ও রমজান মিয়ার উৎপাদনের উপাদানগুলো নিচের ছকে লিখে নিই।

আয়েশা সুলতানার উৎপাদনের উপাদান	রমজান মিয়ার উৎপাদনের উপাদান

খুশি আপা বললেন, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়েশা সুলতানার উৎপাদনের উপাদান বেশি থাকায় তার আয় বেশি। রমজান মিয়ার উৎপাদনের উপাদান কম থাকায় তার আয় কম। এভাবেই উৎপাদন উপাদানের ভিত্তিতে ব্যক্তির উপার্জিত আয় বণ্টিত হয়।

খুশি আপা আরও বললেন, এভাবে উৎপাদনের উপাদানের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে সমাজে এক শ্রেণির মানুষের আয় বেশি থাকে আবার উৎপাদনের উপাদানের পরিমাণ কম থাকার কারণে সমাজের আরেক শ্রেণির মানুষের আয় কম হয়। এতে করে সমাজে আয়ের বৈষম্য বা পার্থক্য দেখা দেয়।

যার উৎপাদনের উপাদানের পরিমাণ কম তার আয় কম

যার উৎপাদনের উপাদানের পরিমাণ বেশি তার আয় বেশি

উৎপাদনের উপাদান ও আয়বৈষম্য

খুশি আপা শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসে দেখানো কৌশল অবলম্বন করে বাড়ির কাজ হিসেবে পরিচিত যেকোনো দুই জন ব্যক্তির উৎপাদনের উপাদান ও মাসিক আয়ের হিসাব ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে লিখে আনতে বললেন।

এরপরে খুশি আপা শিক্ষার্থীদের ছবিগুলো দেখিয়ে বললেন, চলো আমরা পচনশীল ও অপচনশীল পণ্যের একটি তালিকা তৈরি করি।

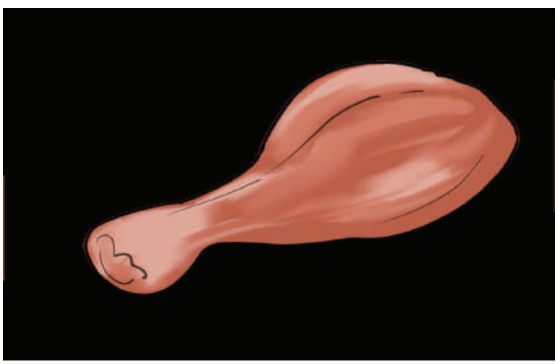

মাংস

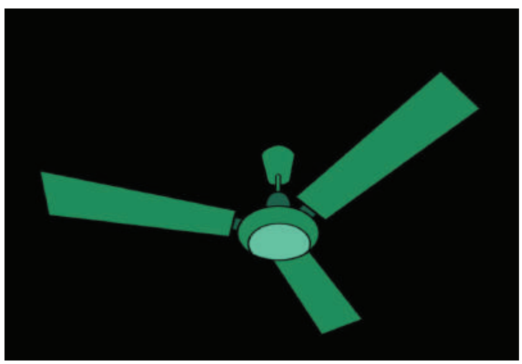

ফ্যান

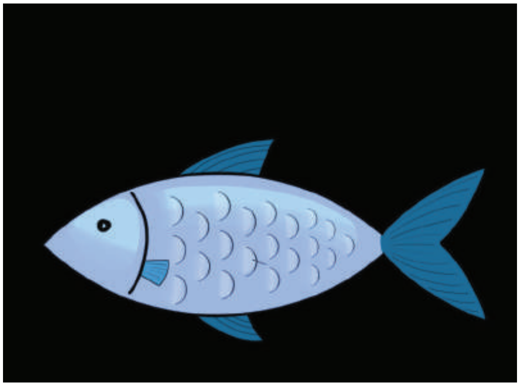

মাছ

টি-শার্ট

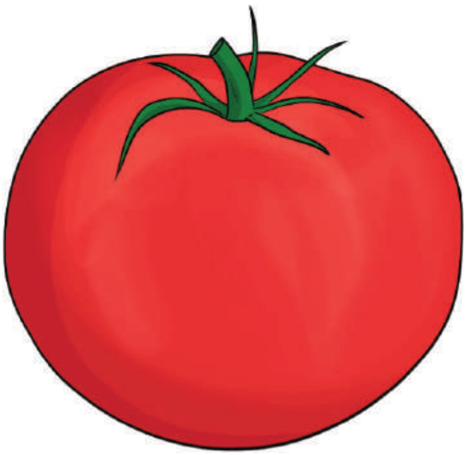

টমেটো

কাঠ

পেনসিল

নোট খাতা

চিত্র: পচনশীল ও অপচনশীল পণ্য বা দ্রব্য

পচনশীল পণ্য	অপচনশীল পণ্য

খুশি আপা বললেন, পচনশীল পণ্যগুলো উৎপাদনের সাথে সাথেই ভোগ করতে হয়, তা না হলে সেগুলো ভোগের উপযুক্ত থাকে না। তাই সেগুলো ব্যবসায়ী বা সম্পদের মালিক বিশেষভাবে সংরক্ষণ করে থাকে। কৃষিপণ্য যেমন, ফলমূল, শাক-সবজি। এছাড়াও অপচনশীল পণ্যেরও নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে তাই এগুলো সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে হয়। তা নাহলে নির্দিষ্ট সময় শেষে এগুলো ভোগের অযোগ্য হয়ে যেতে পারে। যেমন, জামা-কাপড়, প্রসাধনী, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

খুশি আপা বললেন, এখন আমরা পচনশীল ও অপচনশীল পণ্য সংরক্ষণ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করব। আমরা আমাদের বাড়ির কাছের যেকোনো মুদির দোকানদার বা বাজারের ব্যবসায়ীর কাছে প্রশ্ন করে এই তথ্য সংগ্রহ করে নিচের দুটি ছক পূরণ করব। খেয়াল রাখব তথ্য সংগ্রহের আগে আমরা উত্তরদাতার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিব। এই জন্য প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া উত্তরদাতার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার নিয়মগুলো যথাযথভাবে পালন করব। এটা আমরা বাড়ির কাজ হিসেবে করে নিয়ে আসব।

পচনশীল পণ্য সংরক্ষণের উপায়

পচনশীল পণ্য	কত দিনের জন্য সংরক্ষণ	সংরক্ষণের উপায়

অপচনশীল পণ্য সংরক্ষণের উপায়

অপচনশীল পণ্য	কত দিনের জন্য সংরক্ষণ	সংরক্ষণের উপায়

খুশি আপা বললেন, আমরা কেউ দোকানে গিয়েছি আবার কেউ বাজারে গিয়েছি, আমরা কি বলতে পারব এই পণ্যগুলো কার জন্য উৎপাদন করা হয়েছে? শান্তা বলল, যাদের এই পণ্যগুলো প্রয়োজন সেইতো কিনবে।

খুশি আপা বললেন, একদম ঠিক বলেছ, শান্তা। অর্থাৎ পণ্যগুলো সেই ব্যক্তি কিনবে যার এই পণ্য ব্যবহারে চাহিদা রয়েছে বা অভাব রয়েছে। পণ্য ব্যবহার করে সেই ব্যক্তির চাহিদা পূরণ হবে বা অভাব দূর হবে। ফলে পণ্য ব্যবহার করে বা ভোগ করে তার মধ্যে সন্তুষ্টি তৈরি হবে। একে পণ্যের উপযোগ বলে। যিনি দ্রব্য বা পণ্য বা সেবা ভোগ করেন তাকেই ভোক্তা বলা হয়।

খুশি আপা বললেন এখন তাহলে চলো আমরা দলে ভাগ হয়ে যাই। পরের পৃষ্ঠায় পণ্যগুলোর ভোক্তা কারা হতে পারে তা দলগত আলোচনার মাধ্যমে নির্ণয় করে লিখি।

পণ্য	সম্ভাব্য ভোক্তা
চকলেট	
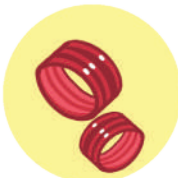 চুড়ি	
চশমা	
পোশাক	
নোটখাতা	
মাছ ধরার উপকরণ	

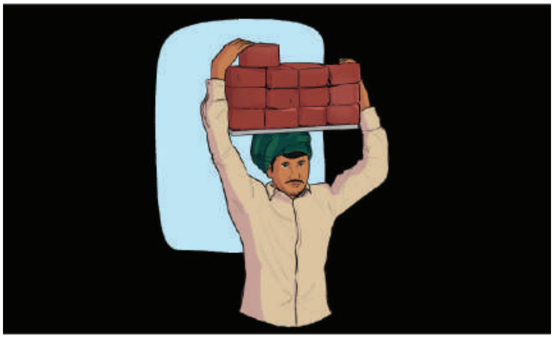

পুরুষ নির্মাণকর্মী

নারী নির্মাণকর্মী

খুশি আপা ক্লাসে প্রবেশ করেই খেয়াল করলেন আজ রোজির মন একটু খারাপ। মন খারাপের কারণ জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, আমার পরিচিত একজন আপু নির্মাণকর্মী। উনার নাম আলেখা। আমি গতকাল আপুর সাথে তার মাসিক আয় নিয়ে কথা বলছিলাম। আপু বললেন, অনেক নির্মাণকাজের মালিক নির্ধারিত টাকার কম পরিশোধ করে। কারণ তারা ভাবে একজন নারী নির্মাণকর্মী পুরুষের মতো পরিশ্রম করতে পারে না। আলেখা আপু আফসোস করে বলছিলেন তিনি অনেক পুরুষ নির্মাণকর্মীর চেয়ে ভালো কাজ করেন।

তিনি তুলনামূলক কম সময়ে অনেক ইট ভাঙতে পারেন। কিন্তু তিনি নারী হওয়ায় পুরুষের সমান টাকা আয় করতে পারছেন না। খুশি আপা বললেন, রোজি নারী পুরুষ ভেদে আয়ের এই বৈষম্যকে আমরা অর্থনীতির সমতার নীতির মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করতে পারি।শাহীন বলল, সমতা মানে হচ্ছে সমান সমান। তাই না খুশি আপা? খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ, শাহীন। চলো আমরা নিজেরাই এটার সমাধান খুঁজি। আলেখা যেন পুরুষের সমান মজুরি পায় এজন্য জন্য কি কি করা যায়? রাকিব বলল, আপা আমরা নির্মাণকাজের মালিকদের গিয়ে বোঝাতে পারি।

ফরহাদ বলল, জনে জনে গিয়ে বোঝানো তো কঠিন। আমরা কি মাইকিং করতে পারি? সুমাইয়া বলল, না না মাইকিং করলে কি সবাই শুনবে? আর শুনলেও কি সবাই মানবে? রায়হান বলল, আমরা নারী পুরুষভেদে সব নির্মাণকর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ইট ভাঙ্গার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নির্ধারণ করতে পারি না? তাহলেতো আর বৈষম্য থাকল না।

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ রায়হান। নারী, পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে যখন সবার জন্য সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণের সমান সুযোগ সুবিধা থাকে সেটাই হচ্ছে সমতার নীতি। পরের দিন খুশি আপা বললেন, আমরা ইতোমধ্যেই পণ্য, পণ্যের প্রকারভেদ, প্রাথমিক পণ্য, মাধ্যমিক/মধ্যবর্তী পণ্য এবং চূড়ান্ত পণ্য সম্পর্কে জেনেছি। এছাড়া উৎপাদনের উপাদান বা উপকরণ, উপকরণের মালিকানা এবং উৎপাদনের উপকরণের আয় সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। সেই সাথে পণ্য সংরক্ষণ ও ভোগ সম্পর্কেও জেনেছি।

এখন আমরা সবাই মিলে আমাদের অর্জিত জ্ঞান দিয়ে বাস্তবে কিভাবে একটি উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় বা সম্পাদন হয় এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করব। এজন্য শিক্ষার্থীরা সুবিধাজনক কোনো কৃষি খামার বা মৎস্য খামার বা শিল্প কারখানা পরিদর্শন করবে।

নীরা বলল, আপা, আমরা কৃষি খামারের মালিককে বা উদ্যোক্তাকে কি কি প্রশ্ন করব তার জন্য একটি প্রশ্নামালা তৈরি করতে হবে। খামার বা কারখানার উৎপাদন উপাদান, আয়, পণ্য সংরক্ষণ ও ভোগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে আমরা কি সমতার নীতির ভিত্তিতে তথ্য উপস্থাপন করব? খুশি আপা বললেন, একদম ঠিক বলেছ, নীরা। আমরা অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করব।

এবার খুশি আপা শিক্ষার্থীদের সকল প্রশ্ন একত্রে লিপিবদ্ধ করার জন্য বললেন। একজন শিক্ষার্থী লেখার দায়িত্ব নিল। অন্য শিক্ষার্থীবৃন্দ তাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন দিয়ে তৈরি করতে সহযোগিতা করলো।

নমুনা প্রশ্নমালা (Questionnaire)

প্রশ্নের শুরুতে শিক্ষার্থীরা খামারির সাথে পরিচিত হবে এবং কুশল বিনিময় করবে। শিক্ষার্থীরা কুশল বিনিময়ের সময় উদ্যোক্তাকে নিশ্চিত করবে যে, তাদের একাডেমিক/পড়াশুনার কাজে বাস্তব জ্ঞান লাভ করাই এই পরিদর্শনের লক্ষ্য। শিক্ষার্থীরা খামারের কোনো তথ্য অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে না। আমরা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত উত্তরদাতার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার নিয়মগুলো যথাযথভাবে পালন করব।

নমুনা প্রশ্ন:

১. পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করেন কীভাবে?

২. নারী ও পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা কত?

৩. নারী/পুরুষ শ্রমিক আপনার সংগঠনের মুনাফা বৃদ্ধিতে কি কোনো প্রভাব ফেলে? যদি হ্যাঁ হয় কীভাবে?

....

....

....

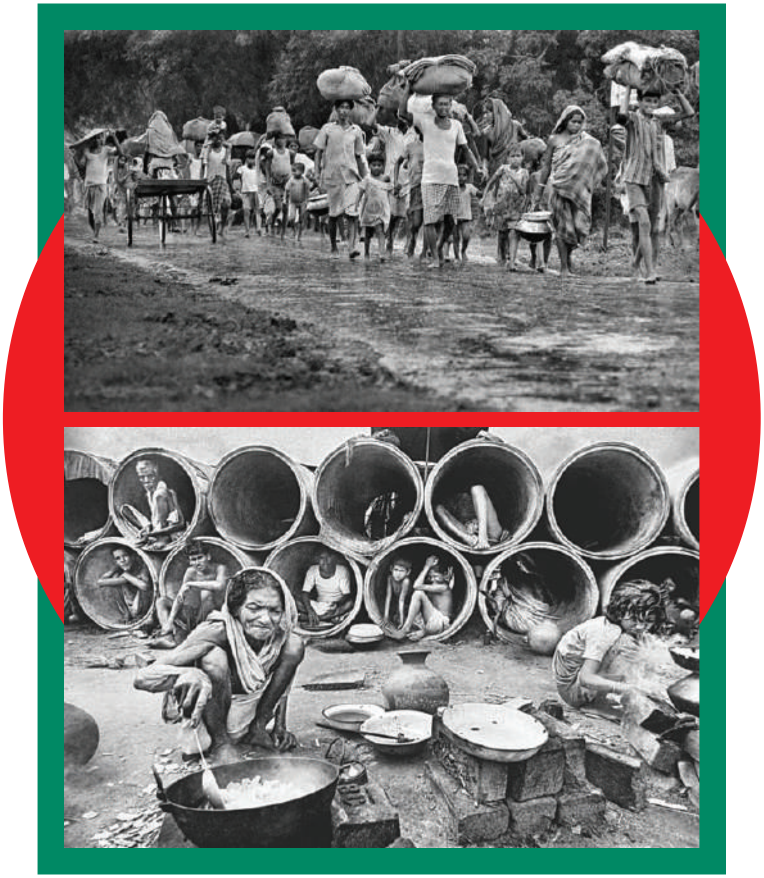

শরণার্থী: ১৯৭১

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং তাদের স্থানীয় দোসরদের নৃশংসতার হাত থেকে রক্ষা পেতে এদেশের মানুষ বিভিন্ন পথে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রায় ১০ মিলিয়ন (এক কোটি) শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল ৭ম শ্রেণি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

একতাই বল

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য